"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

ষোড়শ বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ প্রথম সংখ্যা

নৃত্যের পাঁচালি

রমেশ দাশ *

ঋতুর রঙ্গমঞ্চে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটে—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, তারপর ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ঘটে শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্তের। গ্রহ নক্ষত্ররাজি নির্দিষ্ট গতিতে চিহ্নিত পথ পরিক্রমা করে চলে। তালে তালে তরঙ্গমালার উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে এক একটি স্তরে এক এক ধরণের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃ সকল প্রকার অস্তিত্বের মধ্যেই একটি নিয়মনিষ্ঠা, সুনির্দিষ্ট গতিশীলতা বা ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির পরতে পরতে ছন্দের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রাণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলে ছন্দ হয় সঙ্গীত, আর তার চরণে স্পন্দিত হলে সৃষ্টি হয় নৃত্যের। নৃত্যের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। পদার্থবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যে সব অনু-পরমানু দিয়ে বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি স্থাবর নয়, জঙ্গম—তারা অবিরাম অবিশ্রাম নৃত্যরত। তাদের নর্তনের ফলেই তাদের মধ্যে ঘটেছে নব নব সমন্বয়, বিলুপ্তি ঘটেছে পুরাতন সংহতির। এমনি করে সৃষ্টি হচ্ছে নূতন পদার্থের, ধ্বংস ঘটছে পুরাতনের। সুতরাং বলা যেতে পারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মুলে আছে নৃত্য। নূতন সমন্বয়ে নূতন সৃষ্টি, সমন্বয়ের অবস্থানে স্থিতি, তার বিলুপ্তিতে প্রলয়।

উদ্ভিদ জগতে নৃত্যের সন্ধান দিয়েছেন, জীববিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র। তার লিখিত "অব্যক্ত" গ্রন্থে বনচাঁড়ালের নৃত্যের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 'সঞ্চিত উদ্বৃত্ত শক্তির উৎসার ঘটে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দনে, অর্থাৎ নাচনের মধ্যে। মনোবিজ্ঞানী কবি Schiller ও Spencer এর 'অতিরিক্ত শক্তি তত্ত্ব'—এর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের এই মতবাদের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। Schiller ও Spencer মনে করেন সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির (Surplus energy) বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিশুর খেলাধুলায়, আর জগদীশচন্দ্রের মতে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দনের কারণ তার "সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছাস"।

* অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ)

উদ্ভিদের আধ্যাত্ম-চেতনার কথা সাধারণ মানুষের কাছে উন্মাদের উদ্ভট কল্পনা মাত্র। তবে মহাযোগী চরণদাস বাবাজী এই কল্পনাকেই বাস্তব বলে প্রমাণ করে-ছিলেন (ভারতের সাধক—৪র্থ খণ্ড, শঙ্করনাথ রায়)। দিগ্‌নগর গ্রামের একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের দৈবী শক্তি উদ্ঘাটিত করেছিলেন তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে—বট বৃক্ষটিকে ঘিরে তিনি যখন তদ্গত চিত্তে নৃত্য ও কীর্তনে আত্মহারা, তখন উপস্থিত সকলের সমক্ষে একটি অলৌকিক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হলো, বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করলো বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি বাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে উদ্দাম নৃত্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

সতীহারা শিব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যখন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেন তখন বিশ্বসংসার ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। সুতরাং নৃত্যের মধ্যে ক্রোধেরও স্ফূরণ হয়, যদিও আমরা সাধারণতঃ নৃত্যের মধ্যে শুধু আনন্দেরই উচ্ছ্বাস ঘটে বলে মনে করে। মানুষ ক্রুদ্ধ হলেও যে নৃত্য করে তার প্রমান আদিম জাতির যুদ্ধ-প্রণালী। কাড়া-নাকাড়া,শিঙ-দামামার সম্মিলিত গুরু গম্ভীর শব্দের তালে তালে তীর-ধনুক, বর্শা-সজ্জিত উভয় প্রতিপক্ষের নির্দিষ্ট মাত্রায় পা ফেলে ফেলে পরস্পরের সম্মুখীন হবার মধ্যেই ক্রোধাশ্রিত নৃত্যের চিত্রটি পরিস্ফূট। আজও প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হলে আমাদের হাত-পা, সর্ব অঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। একেও নৃত্যেরই রূপান্তর বলা যায়। বস্তুতঃ নৃত্যে ছন্দের প্রধান আশ্রয় চরণ হলেও সর্ব অঙ্গেই তার স্পন্দন জাগে।

অবশ্য একথাটা ঠিক যে সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ নৃত্যের মধ্যে আনন্দ বা উল্লাসেরই উচ্ছ্বাস ঘটে থাকে। অরণ্যচারী বন্য মানুষের আনন্দানুষ্ঠানে মাদল সহকারে উদ্দণ্ড নৃত্য, বিবিধ লোকনৃত্য, কীর্তনানন্দে বিভোর ভক্তবৃন্দের বিহ্বল নর্তন, ধনীর দরবারে নর্তকীর নূপুর নিক্কন, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্যাঞ্জলি, শিল্পমঞ্চে সৌখিন শিল্পীর নৃত্য নিবেদন—এ সবের মধ্যে আনন্দেরই উৎসার ঘটতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুপক্ষীর নৃত্যের পশ্চাতেও থাকে তাদের আনন্দ-বোধ। আকাশে মেঘ সঞ্চার হলে আনন্দে ময়ূরী নৃত্য করে, প্রভুর দর্শনে ভক্ত কুকুর নৃত্যের মাধ্যমে তার আনন্দ প্রকাশ করে, হরিণ শিশু 'অকারণ পুলকে' নেচে বেড়ায়।

নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার রীতিটা আদিম হলেও বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ যেন এ রীতিটাকে স্বীকার করে নিতে পারছেনা। ক্রমে ক্রমে নৃত্য তাই মাত্র একটি শিল্প কলায় পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু নৃত্যের স্পৃহাটি আদিম বলেই যেন দুর্নিবার। তাই সভ্য মানুষের চরণে নৃত্য আন্দোলিত না হলেও তার হৃদয়কে সে আন্দোলিত করে। এই সত্যটি বিশ্বকবির রচনায় সার্থকভাবে প্রকটিত হয়েছে

যখন তিনি গেয়ে উঠেছেন—"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে, হৃদয় নাচেরে।" আনন্দের সংবাদ পেলে আমরা প্রায়ই বলে থাকি—'এ সংবাদে আমার মন নেচে উঠেছে।'

নৃত্যের মধ্যে একটা নেশা বা মাদকতা আছে। একবার নাচতে সুরু করলে সহজে আর থামা যায় না। "Off the Ground" কবিতায় কবি তিনটি সরল গ্রাম্য কৃষকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তারা বাজি রাখলো নেচে নেচে সমুখ বরাবর এগিয়ে যাবে, থামা চলবে না; থেমে গেলেই বাজিতে হার হবে। তারা মহানন্দে নেচে চললো। কত গ্রাম-নগর, অরণ্য-প্রান্তর একে একে তারা অতিক্রম করে গেল, তবু তারা থামলোনা। অবশেষে এসে পড়লো সমুদ্রের উপকূলে। এবারে দুজন কৃষক ক্লান্ত হলো, কিন্তু তৃতীয় জন তার নাচন না থামিয়ে নেমে গেল সমুদ্রের নীল জলে। নেচে নেচে সে এগিয়ে চললো—ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের জলরাশি তাকে গ্রাস করে ফেললো। দুই বন্ধু সমুদ্রতটে অদৃশ্য বন্ধুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত অর্থ রেখে অশ্রুজলে বিদায় নিলে। তারপর কবি কল্পনা করেছেন বিজয়ী কৃষক কেমন করে সুনীল সমুদ্র-গর্ভে স্বর্ণকান্তি মৎস্যকন্যাদের সাহচর্যে শ্বেত প্রবাল প্রাসাদে মহানন্দে দিনাতিপাত করতে লাগলো তার কথা। অর্থাৎ আনন্দ থেকেই নৃত্যের উদ্ভব শুধু নয়, নৃত্যের পরিণতিও আনন্দ। "চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুমুদুম্বরম সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্, চরৈবেতি চরৈবেতি"—ঋষি কণ্ঠের এই অমর বাণীর তাৎপর্যটিও অনুরূপ।

নৃত্যের যে নেশা আছে যারা কখনো কীর্তনে যোগ দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাঁদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত নর্তনের যেন ক্ষান্তি আসে না।

কোন কোন ব্যাধির মতো নৃত্যও সংক্রামক। কীর্তনীয়াদের নাচতে দেখে দর্শক-দের মধ্যেও ধীরে ধীরে নৃত্যের স্পৃহা উজ্জীবিত হয়। তারাও ধীরে ধীরে নৃত্য শুরু করে দেন আর অচিরে বিভোর হয়ে পড়েন। মান-মর্যাদার অভিমান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় নগরীগুলিতে নৃত্যস্পৃহা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল ('A Dictionary of Psychology—James Drever)। মনস্তাত্ত্বিকেরা এর নাম দিয়েছেন Dancing Mania। কারণস্বরূপ তারা জনমানসে গণমনের প্রভাবের (result of mass suggestion) কথা বলেছেন। ম্যানিয়া হল কোন কিছু বার বার সম্পাদন করবার জন্য প্রচণ্ড ভাবে অনুভূত এক দুর্নিবার ও দুর্দম অন্তর্তাড়না (uncontrollable impulse)।

শ্রীচৈতন্য যখন তাঁর পার্ষদবর্গের সঙ্গে নেচে নেচে নাম-সঙ্কীর্তন করে পথ পরিক্রমা করতেন তখন শত শত দর্শক উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ভিড়তো—নৃত্যানন্দে উত্তাল জনসমুদ্র সে এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করতো।

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে নৃত্যের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে মনে হয়। আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীন অধ্যাপক। বয়েস তাঁর ষাট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ তারুণ্য তাঁর অপর্যাপ্ত। কেশে পাক ধরেনি, কর্মক্ষমতা অটুট আছে দিন-রাত্তির নানা কাজে ছুটে বেড়াচ্ছেন অথচ প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব নেই। কথায় কথায় তাঁর সরস মন্তব্য আর দিলখোলা উচ্চ হাস্য পরিচিত মহলে তাঁকে বিস্ময় ও প্রীতির পাত্র করে তুলেছে। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর এই তারুণ্য ও প্রাণ প্রাচুর্যের রহস্যটি কি? উত্তরে তিনি বললেন—"আমি প্রতিদিন একবার ঘরে খিল এঁটে তাই-রে-নাই-রে-না বলে কয়েক পাক নেচে নিই, আমার বিশ্বাস আমার সজীবতার এটাই আসল রহস্য।" এমন আরও দুচার জনকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানি যাঁরা বাইরে খুব গম্ভীর ও নীরস বলে পরিচিত, অথচ আপন গৃহে শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই মাঝে মাঝে নৃত্য করেন এবং আমি জানি তাঁরা সন্তুষ্ট ও সুখী মানুষ। নৃত্যকে তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোব্যাধির একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি (Therapeutic Method) রূপেও ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৃত্য পদ্ধতি (Dance Therapy) নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

নৃত্যের মাধ্যমে অবদমিত সঞ্চিত উষ্মা (anger), আক্রোশ (aggression), উদ্বেগ (tension), উৎকণ্ঠা (anxiety) ইত্যাদি ক্ষতিকর মানসিক অবস্থাগুলির উদ্গতি (sublimation) ঘটে। প্রচণ্ড হস্ত-পদ ও অঙ্গসঞ্চালনের ভেতর দিয়ে সঞ্চিত আক্রোশেরই নিষ্কাশন (catharsis) ঘটে।

এমনি করে মন ভারমুক্ত (relaxed) হয়ে তার সহজ ও সাম্যাবস্থা ফিরে পায়। সুতরাং নৃত্য শুধু বিলাস নয়, শুধু শিল্প নয়, এর ব্যবহারিক মূল্যটিও বড় কম নয়।

বিশ্বসংসার ছন্দবদ্ধ। ছন্দপতন ঘটলে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। ছন্দোদ্ধার করতে হলে ছন্দসংযোজনার প্রয়োজন। নৃত্য হলো ছন্দের একটি সার্থক রূপ।

ভালবাসা, প্রত্যাখ্যান ও মানসিক স্বাস্থ্য

অমরেন্দ্র নাথ বসু *

(দুই)

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়া সম্বন্ধে শিশুর ধারণা তার মানসিক স্বাস্থ্য নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মা-বাবারা যথেষ্ট ভালবাসা দিচ্ছেন, একথা মনে করলেও শিশুরা অনেক সময় তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে কেন? পূর্বের আলোচনায় এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল যার মধ্যে দেখা যায় যে কেবলমাত্র মা-বাবার সান্নিধ্যের মধ্যেই শিশুর পক্ষে তাদের ভালবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। অতি আধুনিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, "......the physical presence of a parent or a foster parent does not gurantee emotional satisfaction to the child, especially if that parent is unable to tolerate any disturbance in behaviour on the part of the child" (Dane G. Prugh & Robert G. Harlow) অনেক সময় এরূপও দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্যই শিশুকে তার বাড়ীতে মা-বাবার কাছে না রেখে কোনও বোর্ডিং-এ রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। মা-বাবার সান্নিধ্যে থেকেও শিশু তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এরূপ অবস্থাকে বলা যেতে পারে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কে বিকৃতির পরিস্থিতি (distortion in the affectional relationship)। এই পরিস্থিতির উদ্ভব নানা ভাবে হতে পারে। যেমন, মা-বাবা যদি শিশুর প্রতি সব সময় একটা অত্যধিক 'দুর ছাই' গোছের ভাব পোষণ করেন; শিশুকে যদি প্রায়ই বকা-ঝকা ও মার-ধরের সাহায্যে পীড়ন করেন; এবং শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব যদি প্রায়শঃই বিরক্তি ও ভালবাসার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, তাহলে শিশুর মনে সহজেই বঞ্চনার বোধ জাগতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বিকৃত ভালবাসার পরিস্থিতির বীজ প্রধানতঃ মা-বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। মা-বাবার এরূপ ব্যবহারের ফলে মা-বাবা সম্বন্ধে শিশুর মনে

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

একটা বিকৃত ও অস্পষ্ট ধারণা দেখা দিতে থাকে। এই ভাবে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আমরা বিকৃত সম্পর্ক এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক বলতে পারি।

এবারে দেখা যাক এই বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক কত রকম ভাবে দেখা দিতে পারে। প্রথমে মা-বাবা শিশুকে নিজেদের আশা-আকাঙ্খা ও মূল্য বোধ চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে মনে করতে পারেন। সন্তানের যে একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে, একথা তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। সন্তানের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সুখ যে আলাদা রকমের হতে পারে তা তারা বুঝতেই চান না।

ঘটনা নং ৭। পিন্টু পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মা-বাবার ইচ্ছা পিন্টু ক্লাশে প্রথম হবে। পিন্টুর মাসিমার ছেলে গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাশে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তাই মা-বাবা পিন্টুর মনে এই প্রথম হওয়ার আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত রাখতে ব্যস্ত। পিন্টু মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু ওর মা তার বন্ধুদের কাছে গল্প করেন, পিন্টু পড়াশুনায় খুব ভাল, ওর খুব বুদ্ধি, কাজেই ও বার্ষিক পরীক্ষায় অবশ্যই প্রথম হবে। এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, নিজের মূল্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পিন্টুর সামনেই এসব কথা-বার্তা হয়। মা-বাবা ওকে বলেছেন এবার প্রথম হলে ঘড়ি কিনে দেবেন। এই ভাবে পিন্টুর পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে এক কল্পনার সৌধ গড়ে উঠতে থাকে। এদিকে পরীক্ষা যতই সন্নিকটবর্তী হয় পিন্টু যেন কিরকম হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় মা-বাবার আকাঙ্খিত ফল সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পরীক্ষা সম্বন্ধে ভয় বাড়তে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফূর্তি কমে যায়। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে হঠাৎ গা বমি-বমি ভাব দেখা দেয়। শরীর খারাপ হয়ে যায়। একদিন দেখা গেল ওর সারা গায়ে ফুসকুড়ি (rash) বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

ঘটনা নং ৮। অনুরূপ আর একটি ঘটনা। মিন্টু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ওর সম্বন্ধে মা-বাবার খুব উঁচু ধারণা। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা সম্বন্ধে তাঁরা সর্বত্রই গল্প করে বেড়ান। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা, ওর পরীক্ষার ফল, প্রভৃতি সব কিছুর পিছনে যে তাঁদের যত্ন, চেষ্টা ও সতর্ক দৃষ্টি কাজ করছে, একথা বলতে তাঁরা কখনও ভোলেন না। এর মধ্যে তাঁরা একটা সুখ অনুভব করেন। তাঁদের এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সচ্ছল লেখা-পড়া জানা ঘরে এরকম ছেলে না হলে কি মানায়? তাঁদের কৃতিত্ব যে তাঁরা ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাকে পড়াশুনায় আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি-শ্রুতি দেওয়া হয় যে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলে সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। পরীক্ষার শেষে মিন্টুও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মা-বাবার মনমত কথা-বার্তা বলতে

থাকে। পরীক্ষার ফল বের হলে বাড়ীতে এসে বলে যে সে প্রথম হয়েছে। মা-বাবা স্কুলের রিপোর্ট বই দেখতে চাইলে মিন্টু তাঁদের বলে যে রিপোর্ট বই দেওয়া হয় নি। কারণ ছাপাখানায় গোলমালের জন্য রিপোর্ট বই সময়মত স্কুলে এসে পৌঁছায় নি। কাজেই ফল মুখে ঘোষণা করা হয়েছে। মা-বাবারও বোধ হয় নিজেদের কামনা-পুর্তির ব্যগ্রতায় সমস্ত বোধশক্তি অবলুপ্ত হয়েছিল। মিন্টুর কথায় সন্দেহ করেননি; অথবা সন্দেহকে অবদমন করেছেন। মিন্টুর সাইকেল এল। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও ওর মনে কোন আনন্দ নেই। ও সব সময়ই একটা অস্বস্তি বোধ করে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। অবশেষে বড়দিনের ছুটির পর যখন স্কুল খুললো তখন আস্তে আস্তে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন হলো।

এই দু'টি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবা সন্তানকে নিজেদের উচ্চ আকাঙ্খা চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলের সাথে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মূল্য ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সন্তানের প্রয়োজন, তার ক্ষমতা এখানে গৌণ। তাই সন্তানের উপর অনবরত চাপ এসে পড়ছে। আর এই চাপের ফলে সন্তান তার মা-বাবার ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না। সব সময় ভালবাসা হারাবার ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। সে মনে করে যে মা-বাবার আকাঙ্খা পুরণের মধ্যেই তার মূল্য। তা না হলে সে পরিত্যাজ্য। ফলে এই মূল্য বজায় রাখার জন্য সে কখনও আশ্রয় নিচ্ছে রোগের, কখনও বা নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার। ফলে তার আবেগ-জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়।

"...the child is not viewed as an individual with integrity in his own right, but rather, in some way, as a being responding to the needs, and feelings of the parent, with the result that his emotional needs are not met adequetely." (Dane G. Prugh & Robert G. Harlow) দুঃখের বিষয় এরূপ পরিস্থিতির পরেও তাঁদের বলতে শোনা গেছে, "ছেলের জন্য এত করলাম, ছোটবেলা থেকে ওকে এমন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম, দিন-রাত ওর কথাই ভাবি, শেষ পর্যন্ত কিনা এই হলো? ও আমাদের সর্বনাশ করেছে। এমন ছেলেকে দুর করে দেওয়া দরকার।" অবশেষে তাঁরা এই মনে করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন যে পাড়ার খারাপ ছেলেদের দলে পড়েই ছেলে এমনি হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা অথবা মা তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে এত বড় করে দেখেন যে সন্তানকেও তাঁরা সেই ধ্যান-ধারণার একটা

অংশ বলে মনে করেন। যেমন—ঘটনা নং ৮। দীপু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা সাধারণ চাকরী করেন। মাও চাকরী করেন। ফলে দীপু শৈশব থেকেই পিসি ও দিদির কাছে বড হতে থাকে। মা সংসার ও চাকরী নিয়ে ব্যস্ত। বাবা ততোধিক ব্যস্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। তিনি দীপুকে সেই মতাদর্শে গড়ে তুলতে চান। তিনি কল্পনা করেন যে দীপু একদিন এই আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবে। তিনি যা পারেন নি দীপু তাই পারবে। বাবা তাঁর অবসর সময়ে দলের কাজে ব্যস্ত। বাড়ীতেই দলের সভা হয়, রাজনৈতিক ক্লাশ হয়। দীপুর যখন বারো তেরো বছর বয়স হয় তখন তিনি ওকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। দীপুর ভাল লাগে না। ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাবা ওকে যে সকল দায়িত্ব দেন ও তা পালন করে না। বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে। একদিন মিথ্যা ধরা পড়ায় বাবা দীপুকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। কারণ আদর্শ নিয়ে ছেলেখেলা! এ সহ্য করা যায় না। দীপুর মন আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারে নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ওর শরীর খারাপ হতে থাকে। আস্তে আস্তে ফিটের উপসর্গ দেখা দেয়। একদিন কথায় কথায় দীপু অভিযোগ করেছিল যে ও কোন দিন ওর বাবার ভালবাসা পায় নি। বাবা তাঁর দলের ছেলেদের বেশি ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা গেছে যে মা-বাবারা তাঁদের সন্তানকে সব ব্যাপারেই তাঁদের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চান। শিশু বড হয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হবে, এ অবস্থাকে তাঁরা ভয় পান। সন্তানকে তাঁরা স্বাধীনতা দিতে ভয় পান, পাছে ওরা কখন কি করে বসে। পাছে সন্তান হাতছাডা হয়ে যায়, এই তাঁদের ভয়। প্রচণ্ড আগলে থাকার মনোবৃত্তি (Possessiveness) থেকেই এরূপ ব্যবহার তাঁরা করে থাকেন। তাই সন্তানকে তাঁরা সব সময় অক্ষম, অপটু ভাবতে ভালবাসেন।

ঘটনা নং ৯। মিঠু এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই মা সর্বদা হস্তক্ষেপ করেন, পাছে মিঠু কিছু ভুল করে ফেলে। কখন কি শাড়ী পরবে, কি ভাবে চুল বাঁধবে, কখন কি খাবে, কিভাবে ফোনে কথা বলবে, কতটা সময় পড়বে, কোন্ কোন্ বন্ধুর সাথে মেলামেশা করবে, সব ব্যাপারেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি মিঠুকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চান। তিনি ওকে স্নান করিয়ে দেন; শাড়ী পরতে সাহায্য করেন; স্কুলে যাবার আগে নিজের হাতে খাইয়ে দেন, পাছে ওর গলায় মাছের কাঁটা আটকে যায়। শিশুকাল থেকেই মিঠু এভাবে মানুষ হয়ে আসছে। মায়ের আত্মপ্রসাদ, তাঁর মত এমন করে ভালবাসতে কেউ

পারবে না। একদিন তিনি রাগ করে বলেও ফেলেছিলেন মিঠুকে, "পড়তিস্ অন্য মায়ের পাল্লায়, বুঝতিস্ মজাটা।"

এখন আর মিঠুর এসব ভাল লাগে না। সে একটু স্বাধীন হতে চায়। একদিন অবস্থা চরমে ওঠে। স্কুলে যাবার আগে মা ভাতের থালা হাতে করে মিঠুর পিছনে পিছনে ঘুরে ঘুরে ওর মুখে ভাত গুঁজে দিচ্ছেন। কিছু ভাত খাওয়া হয়ে যাবার পর দুধের গ্লাস ওর মুখের কাছে ধরেছেন, ও খেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে খেতে হবে, নইলে ওর শরীর খারাপ হবে। তখন দু'জনেই ড্রইং রুমে। হঠাৎ মিঠু উত্তেজিত হয়ে ধাক্কা দিয়ে গ্লাসের দুধ ফেলে দিল। স্কুলে যাবার পুর্ব মুহূর্তে অভূতপুর্ব দৃশ্য। মা কেঁদে আকুল "এত করি তোর জন্য, আর এই তোর প্রতিদান।" সেদিন আর মিঠুর স্কুলে যাওয়া হলো না।

চতুর্থতঃ দেখা গেছে যে মা অথবা বাবা যদি অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা মানসিক-রোগগ্রস্থ হন, তাহলে তাঁরা শিশুর সাথে প্রয়োজনীয় আবেগময় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বঞ্চনার বোধ আসা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ আজকাল শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরী করেন। অনেক সময় নিতান্ত বাঁচার প্রয়োজনেই দু'জনকে চাকরী করতে হয়; আবার অনেক সময় কেবলমাত্র সচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য অনেকে এরূপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি একান্নবর্তী পরিবার না হয় তাহলে শিশু অবহেলিত হতে বাধ্য। কারণ শিশুকে আত্মীয় অথবা কোনও অনাত্মীয় ব্যক্তির কাছে থাকতে হয়। কাজেই মা-বাবা যতই মনে করুন যে তাঁরা সন্তানের জন্য এত করছেন, এত কষ্ট করে চাকরী করে সচ্ছলতার মধ্যে তাকে মানুষ করছেন, সন্তান কিন্তু বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পায় না।

ষষ্ঠতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার স্বরূপ সন্তানের ভালবাসা পাওয়ার বোধকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মা ও বাবা উভয়ই হয়ত সন্তানকে যথেষ্ট ভালবাসেন; কিন্তু এই ভালবাসা নিয়ে দু'জনের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতি-যোগিতা সমস্ত পরিবেশকে আরও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। সংসারের ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এবং মতবিরোধ ও ঝগড়া সন্তানের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান এ যেন ত্রিভুজের তিনটি কোণ। এই তিনটি কোণের প্রত্যেকটি থেকেই প্রত্যেকটির দিকে সুসমঞ্জসভাবে আবেগের প্রবাহ থাকা দরকার। তাই এই ত্রিভুজাকৃতি সম্পর্কটিকে বিশেষ ভাবে একটি সমবাহু

ত্রিভুজের সাথেই তুলনা করে চলে। অর্থাৎ একটি সুসমঞ্জস অবস্থা। আবেগের বাহুগুলি পরস্পরের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অহেতুক দীর্ঘ, একটি অহেতুক হ্রস্ব নয়। ফলে এই সুসমঞ্জস আবেগের বাহু দ্বারা যে এক একটি সম্পর্কের কোণ তৈরি হয়েছে তাও পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ পরিবারে যদি সুসমঞ্জস আবেগের আবহাওয়া না থাকে, তাহলে শিশুর ভালবাসা পাওয়ার বোধে-হানি ঘটতে পারে।

এতক্ষণ যে সকল পরিস্থিতির আলোচনা করা হ'লো তাতে দেখা যায় যে সন্তানদের ধারণাই ঠিক, তাদের মনে বঞ্চনার বোধ জাগরিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুর প্রয়োজন, তার ভাল লাগা, তার মঙ্গল, মুখ্য নয়। ভালবাসার পিছনে মা-বাবার কামনা, প্রয়োজনবোধ, আকাঙ্খা ও অক্ষমতাবোধ গোপনে কাজ করে চলেছে। ভালবাসা এসকল ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক নয়, আত্ম-কেন্দ্রিক। মা বাবার এরূপ ভালবাসাকে আমরা আত্ম-প্রেম (Self-love) সঞ্জাত এবং স্বকামজ (Narcissistic) বলতে পারি। কাজেই এরূপ ভালবাসায় কখনওই শিশুর প্রয়োজন মিটতে পারেনা। তার মানসিক প্রয়োজন তো দূরের কথা, তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পুর্ববর্তী আলোচনায় ও বর্ত্তমান আলোচনায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মা-বাবার সাথে শিশুর বিকৃত সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ এক রকমের বঞ্চনা। একে আমরা ছদ্মবেশী বঞ্চনা বলতে পারি। আপাতঃদৃষ্টিতে একে ভালবাসা মনে হতে পারে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে বঞ্চনা ভালবাসার ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে, ভালবাসার মুখোশ ধারণ করে সকলকে ছলনা করার চেষ্টা করে। (একে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী Masked deprivation বলেছেন।) কিন্তু এ ছলনা শিশুর অনুভূতিতে ধরা পড়বেই। তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবার সান্নিধ্যই বড় কথা নয়। মা-বাবার সাথে শিশুর উপযুক্ত আবেগময় সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে একটি যথাযথ আবেগময় আবহাওয়া (emotional climate) শিশুর সুস্থ আবেগ জীবনের বিকাশের জন্য একান্ত দরকার। কিন্তু এই আবেগময় সম্পর্কের পুর্ণ বিকাশের জন্য সান্নিধ্য একটি পুর্ব-সর্ত।

এখন দেখা যাক মা-বাবার ভালবাসার অভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কিভাবে হানি ঘটায়। "The child's bodily contacts with his mothers and others who care for him, when counted one by one, run into tens of thousands. The contacts are significant from a psychological point of view. To

pick up an infant, to hold him in one's arms, to feed him, bathe him, and play with him means far more than just physical manipulations. In such event of this sort there is a communication between the adult and the child. It is largely through activities in which there is physical contact that the young child enters into interpersonal relationships with others, and from these he obtains nurture for his psychological development, much as the nourishment he gets through his mouth provides food for his physical growth." (Jersild. 1957). প্রথমে মায়ের এবং পরে মা-বাবা উভয়ের শারীরিক নৈকট্যের মধ্য দিয়েই শিশু তাদের ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করে এবং এভাবেই শিশুর মনে আবেগ-অনুভূতি প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই নৈকট্যের রকম-ফেরের মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা স্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান অনুভব করতে পারে। এর মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাব-মূর্তি গড়ে তুলতে থাকে। শিশু জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকে মায়ের সাথে তার শারীরিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে (কিছু পরিমাণে বাবার সাথেও) তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জগত, যেমন ভাল লাগা মন্দ লাগা, আরাম-বেদনা, গড়ে উঠতে থাকে। সে ক্ষুধার্ত হয়, মা তার ক্ষুধার অবসান ঘটান। সে বিছানা ভিজিয়ে থাকে, বা হয়ত কোন অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে, নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরামজনক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না; মা তখন তার অস্বস্তির অবসান ঘটান। খাওয়া, ঘুমনো, স্নান, পায়খানা, প্রস্রাব করা প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্যেই সে মায়ের স্পর্শ অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরামবোধ করে। কিন্তু মায়ের অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির সময়মত নজরের অভাবে শিশুর এই সকল প্রক্রিয়ায় যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তার মনে বিরূপবোধ জাগতে থাকে। শিশুর জীবনে এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতিই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর উপর ভিত্তি করেই তার বাইরের জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। শিশু ভাষা শেখার অনেক আগে থেকেই তার মনে এই বস্তু জগতের ধারণা (idea) সমূহ সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সকল ধারণাই তার ভাষার মূল উপাদান রূপে কাজ করতে থাকে। কাজেই প্রাক্-ভাষার স্তরের এই ধারণা সমূহে যদি অসামঞ্জস্য থাকে তাহলে তা শিশুর ভাষার ক্ষমতাকেও খর্ব করতে পারে। এই ধারণাগুলি গড়ে উঠতে থাকে তার জীবনের প্রাথমিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি (perception) ও অভিজ্ঞতার উপর। শিশুর আবেগজীবনের প্রভাব এর উপর অসামান্য। শিশুর নার্ভতন্ত্র পরিপক্ক থাকে না। ফলে এই সময়কার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি তার নার্ভতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি শারীর-সংগঠনের

উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শারীরবৃত্তের দিক থেকে নানা গবেষণায় দেখা গেছে (Hunt এবং Hebb-এর গবেষণা) যে শিশুর গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) উপর অতি শৈশবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্যই শৈশবের বেদনাদায়ক ও সুখদায়ক উদ্দীপকগুলি (stimuli) শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে শিশুর নার্ভতন্ত্র যখন কিছু কিছু উদ্দীপক গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে, অর্থাৎ শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে, তখনই উদ্দীপকগুলির প্রভাব শিশুর উপর বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। শিশু-প্রতিপালনের জন্য মায়ের ও বাবার বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপই এই উদ্দীপকের কাজ করে। এই উদ্দীপক সমূহের মাধ্যমেই শিশুর সাথে জগতের পরিচয় ঘটে। মা-বাবার ভালবাসার সাথে সুসমঞ্জস উদ্দীপকসমূহের একটা নিবিড় যোগাযোগ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। R. A. Spitz এবং W. Goldfarb-এর গবেষণায় ও শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের উপযুক্ত সংস্পর্শের অভাবের হানিকর প্রভাবের সমর্থন রয়েছে। Spitz এই হানিকর প্রভাবকে "anaclitic depression" (অর্থাৎ অন্য কোন বৃত্তি অচরিতার্থতাসঞ্জাত বিমর্ষতা বা অপর নির্ভরশীল বিমর্ষতা) নাম দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর শরীর-মনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানারূপ হানিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে J. Bowlby-র নাম স্মরণ করা দরকার। ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা Maternal care and Me ntal Health-এ তাঁর গবেষণা-লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তিকাটিই ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানির সমস্যাটির দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়। Bowlby এই পুস্তিকাটিতে লিখেছেন, "Prolonged breaks (in the mother-child relationship) during the first three years of life leave a characteristic impression on the child's personality. Clinically such children appear emotionally withdrawn and isolated. They fail to develop libidinal ties with other children or with adults and consequently have no friends worth the name." এই উক্তি থেকে দেখা যায় যে বঞ্চনার ফলে শিশু বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ মা-বাবার সাথে যেখানে যথাযথ সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে পাত্র-সম্পর্কের (object relationship) ক্ষমতাও ব্যাহত। মা-বাবার ভালবাসা ও সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে শিশু মা-বাবা সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলে। এই ধারণার রকম-ফেরের উপরই তার পরবর্তীকালের অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে ধারণাগুলি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াটি শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত অল্প-বিস্তর চলতে থাকে। কাজেই এই সময় ভালবাসার ক্ষেত্রে অবহেলা বিশেষ

হানিকর। ভালবাসায় বঞ্চনার জন্য পাত্র-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সম্বন্ধে গবেষণার প্রসঙ্গে Anna Freud এবং S. Lebovici-র (বর্তমান সভাপতি, আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতি) নামও উল্লেখযোগ্য।

শিশু যখন আর একটু বড় হয় এবং এই সময় সে যদি ভালবাসায় বঞ্চিত হয় তাহলে সে তার ভালবাসার চাহিদাকেই ভুলে যেতে চায়। ভালবাসা চেয়ে না পাওয়ার হতাশা-জনক পরিস্থিতিকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। ফলে সে ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছাকেই দমন করে। সে বলে, "আমি কারুর ভালবাসা চাই না।" এইভাবে তার অন্তরে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে পাওয়ার ইচ্ছা, আর একদিকে সেই ইচ্ছাকে দমন। এই দ্বন্দ্ব থেকে তার নানা মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। এরূপভাবে নানা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মা-বাবার ভালবাসা আকর্ষণ করার একটা প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। হিষ্টিরিয়া রোগের কোন কোন অবস্থার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যেমন হীনমন্যতাবোধ, সব সময় বিরক্তিভাব, উন্নাসিকতা, এমন কি নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। আবেশিক উদ্বায়ু- (obsessional neurosis) রোগের রোগীদের মধ্যে যে অনেক সময় অত্যধিক আক্রম বোধ (exaggerated aggression) অত্যধিক ঈর্ষা, অত্যধিক ঘৃণা ইত্যাদি দেখা যায় তার পিছনেও অনেক সময় রোগীর শিশু বয়সে ভালবাসা পাওয়ার বোধে অভাবের অবদান দেখা গেছে। কোনও শিশু যদি প্রথমে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পায়, এবং পরে যদি সে তার থেকে বঞ্চিত হয় (যা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়; যেমন, মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার পর প্রথম শিশুর প্রতিক্রিয়া) তাহলে তার মধ্যে একটা অত্যধিক ঘ্যানঘ্যানানি ও বিরক্তিবোধের প্রকাশ দেখা যায়। শিশুর জীবনে মা-বাবার ভালবাসায় আস্থাবোধ তার নিরাপত্তাবোধের জন্য একান্ত দরকার। এই আস্থার অভাব হলেই শিশুর মনে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ দেখা দিতে থাকে, এবং ফলে তার মনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

মানবেতর প্রাণীর শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। প্রাণীধারার নিম্ন ধাপ থেকে যতই উচ্চ ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে শৈশবকাল ক্রমেই দীর্ঘ-তর হচ্ছে। মানবশিশুর শৈশবকাল দীর্ঘতম। "এই দীর্ঘতম শৈশবকাল ও পর-নির্ভরতা পরস্পর সম্বন্ধিত। পতঙ্গ-শিশুর চাইতে মানবশিশু যে কত অসহায় তা আমরা এই দুই শ্রেণীর জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।...... নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের

প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল বলতে কিছুই নেই, অথবা শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। পতঙ্গ এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের জন্মের সাথে সাথে জীবনধারণের উপযোগী কতকগুলি ক্ষমতা থাকে। যেমন, ধরা যাক আহার সংগ্রহের ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্ত্তকের (reflex) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্ত্তকগুলির সাহায্যেই তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনসমূহ মেটে। বাইরের পরিবেশে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটলেই এই প্রতিবর্তকগুলি আর সহায়তা করতে পারে না। এবং তারা নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন প্রতিবর্তক বা অন্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে না। তখন তাদের ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য।"

কিন্তু মানবশিশুর বেলায় জন্মের সাথে সাথে এরূপ স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অস্তিত্ব খুবই কম। এমন কি বাইরের সাধারণ উদ্দীপকের ফলে (আত্মরক্ষার নিমিত্ত) চোখের পাতা পিট্‌পিট্ করার প্রতিবর্তক আয়ত্ত করতেও তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়। কাজেই সে জীবনধারণের প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই পরনির্ভরশীল। এই কারণেই মানবশিশুর দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার সহজাত ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।"

মানবশিশুর ক্ষেত্রে একদিকে শরীর যন্ত্রে অপর্যাপ্ত স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অভাব, অপর দিকে মা-বাবার ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ব্যবস্থা,—এই অবস্থার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের অফুরন্ত সুযোগ। এই অবস্থার মধ্যে থেকে মানবশিশু ধীরে ধীরে তার বিচিত্র পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নানা রকমের প্রতিবেদন (responsc) আয়ত্ত করতে থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি-বেদনের ক্ষেত্রে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে।......এর ফলে সে ধীরে ধীরে জীবনযুদ্ধে নিজেকে বেশি উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। ....

... .

এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এরূপ নমনীয়তাই তো মানব জাতির জীবন সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন। কাজেই মানবশিশুর প্রতিবর্তকহীন অসহায় অবস্থা ও দীর্ঘায়ত শৈশবকাল বিবর্তনের দিক থেকে মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু এও নিঃসর্ত নয়। অসহায় ও দীর্ঘায়ত শৈশবকালের সাথে যুক্ত রয়েছে মা-বাবার ভালবাসা ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়। এই নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই মানব-শিশু তার শৈশবকালে বিচিত্র পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পায়। তাই যে অসহায় শৈশবকাল মানবজাতির পক্ষে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, তাই আবার অভিশাপে পরিণত হতে পারে যদি তার আনুসঙ্গিক

সর্ত যথাযথভাবে পরিপূরণ না হয়। পরিবারের আশ্রয় ও মা-বাবার ভালবাসার ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে মানবশিশুর অবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার দিক থেকে পতঙ্গের চাইতেও নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য-হীনতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি প্রতিবেদনই তখন নিরাপত্তাবোধের অভাব দ্বারা প্রভাবিত। এইভাবে সে অস্বাভাবিক প্রতিবেদনের উৎপাদন ঘটাতে থাকে এবং ক্রমে মানসিক-রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। "(লেখক ; চিত্ত, ১ম, ১৩৮০।)
"Childhood is......at once the greatest achievement and the greatest risk of evolution : it carries with it the greatest potentialities of development, but also the greatest possibility of disaster." (Hadfield, 1952)।

আমাদের সামনে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে যে শিশুর মানসিক-স্বাস্থ্য গঠনে মায়ের অবদান বেশি, না বাবার অবদান বেশি ? না উভয়ের অবদানই সমভাবে প্রয়োজন ? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকান দরকার। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালবাসা ও কর্তব্য-বোধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা একটু দেখা দরকার। মানুষ একটি সমাজবদ্ধ ও পরিবারবদ্ধ জীব। এবং পরিবারই (family) হ'ল সমাজের নিম্নতম একক। এই পরিবারের স্বরূপ ও সংগঠন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের ছিল। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ বলে থাকেন যে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পূর্বপুরুষ মানবাকার (anthropoid) প্রাণীর (বনমানুষ) কাছ থেকেই এই পরিবার-বদ্ধতার জীবনবোধটি লাভ করেছে। এই বোধটি মনুষ্য পর্যায়ে এসে আরও দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। এবং রূপান্তরিত হয়ে, অর্থাৎ এই বোধটি কেবলমাত্র সহজ প্রবৃত্তির (instinct) আওতায় না থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির (culture) আওতায় এসে পড়েছে। যা ছিল কেবল মাত্র সহজাতপ্রবৃত্তি তা সভ্যতার আওতায় এসে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় হ'ল। এরূপ সংঘবদ্ধ জীবন-ধারার মধ্যে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অপর সকল ব্যক্তির জীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়, বিশেষ করে শিশুর মায়ের জীবনে সহজাতপ্রবৃত্তি ও পরিবারবদ্ধ জীবনের আনুসঙ্গিক বোধ, কর্তব্য চেতনা দ্বারা এই পরিবর্তন প্রভাবিত। গর্ভাবস্থা থেকেই ভাবী মায়ের জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের কিছুটা শারীরিক অপটুতা ও পরনির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর পর শিশু জন্মাবার পরে তার শরীরযন্ত্রে আরও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নতুন প্রতিবেদনও দেখা যায়। শিশু ও মায়ের পরস্পরের প্রতি প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। পরস্পরের প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। মা সন্তানকে নিরীক্ষণ করে, আদর করে, বুকের দুধ পান করিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলে। সন্তানও এর প্রত্যুত্তরে

যথাযথ প্রতিবেদন দেখায়। এ একেবারে প্রশ্নাতীত প্রবৃত্তিবেগ। কাজেই মা ও শিশুর সম্পর্ক একটা দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্ক যতই দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত হোক না কেন, প্রতিটি মনুষ্যসমাজে এ সম্পর্কের উপর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়; যেমন প্রতিটি সমাজেই গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মাবার পর পর্যন্ত মাকে নানা ভাবে নানা রকমের টাবু (taboo) মেনে চলতে হয়, নানা রকমের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোথাও এসকল ধর্মীয়, কোথায় নীতিগত, কোথাওবা স্বাস্থ্যবিধি-সম্পর্কীয়। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে মা ও শিশুর সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির হস্তক্ষেপও প্রবল। এই হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হয়। এই হস্তক্ষেপের মধ্যে শিশুর মঙ্গলবিধান এবং মায়ের মনকে শিশুর প্রতি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যও পরিলক্ষিত হয় এবং মায়ের প্রবৃত্তিসমূহকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ও মায়ের সম্পর্কের ভিত্তি প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত। এই সম্পর্কের যথাযথ রূপায়ণের মধ্যে শিশুর মঙ্গলময় বিকাশ বিধৃত। ভালবাসার সূত্রে উভয়ের সম্পর্ক গ্রথিত। কাজেই ভালবাসার বঞ্চনা শিশুর বিকাশে বাধা স্বরূপ।

মা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, বাবা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি তেমন দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়? পিতা-ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কি কোনও সহজাত প্রবৃত্তি নেই? সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব প্রাণীধারার যে স্তরে বিন্দুমাত্র নেই, অর্থাৎ মানবেতর উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মা-প্রাণীটির গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে শাবক জন্মাবার পরও কিছুদিন পুরুষ প্রাণীটি সঙ্গী হিসাবে থাকে। এই পুরুষ প্রাণীটিই তখন মা ও শিশুর আহার সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুর শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। আসলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীটির এই জোড়-বাঁধা অবস্থা তাদের সঙ্গম-কাল (mating period) থেকে শুরু হয়। এদিক থেকে পরস্পরের প্রতি যে কোমল আবেগ ও আকর্ষণ তার ভিত্তিস্বরূপ একটি দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত দিক দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গিনীর প্রতি এই সহজাত আবেগধারাই কালক্রমে সন্তানের প্রতি বর্ধিত হয়। কাজেই পুরুষ ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে পরোক্ষভাবে একটা সহজাত প্রবৃত্তিগত দিক রয়েছে যা এর ভিত্তিস্বরূপ। পুরুষ প্রাণীটি এই সহজাত আকর্ষণের ফলেই শিশু-প্রাণীটিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, আহার সংগ্রহ করে দেয়, হাঁটা-চলা, শিকার করা, ওড়া, আত্মরক্ষা করা শেখায় এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

মনুষ্য সমাজেও দেখতে পাই যে পুরুষ তার সঙ্গিনীর সাথে থাকছে (বিবাহের মধ্য দিয়ে যা সম্পন্ন হয়)। গর্ভাবস্থায় তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নিচ্ছে। সঙ্গিনীর সাহচর্যের মধ্য দিয়ে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও কোমল অনুভূতিধারা বিকশিত হতে থাকে। এই আকর্ষণ ও অনুভূতি ধারাই সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়। "Once a man is made to remain with his wife to guard her pregnancy, to observe the various duties which he usually has to fulfill at birth, there can be not the slightest doubt that his response to the offspring is that of impulsive interest and tender attachment."

"It seems to me that the only factors which determine the sentimental attitude in the male parent are connected with the life led together with the mother during her pregnancy." (Malinowaski, 1953)। এরপর সামাজিক অনুশাসন, নীতি-বোধ, নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও টাবু এই অনুভূতিকে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় করে তোলে। অর্থাৎ যা ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতি-দত্ত ও সহজাত, তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির আওতায় এসে আরও স্থিরনির্দিষ্ট ও দৃঢ় হলো। এখনও এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মায়ের গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের সময় বাবাকে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান ও টাবু মেনে চলতে হয়। এমন কি বাবার মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করা হয় যার ফলে গর্ভাবস্থার ও প্রসবক্ষণের সকল শারীরিক ও মানসিক উপলক্ষণগুলি সে অনুভব করতে থাকে। এরূপভাবে বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা শরীরগত ও প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে মায়ের সাথে সন্তানের একটা প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্ক এবং তার থেকে উৎপাদিত একটা প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। যদিও পরোক্ষভাবে আমরা একটা প্রবৃত্তিগত সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখতে পাই। উভয় ক্ষেত্রেই সভ্যতা-সংস্কৃতি এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে তুলছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মূল উপাদান হিসাবে কিছুটা সহজাত-প্রবৃত্তি না থাকলে কেবল মাত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা এমন একটা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হতো না। সভ্যতা-সংস্কৃতি কেবল সংস্কৃতই করতে পারে, কিন্তু তার মূল উপাদান চাই।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে যুগ যুগ ধরে প্রবৃত্তি ও সভ্যতা মিলে-মিশে মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই কারণেই মা, বাবা ও সন্তান এই তিন নিয়ে পরিবার। এর যে কোন একটিকে বাদ দিলে

পরিবারের সম্পূর্ণতায় ত্রুটি থেকে গেল। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে এর একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এমন কোন কালও পরিলক্ষিত হয় নি যখন একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছিল। এই জন্যই মা, বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক একটি সমবাহু ত্রিভুজের সাথে তুলনীয়। সকলেরই সমান স্থান, সম উপযোগিতা। সন্তানের জীবনধারণ ও মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবার, উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পুরুষ ও নারীর আত্মবিকাশ ও অনুভূতির উপলব্ধির জন্য শিশুর অস্তিত্বের প্রয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার এমনই একটি সংস্থা যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের আত্মবিকাশ সম্ভব। অবশ্য পরিবারের রূপ কি রকম হবে তা অন্য কথা।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশু কিছুটা বড় ও আত্মনির্ভরশীল হলেই মা, বাবাও শিশুর একত্রে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাদের ভিতরের সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। মানুষ তখনও এই সম্পর্ককে অটুট রাখে। কারণ মানুষের অস্তিত্বের জন্য এটা প্রয়োজন। তার সামাজিক আত্মবিকাশের জন্য এটা প্রয়োজন। পরিবার নামক সংস্থার মধ্য দিয়েই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই মানব পরিবার অটুট থাকে। এইভাবেই মানুষ তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে।

শিশু জন্মাবার পর মুহূর্ত থেকেই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মায়ের উপর নির্ভরশীল। এখানেই মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সমধিক। এই নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি শিশুর একটা আকর্ষণ, একটা আঁকড়ে থাকার মানসিক ভাব জন্মায়। শিশুর এই নির্ভরশীলতা (বুকের দুধ খাওয়া ইত্যাদি) অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মায়ের প্রতি এই আসক্তি বজায় থাকে। কিন্তু এই আসক্তি তার সামাজিক বিকাশ ও আত্মবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। এই সময় মা ও বাবাকে শিশুকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের নিজ নিজ অবদান নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। শিশুর পক্ষে যেখানে মা-বাবার শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শেষ সেখানে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার শুরু। শিশুকে এই সময় শিখতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে নতি, শ্রদ্ধা ও বিনম্রতা। শৈশবে মা, বাবা ও ভাই-বোনের সাথে শরীরগত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি যে আকর্ষণ ও আসক্তি জন্মায় তাকে পরিমার্জিত করতে হয়। এ কাজ তার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বিরোধী। অর্থাৎ এক কথায় তার সমস্ত কামশক্তি (libido) পরিমার্জিত ভাবে নতুন খাতে প্রবাহিত করার শিক্ষণ পেতে হয়। এই শিক্ষণের ক্ষেত্রে মা ও বাবার নিজ নিজ দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। যে ইডিপস সংস্থিতি (Oedipus situation) ও অজাচার ইচ্ছার (incest desire) জন্ম পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সাহচর্যে, তার নিষ্পত্তিও হয়

পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সহায়তায়। এই কঠিন কাজ সম্পন্ন হয় মা-বাবার যথাযথ ভালবাসার পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে। এর উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে শিশুর শৈশব কালের ও পরবর্তী কালের মানসিক সুস্থতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর কাছে 'মা হয়ে আছে আদর, আবদার, কমনীয়তা প্রভৃতির প্রতীক; আর বাবা হয়ে আছে ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা, ক্ষমতা, উচ্চ আকাঙ্খা প্রভৃতির প্রতীক। এই দুইয়ের যথাযথ সমন্বয়ে পূর্ণতা।

মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক জন্ম মুহূর্ত থেকে। শিশুর শারীরিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবে মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসার বিকাশ হয়। মায়ের সাথে শিশুর এইভাবে একটা চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। এই চাওয়া আস্তে আস্তে বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে নানা মানসিক-বোধের সীমায় গিয়ে পৌছায়। সে মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা, স্নেহ, প্রশংসা প্রভৃতি চাইতে থাকে। এই সকলের 'পাওয়ার' মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা বাড়তে থাকে। কিন্তু বাস্তব কারণেই, শিশুর মঙ্গলের জন্যই, সকল চাওয়ার পরিপূর্তি মায়ের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। যখন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই শিশু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুকে এই সময়ই শিখতে হবে তার নিজের ক্রোধ, ঘৃণা, কামনাকে সংযত করার কৌশল। এই শিক্ষণ কাজে মায়ের ভালবাসাই তার সহায়। মায়ের ভালবাসার জন্যই তাকে কামশক্তিকে সংযত করে ভবিষ্যৎ সুস্থ ব্যক্তিত্বের সোপান তৈরি করতে হয়। শিশুর জীবনের এই দোদুল্যমান মুহূর্তে মায়ের যথাযথ ভালবাসা তাকে পথ চলতে সাহায্য করে। এই ভালবাসার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা বঞ্চনা থাকলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে।

শিশুর জীবনে বাবার প্রকৃত আবির্ভাব ঘটে কিছু পরে; শিশুর জন্মের প্রথম বছরের শেষের দিকে। তার জীবনে বাবা আবির্ভূত হয় যেন শৌর্য-বীর্যের মূর্তি ধারণ করে। বাবাও যে তার বস্তু চাহিদা মেটাচ্ছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। তার মায়ের সমস্ত কর্ম-শক্তির পিছনে যে তার বাবার উপস্থিতি কাজ করছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। যে রথে চড়ে সে এই পার্থিব ভোগের কাজে যাত্রা করেছে, তার যে দুটি চাকা, মা ও বাবা, এটা আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার উপলব্ধি হয়। কিন্তু বাবার সাথে এই পরিচয়ের মুহূর্তে শিশু আবার একটি ধাক্কা খায়। সে দেখে বাবা তার ভোগের অংশীদার। এমনকি মায়ের ভালবাসায়ও সে ভাগীদার। এবং সে তার অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। কাজেই বাবা সম্পর্কে শিশুর মনে (বিশেষ করে ছেলে) একটা ভয়, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিমোহিত ভাব দেখা দেয়। কাজেই বাবা শিশুর কাছে যেন একটু দূরের

মানুষ থেকে যায়। এই দূরের মানুষকে কাছে করে নেওয়ার জন্যই শিশু মনশ্চিত্র প্রক্রিয়ার (phantasy activity) আশ্রয় নেয়। সে বাবার মত হতে চায়, তাকে অনুকরণ করে। এই সময় শিশুর জীবনে মায়ের থেকে বাবার অবদান বেশি। শিশুর সংযত সামাজিক বোধের বিকাশে বাবার অবদান অসামান্য। "What the mother does in this respect in minute-to-minute and day-to-day criticizing, praising and guiding, the father normally re-inforces by his very presence." (Burlingham & Freud, 1947). কামশক্তিকে দমন করে ঠিক পথে চলতে বাবা তাকে সাহায্য করে। এই জন্যই একটি পিতৃহীন, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ কিশোর বয়সের ছেলেকে বার বার বলতে শোনা গেছে, "আমার ছোটবেলা আমাকে শাসন করার কেউ ছিল না, আমাকে যা খুশি তাই করতে দেওয়া হয়েছে, আমাকে কেউ শাস্তি দেয়নি ; সেইজন্যই আমার আজ এই দশা !" ছেলে-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেই বোধ হয় বাবার অবদান বেশি। একদিকে বাবা যেমন তার সুখ উপভোগের সহায়ক, অপর দিকে সে বাধাস্বরূপ, বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে। এই উভয়বিধ পরিস্থিতি শিশুর মধ্যে বাবার প্রতি একদিকে একটা গোপন বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলে অপর দিকে বাবাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির (identification) সাহায্যে এই জটিল পরিস্থিতির একটা মীমাংসা করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার রাস্তাকে সুগম রাখে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করে বাবার ভালবাসা পাওয়া এবং তার প্রতি বাবার যথাযথ ব্যবহারের উপর। এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটলে শিশুর ব্যবহারে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেবে। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাবার ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে মা তার অংশীদার হয়ে দেখা দেয়। আবার মা'ই তার প্রাত্যহিক সুখ উপভোগ মেটাচ্ছে। কাজেই মায়ের প্রতি তার গোপন ঘৃণা ও ভালবাসা পাশাপাশি দেখা দেয়। কিন্তু সেও এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারসাম্যতা আনে মাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির সাহায্যে। এও নির্ভর করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার বোধ ও শিশুর প্রতি তার যথাযথ ব্যবহারের উপর। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে একটি শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবা উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। এখানে বেশি-কমের প্রশ্ন নেই ; কারণ যে কোনও একজনের অবদানের অভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। আর এই অপূর্ণতাই স্বাস্থ্যহীনতা।

শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হলো মাত্র। তবে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে মা-বাবার ভালবাসা কারণস্বরূপ বিরাজ করে। কাজেই শিশুদের প্রতি মা-বাবার সংযত

আচরণ, তাদের প্রতি বয়স্কদের উপযুক্ত আচরণ সুস্থ সমাজ-গঠনের সহায়ক। মনে হয় সেই আদিম কাল থেকে মানুষের সমাজে মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে শিশু-পালনের বিচিত্র ধারা। আজ মনোবিজ্ঞানীদের ভাবার সময় এসেছে এই সম্পর্কের কোন্ রূপটি যথাযথই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর এবং সেটি লাভের সহজতম উপায়ই বা কোন্‌টি।

সহায়ক পুস্তকসমূহ

১। Deprivation of Maternal care

—World Health organization, 1962.

২। Infants without families.

—Burlingham and A. Freud, 1947.

৩। Child Psychology,

A. T. Jersild, 1957

৪। Comprehensive Text book of Psychiatry, Ch. 44

—Editors —Freedman & Kaplan, 1967

৫। Primitive Society.

—Lowie, 1953.

৬। Sex and Repression in Savage Society,

—Malinowaski, 1953.

৭। Psychology and Mental Health

—Hadfield, 1952

৮। Fatherless Children

—Susan Isaacs & etc. 1945.

৯। Maternal care and Mental Health

—Bowlby, 1951.

১০। Child care and the Growth of Love

—Bowlby, 1945.

১১। Mental Health and Hindu Psychology

—Swami Akhilananda, 1952.

ঔপন্যাসিক লরেন্স ও ফ্রয়েড

অমল শঙ্কর রায়

ডি এইচ লরেন্সের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপন্যাস 'সনস্ এণ্ড লাভার্স' (Sons and Lovers) পড়লে সাধারণতঃ মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রন্থটি কি ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণের প্রভাবেই রচিত? তার কারণ, এর গল্পাংশের ভিতর ঈডিপাস্ মানসকুটের এক আশ্চর্য শিল্পরূপ বিকাশ লাভ করে বলে আমার ধারণা। উপন্যাসের নায়ক পল। পল এর পিতা মদ্যপ ও বদরাগী আর সামান্য কারণেই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করেন। এজন্য পল-এর মাতার বিশেষ দৃষ্টি তাঁর সন্তানদের প্রতি ও তাদের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি সর্বদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। আর সন্তানেরাও মায়ের প্রতি প্রবলভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করা যায়, এ মোহের প্রবলতম রূপ দেখা দেয় পল ও তার মায়ের আকর্ষণের ভিতর।

লরেন্সের জীবনীকারেরা বলেন লরেন্সের জীবনেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দেয়। লরেন্সও বাল্যজীবনে তাঁর পিতাকে তাঁর মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দেখেন ও সেজন্য পিতার প্রতি তাঁর মনে বৈরীভাব জন্মায় আর মাতার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকর্ষিত হন। বস্তুতঃ ঐ আকর্ষণ এত তীব্র প্রকৃতির ছিল যে যতদিন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন লরেন্স কোন রমণীকে বিবাহ করতে অসম্মত হন। যতদুর জানা যায়, তিনি স্পষ্টতঃই বলেন যতদিন তাঁর মা জীবিত আছেন ততদিন তাঁর পক্ষে কোন নারীকে বিবাহ করে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একটি নারী লরেন্সের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন কিন্তু লরেন্স তাতে সম্মত হন নাই। পরে তাঁর মাতার মৃত্যু হলে তিনি অপর একটি নারীকে বিবাহ করেন।

যতদুর জানা যায়, লরেন্স যখন উক্ত উপন্যাসখানি লিখতে সুরু করেন তখন পর্যন্ত তিনি ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন বই পড়েন নি। কিন্তু উপন্যাসটি রচনার সময় অথবা সেটা প্রকাশ করার কিছুকাল পূর্বে তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। এ পরিচয়ের মূলে বিদ্যমান তাঁর প্রণয়িনী ফ্রিডার

প্রভাব। ফ্রিডা ফ্রয়েডের চিন্তাধারাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেন। তিনি দিনের পর দিন লরেন্সের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার ফলে লরেন্সের ভিতর ফ্রয়েডের চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল করে পরিচয়-লাভের ইচ্ছা দেখা দেয়। তিনি তখন ফ্রয়েডের গ্রন্থগুলি মূল জার্মান ভাষায় পড়েন।

সুতরাং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব লরেন্স-রচিত উক্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঠিক কি ভাবে ও কতখানি মাত্রায় প্রভাবশালী হয় সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলব, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভের ফলেই হোক বা লরেন্সের মানস-প্রদেশে তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ক্রিয়াশীলতার প্রভাবেই হোক, ঐ উপন্যাসে ঈডিপাস্ মানসকুটের শিল্পাশ্রিতরূপ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হওয়ার পর লরেন্স লক্ষ্য করেন তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মিল সেটা ব্যক্তির যৌন-শক্তি অবদমনের কুফল সম্পর্কে। উভয়েই অভিমত প্রকাশ করেন যে যৌনেচ্ছার তৃপ্তি ঘটানো, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানসিক সম্পদলাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা ঘটাতে পারে। তবে যৌনবৃত্তির প্রকাশ জীবনে সর্বপ্রথম কোন স্তরে দেখা দেয় সে বিষয়ে দুই চিন্তাবিদের মত বিভিন্ন। ফ্রয়েডের মতে এর অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তির শৈশব-কালে সর্বপ্রথম আঙ্গুল চোষা, কামড়ানো, চিবানো প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ করে, তার-পর মল-নিঃসরণ বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আনন্দলাভের ভিতর দিয়ে ও পরিশেষে লৈঙ্গিক ব্যবহারজনিত সুখলাভের মাধ্যমে। কিন্তু লরেন্স বলেন শিশুর ভিতর যৌনবৃত্তির রূপ বিদ্যমান থাকতে পারে না, জীবনে এ প্রকাশ সর্বপ্রথম দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালে। এছাড়া যৌনশক্তি তৃপ্ত হলে তার ফলে মনের ভিতর যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার রূপও দুই চিন্তাবিদের মতে ভিন্ন প্রকৃতির। ফ্রয়েড মনে করেন যৌনেচ্ছা তৃপ্ত হলে ব্যক্তির ভিতর স্বভাবী মানসিকতার রূপ বিকাশ লাভ করতে পারে। মনো-বিশ্লেষনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন বহু স্থলে ঐ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকার দরুণ সেটা অদ্ভুত ধরণের সংবদ্ধতার (Fixation) রূপ পরিগ্রহ করে, নয়ত সেটা যৌনবিকৃতি বা অপচার রূপে (Perversion) দেখা দেয়। এছাড়া তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে; এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির অস্বভাবী মানসিকতার ভিতর শৈশবকালীন কোন ইন্দ্রিয়সুখমূলক কামনার বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু সে সম্পর্কে সাধারণভাবে বিচার করলে মানুষ কিছুই জানতে পারে না। তার কারণ ঐ অঙ্কুরের কেন্দ্রস্থল সচেতন মনের ভিতর নয়,—মনের অবচেতন (Unconscious mind) প্রদেশে। এ বিষয়ে ফ্রয়েড

আশার কথাও বলেন। তিনি বলেন অবচেতনের উপাদানকে মনের সচেতন প্রদেশে আনতে পারলেও পরে বাস্তব বোধের-(Ego) শক্তির প্রয়োগ ঘটালে অবচেতনের অনিষ্টকর প্রভাবকে লুপ্ত বা স্তিমিত করে ফেলা সম্ভব হতে পারে। তবে কোন কোন স্থলে ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের উন্নয়ন (Sublimation) ঘটাতে সক্ষম হয়। ফ্রয়েড বলেন এ এক ধরনের প্রতিরক্ষণ-কৌশল (Defence-Mechanism) ও এ ধরনের ক্রিয়াশীলতা অবলম্বন করে মানুষ অবচেতনের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

লরেন্সের মতে যৌনবোধের তৃপ্তি ঘটলে মানুষ মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক মানসিক সম্পদের সন্ধান পান। তবে ঐ যৌনেচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে কোন অপরাধ-বোধের স্পর্শ থাকা চলবে না। আর এস্থলে যৌনবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও থাকা চাই। কিন্তু এ সম্পদ যে ঠিক কি ধরনের সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট অভিমত লরেন্স দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি ঐ সম্পদকে বাস্তবতা (Reality)-নামান্তর বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এ এক রহস্যময় ('mysterious') শক্তিবিশেষ। মনের গভীরে এর অবস্থান এক আনন্দময় সত্তা রূপে। মনে প্রশ্ন জাগে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করলে এর স্বরূপ মেলে কি? কোন সমালোচক বলেন লরেন্স মূলতঃ একজন কবি ও একথা মনে রেখেই তাঁর সাহিত্যকে বিচার করা সমীচীন। এজন্য লরেন্স-কথিত মানসিক সম্পদকে তাঁর কবিপ্রতিভানিঃসৃত এক চিত্রকল্পের রূপ বললে বোধ করি ভুল হয় না। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ইয়ুং-প্রবর্তিত অ্যানিমা (Anima) নামক প্রতিরূপের কথা। কিন্তু অ্যানিমার সঙ্গে লরেন্স-কল্পিত ঐ মানসিক সত্তার প্রভেদ আছে। তার কারণ, অ্যানিমা শুধু আনন্দময় নয়, এর ভয়ঙ্করীরূপও দেখা দেয়। কিন্তু লরেন্স-কল্পিত মানসিক সম্পদ শুধুই আনন্দমূলক।

তবে লরেন্স-কল্পিত মানসিক সম্পদ বস্তুতঃ কি ধরনের মানসিকতার বিকাশ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করতে হলে তাঁর 'দি লষ্ট গার্ল' (The Lost Girl) নামক উপন্যাসের নায়িকার উপলব্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে তা থেকে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করা যাক। আলভিনা সুন্দরী ও শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী। সে কয়েকটি তরুণের সাহচর্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাদের কারোও সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। পরিশেষে তার ভিতর প্রণয়মূলক আসক্তি জন্মায় এক দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত ইটালীদেশীয় যুবকের প্রতি। যুবকের নাম সিসিও। আলভিনা সিসিওকে বিবাহ করে। বিবাহের পরে তারা ইটালীতে সিসিও-র বাড়ীতে বাস করে। দরিদ্রের সংসার। যে পরিবারে আলভিনা লালিত-পালিত হয় সেটা এ থেকে ভিন্ন ধরণের। সেজন্য আল-

ভিনাকে নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যৌনসম্পর্ক ও মনের মিল ছিল আশ্চর্য ধরণের। লরেন্স বলেন আলভিনার ভিতর প্রবৃত্তিগত নিম্ন-স্থানের সত্তার (Lower Self) চাহিদা তৃপ্তিলাভ করার ফলে তার উচ্চমানের সত্তার (Higher Self) বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। মনে হয় এরই দরুণ তার ভিতর এক আশ্চর্য ধরনের প্রশান্তি দেখা দেয়। তার ভিতর না ছিল অতৃপ্তিমূলক মনোভাব, না ছিল কোন চাঞ্চল্য বা দ্বন্দ্ব। আলভিনা যেন বাস করে এক কামনার অলকাধামে। লরেন্সের ভাষায় ঐ অবস্থায় তার ভিতর সত্যকার ব্যক্তিসত্তার ('Real Self') উপলব্ধি জন্মায়। লরেন্স একে শোণিতের জাগরণ ('Blood Consciousness') বলেও আখ্যা দেন। লরেন্সের মতে এ ধরনের উপলব্ধি আর্থিক সচ্ছলতা বা প্রাচুর্য অথবা বুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চাই গভীর প্রেমানুভূতির স্পর্শ ও যৌনেচ্ছার তৃপ্তি সাধন। মনে হয় এ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক অভিমতের মিল আছে। ফ্রয়েডও যৌনচাহিদার তৃপ্তিসাধনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে তিনি বলেন অনেক ক্ষেত্রে মনের গভীরে প্রতিকূল মানসিকতার রূপ অবদমিত থাকার দরুণ স্বাভাবিক প্রেমবোধ বিকাশলাভ করতে ব্যাহত হয় ও মনঃ-সমীক্ষণের পদ্ধতি অনুসারে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ স্বভাবী মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা যায়।

মনে হয় লরেন্স ও ফ্রয়েড যে যৌনেচ্ছা পূরণের প্রাধান্যের কথা বলেন, এ ধরনের অভিমতে হিন্দুদের চিন্তা-দর্শনের সমর্থনও মেলে। হিন্দুদর্শন দাম্পত্যজীবনের যৌনমূলক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। লরেন্সের মতে কামপ্রবৃত্তি দেহ ও মনোগত এক বিশিষ্ট ধরনের উপাদান, ফ্রয়েড একে জৈবশক্তির একটি দুর্বাধ প্রকৃতির অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেন ও হিন্দুদর্শন যৌনবৃত্তির আধিক্যকে একটা রিপু বলে আখ্যা দেয়। সুতরাং এ শক্তির সঙ্গে একটা মীমাংসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে যে অগ্রাহ্য করা চলেনা এ ধরণের অভিমত তিনটি চিন্তাদর্শনই পোষণ করে।

লরেন্সের মতে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্নপ্রকৃতির। পুরুষের কর্মক্ষেত্র মূলতঃ বহির্জগতে সম্প্রসারিত ও নারীর প্রধান কাজ পুরুষকে ঐ কাজে সহায়তা করা। পুরুষের ভিতর যে শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে নারীর নিবিড় সাহচর্য লাভ করে পুরুষ ঐ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। সুতরাং লরেন্সের মতে, সভ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের ভূমিকাই সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্রয়েড মূলতঃ মনোবৈজ্ঞানিক। তিনি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেন। ফ্রয়েড বলেন মানুষ বস্তুতঃ উভকামী (Bisexual) অর্থাৎ পুরুষের ভিতর

নারীসত্তা ও নারীর ভিতর পুরুষসত্তা বিদ্যমান ও তিনি মনে করেন পুরুষ ও নারীর ভিতর যে বিপরীত সত্তা বর্তমান, সেগুলি মনের অবচেতনে অবদমিত হয়ে থাকলে তার ফল মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে তিনি ঐ অবদমিত ব্যক্তিসত্তার স্বভাবী প্রকাশ ঘটাতে চান। এছাড়া নারী পুরুষের ভিতর স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি হলে সেটা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হতে পারে এমন মতও তিনি পোষণ করেন।

ফ্রয়েড ও লরেন্স উভয়েই শিশুর সঙ্গে তার মায়ের নিবিড় সম্পর্কের উপযোগিতার কথা বলেন। এস্থলে শিশুর পিতার প্রতি বৈরীভাব দেখা দিতে পারে একথা তাঁদের অভিব্যক্তির ভিতর মেলে। তবে শুধু বৈরীভাব নয়, শিশুর সঙ্গে পিতার হৃদ্যতামুলক সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরণের অভিমতও তাঁরা পোষণ করেন। লরেন্সের মতে অল্পবয়সে কোন মানুষের সঙ্গে তার পিতার অপ্রীতিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হলে তার প্রভাব জীবনে হাণিকর হতে পারে। তিনি বলেন এর ফলে ব্যক্তি পিতৃজ্যোতি ('Father Spark') লাভে বঞ্চিত হয়। পিতৃজ্যোতি বলতে তিনি বোঝেন পিতার চারিত্রিক ঐশ্বর্যলাভ। তিনি কোন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখে জানান যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাঁর মায়ের প্ররোচনায়। তিনি ও তাঁর ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় যখন স্কুল বা অন্য কোন স্থান থেকে ফিরতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মা তাঁদের বাবার বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি করতে থাকেন। এ থেকেই তাঁদের মনে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব.দেখা দেয়। বস্তুতঃ তাঁদের বাবা হয়ত খারাপ মানুষ ছিলেন না ও তাঁদের মা-ই বোধকরি অত্যন্ত অধৈর্যপ্রকৃতির ছিলেন। মনে হয় লরেন্স যাকে পিতৃজ্যোতি বলে আখ্যা দেন সেটা ফ্রয়েড-প্রবর্তিত অধিশাস্তা (Super ego) সামিল। ফ্রয়েড বলেন মানুষ অধিশাস্তার প্রভাবে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে পারে।

ঈশ্বর ও ধর্ম দুই চিন্তাবিদের অভিমত ভিন্ন প্রকৃতির। ফ্রয়েড-তত্ত্বে ঈশ্বরের স্থান নাই। মামুলি ভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করা হয় সেটা মায়া (Illusion) ভিন্ন আর কিছু নয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকে ফ্রয়েড শিশুর শক্তিমান পিতার নিকট আবেদনের সমর্থক রূপে বিচার করেন। বস্তুতঃ ধর্ম বলতে বুঝায় কর্তব্যের প্রেরণায় কর্ম করা। মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বলব, সংবিৎ (Consciousness) ও যুক্তিনির্ভর জীবনদর্শনের প্রয়োগকেই প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য করা চলে। ফ্রয়েড বলেন এ ধরণের মানসিক বিকাশের পথে প্রধান বাধা স্বরূপ দাঁড়ায় শিশুসুলভ ও অযৌক্তিক মানসিকতার প্রভাব। লরেন্সের রচনায় ঈশ্বর ও ধর্ম-প্রসঙ্গের উল্লেখ মেলে। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর এক মহাশক্তির প্রকাশ। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, মানুষ প্রভৃতির

ভিতর ঐ শক্তির আংশিকরূপ বিকাশমান হয়। তবে ঈশ্বর অজ্ঞেয় ('Unknowable') লরেন্স বলেন আমরা মামুলীভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করি সেটা একটা ভাব বা ধারণামাত্র ('idea') ও এর ভিতর নৈতিকতাকে ('morality') খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু এ স্থলে বলা চলে এ ধরণের আদর্শকে অনুসরণ করলে মনের স্বভাবসম্মত মানসিকতার প্রকাশ ব্যহত হতে পারে। তিনি বলেন এ পথের অনু-সরণ সমীচীন নয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে,—বাহ্য-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ের সহায়তা লাভ করে। এই ভাবে চললেই জীবনের পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলা সম্ভব হতে পারে। এই পথে চললেই মানুষ তার শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে ও প্রাণস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলতে পারে। বাস্তব জীবনে এ ধরণের জীবনবোধের সঙ্গে পরি-চিত হতে হলে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর অকৃত্রিম প্রেমানুভূতিরও প্রয়োজন আছে। এ জীবনবোধ ও জীবনানুভূতির স্পর্শ মানুষকে এক আনন্দময় সত্তায় উপনীত করতে পারে ও স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে। লরেন্সের মতে এই পথই ধর্মের পথ ও এই পথই তার আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

ফ্রয়েড যাকে মৃত্যুপ্রবৃত্তি (Death Instinct or Thanatos) বলে অভিহিত করেন, লরেন্সের চিন্তাদর্শনের ভিতরেও অনুরূপ শক্তির উল্লেখ মেলে। মৃত্যুপ্রবৃত্তি ধ্বংসাত্মক ইচ্ছার নামান্তর। এস্থলে ধ্বংস বলতে শুধু অপর ব্যক্তির ধ্বংসসাধন বুঝায় না, প্রতিকূল বা দুর্নীতিমূলক পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মনের ভিতর যে হিংসা-ত্মক মনোভাব সমাজবিরোধী বা অপরাধ-বোধ বিদ্যমান তার রূপান্তর বা উন্নয়নও বুঝায়। লরেন্স লিখেছেন, 'Anything that triumphs, perishes' (Reflections on the Death of a Porcupine)। এ ছাড়া তার একটি পত্রে মেলে: 'There is a Prince of Darkness. Some times I wish I could let go and be really wicked—kill and murder—but kill chiefly. I do want to kill. But I want to select whom I shall kill......It is this black desire that I have become conscious of.' (Letters) তবে মনে হয় লরেন্সও ফ্রয়েডের ন্যায় বিশ্বাস করেন, হিংসাবৃত্তির উন্নয়ন সম্ভব। তার কারণ তিনি ধ্বংসাত্মক শক্তির অতি-ক্রমণের ('Transcendence') উল্লেখ করেন।

এবার লরেন্সের বিভিন্ন উপন্যাসে যৌনশক্তির বিকাশের যে রূপ পাওয়া যায় তার বিবরণ দেওয়া যাক। তাঁর 'দি ট্রেসপাসার' (The Tresspasser)—এ প্রকাশ-মান ঈডিপাস মানসকূটের রূপ, 'দি অ্যারন্‌স্ রড' (The Aaron's Rod)--এ চিত্রিত

হয় প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট স্বামীর আত্মসমর্পণের রূপ, 'দি ভার্জিন এণ্ড দি জিপসী' (The Virgin and the Gipsy)—তে ব্যক্তির অগোচরে তার মনের গভীরে কি ধরণের মানসিকতা বিরাজ করতে পারে তার রূপ বিকাশমান হয়। 'দি প্লিউমড্ সার-পেণ্ট' (The Plumed Serpent)—এ যে জীবনচিত্র মেলে তা থেকে জানা যায়, প্রেম যদি অকৃত্রিমরূপে আত্মবিকাশ না করে তার ফল শুভ হয় না ও 'সেণ্ট মর' (St. Mawr)—এ পাওয়া যায় নারী যদি পুরুষের প্রেমলাভে বিফলমনোরথ হয় তাহলে সে অন্যভাবে বিকৃত ধরণের যৌনাসক্তিতে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

তবে লরেন্সের চিন্তাধারার ভিতর একটি বিরাট কূটভোগের (Paradox) পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'উইমেন্ ইন্ লাভ' (Women in Love) নামক উপন্যাসে। রুপার্ট ও উরশুলা পরস্পরকে ভালবাসে। উরশুলা রুপার্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। রুপার্ট-এর প্রেম গভীর বটে, তবে সে বলে তার মনের খানিকটা সে তার এক পুরুষবন্ধুর উদ্দেশ্যে অর্পণ করে। একথা শুনে উরসুলা হতবাক্ ও শঙ্কাগ্রস্ত। এ কেমন কথা? —প্রেমকে কি দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব? রুপার্ট তার প্রেমিকাকে বুঝাতে চেষ্টা করে, হৃদয়কে অকৃত্রিম-রূপে উভয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ বস্তুতঃ সম্ভবপর। প্রেমিক-প্রেমিকার ভিতর এই নিয়ে বহু তর্কাতর্কি হয় ও খানিকটা ভুল বুঝাবুঝিও দেখা দেয়। পরে তাদের মিলন ঘটে ও তারা বিবাহ করে।

কিন্তু প্রশ্ন, লরেন্সের লেখনী থেকে এ ধরণের কল্পনা দেখা দিল কেন? বাস্তবে কি এটা সম্ভব? একজন পুরুষ কি একটি নারী ও একজন পুরুষের প্রতি এক সঙ্গে ও সমভাবে কিংবা অনেকটা একই ধরণের ভালবাসা অর্পণ করতে পারে? কোন সমলোচক বলেন লরেন্সের মতে প্রেম শুধু যৌনাসক্তিকে কেন্দ্র করে বিকাশ-লাভ করে না,—এর সম্প্রসারিত রূপ মানব-প্রেম রূপে দেখা দেয়। এস্থলেও তদ্রূপ ঘটেছে।

তবু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যদি সত্যিকার ও যৌনাসক্তি-মূলক প্রেম দেখা দেয় তাহলে সেটা কি সর্বপ্রাপ্তিকরূপ নিয়ে বিকাশলাভ করে না? স্বভাবী প্রকৃতির প্রেম কি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে? কিন্তু যে স্থলে এরূপ ঘটে, সেখানে বুঝতে হবে ব্যক্তির অবচেতন প্রদেশে যৌনাসক্তিমূলক অতৃপ্তির বীজ নিহিত রয়েছে। মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন এ ধরণের অতৃপ্তির মূলে সকল স্থানেই বিদ্যমান ঈডিপাস মানসকূটের দুর্বার প্রভাবের রূপ। মনে হয় এস্থলেও ঐ ধরণের মানসিকতার সক্রিয়তা অংশগ্রহণ করে।

আমরা মনে করি লরেন্সের অভিজ্ঞতালব্ধ ঈডিপাস মানসকূটই এ ধরণের কল্পনের জন্মদাতা। বস্তুতঃ এই ভাবেই লেখকের মনের গভীরে বিদ্যমান কোন সংবদ্ধতার (Fixation) রূপ সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তবে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি মূলতঃ যৌনাসক্তির নগ্নপ্রকৃতির বিকাশের প্রভাবে ঘটেনা, এর অভিব্যক্তি প্রকাশমান হয় অপূর্ণ ও অবচেতন যৌনেচ্ছার উন্নয়নের (Sublimation) ফলে। সুতরাং বলা চলে উক্ত কূটাভাসের মূলে লরেন্সের ঈডিপাস মানসকূটের প্রভাব বিদ্যমান।

এখানে উল্লেখ করব, বিশিষ্ট ধরণের শিল্প ও বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃষ্ট রচনাগুলির ভিতর রচয়িতার অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার রূপ নানাভাবে দেখা দেয়। কোথাও সেগুলি বিকাশ লাভ করে উন্নয়নের রূপ নিয়ে, কোথাও রূপান্তরিত (Transformation) হয়ে আর কোথাও কোন প্রতীককে কেন্দ্র করে। তবে আমার বিশ্বাস সকল স্থলেই লেখক বা শিল্পীর অতৃপ্ত ইচ্ছার রূপ দুর্গের গোপনতা রক্ষা করে মনের গভীরে বিরাজ করে ও বিশেষ ধরণের শক্তির প্রয়োগে ঐ অতৃপ্ত ইচ্ছা সৃষ্টিমূলক সক্রিয়তার মাধ্যমে এক কামনার অলকাধাম গড়ে তোলে। প্রকৃষ্ট শিল্প বা সাহিত্য ঐ অলকাধামেরই স্বরূপ।

একটি নব প্রক্ষোভবাদ সম্বন্ধে অভিভাবন (২য়)

(ইং ১৯৩২ সনে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা বিভাগের সভাপতি ডঃ সুহৃদ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাষণ, —Suggestions for a New Theory of Emotion-এর বাংলা অনুবাদ।)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১)

ও

গৌরী চট্টোপাধ্যায় (২)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুভূতির মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ক্রুগার (Krueger) উপস্থাপিত তত্ত্ব একটি যথেষ্ট রীতিবদ্ধ মতবাদ। মনোবিদ্যায় "প্রক্ষোভের বিভিন্ন সমস্যা, গুরুত্ব এবং মৌলিকত্ব, উৎস আর সর্ব্বব্যাপী শক্তির প্রকাশ" সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর এই সংশ্লেষক সামাগ্রক মতবাদ (synthetical total conception) যখন ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ষ্টুম্‌ফ্ (Stumpf) পর্যন্ত একে অবোধ্য ব'লে আখ্যাত ক'রেছিলেন। অবশ্য আজকের দিনে এটিকে আর তত অবোধ্য ব'লে মনে হয় না কারণ এর একটা দিক, গেষ্টাল্ট্ (Gestalt) দিকটি—সাধারণকে এর প্রতি মনোযোগী হ'তে বাধ্য ক'রেছে। প্রত্যেক জিনিষ, এমনকি যেগুলিকে তুলনামূলক বিচারে আমরা আলাদা করতে পারি, "সেগুলিও একে অন্যের সঙ্গে অথবা অন্যকে কেন্দ্র ক'রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থেকে একটা সামগ্রিক পূর্ণতার সৃষ্টি করে, আর তার ফলেই তাকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। অনুভূতি এই সামগ্রিক পূর্ণতার গুণগত অভিজ্ঞতা।" এই গুণগুলি প্রিয়তা (pleasantness), অপ্রিয়তা (unpleasantness), পীড়ন (tension), শ্লথন (relaxation) এবং বহু ধরণের রঞ্জনা (tintings), ঘণত্ব (shadings), বা আকারের প্রকরণ (forms of flights) হ'তে পারে। এগুলিকে কোন সংখ্যার দ্বারা সীমিত করা যায় না, আর ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে সে ভাবনা বাদ দিয়ে দেখা যায়, একে সম্পূর্ণরূপে বর্গীকরণও (classified) করা যায় না। অনুভূতি সম্বন্ধে এ'ধরণের বর্ণনা

(১) মনোমিতিবিদ (উপাধ্যায়), ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) উপাধ্যায়া, জগুহরী বিড়লা সমাজ-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

প্রক্ষোভান্বিত এবং অপ্রক্ষোভান্বিত এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য দূর করতে পারে কিনা, সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "বাস্তবিকই বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি (যেমন বস্তু বিনা উত্তেজনা, উত্তেজনার চণ্ডসুলভ প্রকাশ অথবা মেজাজ দেখানো) একটি যৌগিক ভাবের প্রকাশ। মূলতঃ স্বল্প-সংগঠিত আংশিক গূঢ়ৈষা (part-complex), যেমন,—যে কারণে আমি উত্তেজিত হ'য়েছি তারই চেতনার প্রতি, যা' আশা করি তারই দিকে, যা' খুঁজি সেটাই বা যে বিষয়ে ভীত তারই প্রতি আমাদের উত্তেজনার হেতু নিবদ্ধ হয়। অপরদিকে প্রপঞ্চবাদ বিষয়ক সাদৃশ্যতা ও রূপান্তরকরণের (phenomenological similarities and transformation) বর্ণনার জন্য এটাও সত্য যে এক ধরণের ঘটনা-বিন্যাস গুণগতভাবে অপর ধরণের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।" এরপর তিনি জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী এবং গবেষণাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ফলাফল তথা সিদ্ধান্তগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। সেই অনুসারে অনুভূতি সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যগুলি হোল—সার্বজনীনতা (universality), গুণগত প্রাচুর্য্য (qualitative richness), ভেদ্যতা (variability) এবং প্রবণতা (liability)। তাঁর প্রস্তাব ছিল এইসব নূতন বিভিন্নমুখী তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা ও পদ্ধতিগুলিকে রীতিবদ্ধ ক'রতে হোলে মানসিক সামগ্রিকতার একটা ধারণা থাকা চাই। এখানে মানসিক সামগ্রিকতা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হোল, "প্রথমতঃ, প্রক্ষোভের আভ্যন্তরীক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা (des erlebens); দ্বিতীয়তঃ, সার্বজনীন কার্মিক সংহতির সামগ্রিকতা (universal coherence of function); তৃতীয়তঃ এদের গাঠনিক সংস্থাপনার সামগ্রিকতা (totality of structural foundation) এবং শেষে, মানসিক এবং মানস-ভৌতিক (psycho-physical) গঠনের সামগ্রিকতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা আকার সৃষ্টির চেষ্টা সব সময়েই দেখা যায়, আর এই চেষ্টা অনুভূতির দ্বারা সংবদ্ধ। প্রত্যেকেই পরিগমের (environment) নিয়মগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বহু জন্মগত প্রক্রিয়ার অধিকারী। এইগুলি তার মানস-ভৌতিক অবয়বের আংশিক কাঠামো। এগুলি নমনীয়, সামগ্রিক বিচারে অবয়বীয়; সামগ্রিক অবয়বীয় গঠনের পরিবর্তন, পূর্বাবস্থাকরণ ও মুক্তিকরণ আর বৃহত্তর সামাজিক ও ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা এগুলি পরিবর্তিত হয়। শারীরিক ও মানসিক রুগ্নাবস্থায়, সংকটকালে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈপ্লবিক অবস্থায় এগুলি হয় ক্ষতিগ্রস্ত, না হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত।" মনস্তাত্ত্বিকদের উপরোক্ত অনির্দিষ্ট ধরণের স্বভাব পর্যবেক্ষন ক'রে, আকৃতি-প্রপঞ্চের (shape phenomena) কথা ব'লে বা কৃত্রিমজ অবয়ববাদী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে (structural reactions) জ্ঞানলাভ করে সন্তুষ্ট হ'য়ে বসে থাকা উচিত নয়,—সামগ্রিকতার বিচারে এই নিগূঢ় নোদনা সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যান এবং গবেষণা করা উচিত। এই কাজে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের (broadening

of outlook) প্রয়োজন, আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ফলের সমপর্যায়িক বিচারের মাধ্যমে একটি পূর্ণ রীতিবদ্ধ মতবাদ গড়ে তোলার প্রয়াস ক'রে যেতে হবে।

আপাততঃ আমি এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখে কাইসাউ (Kiesow) বর্ণিত সংবেদনের অনুভূতি-স্বন (feeling tone) তত্ত্বের প্রসঙ্গে আসছি। তিনি ষ্টাম্ফের (Stumpf) অনুভূতি-সংবেদন (feeling-sensations) তত্ত্বকে এবং জাইহেনের (Ziehen) অনুভূতির ঐন্দ্রিয়িক (sensualistic) ব্যাখ্যাকে অস্বীকার ক'রেছেন। ভ্যুণ্ড (Wundt)-এর সঙ্গে একমত হ'য়ে তিনি বলেছেন যে অনুভূতি মনের একটি মৌল উপাদান এবং তা' সংবেদন থেকে পৃথক। ভ্যুণ্ড-তত্ত্বের কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে টিচেনার (Titchener)-এর এবং ক্যুল্পে (Kulpe)-এর সমালোচনাগুলিকে মেনে নিলেও তিনি অনুভূতির মৌলিক গুণগুলির সংখ্যার প্রশ্নে ওঁদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি নিঃসন্দেহে বলেছিলেন—"প্রাচীন প্রিয়তা-অপ্রিয়তা তত্ত্বের এতখানি বিস্তৃতি নেই যাতে ক'রে এটি অনুভূতির বহু ভাব-অভিজ্ঞতার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখাতে পারে। আমাদের সম্পূর্ণ মানসজীবনকে বুঝতে হোলে অনুভূতির যে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে সেই প্রশ্নটি একমাত্র কোন বহুমাত্রিক তন্ত্র (multidimensional system) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।" শিশুদের ওপর গবেষণাগারিক পরীক্ষা এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের অবেক্ষণ ক'রে তিনি বুঝেছিলেন যে সংবেদন ও অনুভূতি একসঙ্গে সুরু থেকেই দেখা যায়, আর প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে সৃষ্টি হয় না।

ওয়াসবার্ণ (Washburn) দেখতে চেয়েছিলেন কখন প্রক্ষোভ চিন্তার গতিকে ব্যাহত করে আর কখন একে সাহায্য করে। তাঁর চিন্তার ক্রিয়াঙ্গ তত্ত্বে (motor theory) এই সমস্যা সমাধানের সুন্দর বর্ণনা আছে। পিল্‌সবেরী (Pillsbury) প্রক্ষোভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে জোর দিয়ে ব'লেছেন—"সমস্ত শিক্ষা-ক্রিয়া (learning) আর যেগুলিকে আমরা সহজ প্রবৃত্তি বলি, একমাত্র তাদের ক্রমিক প্রতিবর্ত (chain reflex) অংশগুলি ছাড়া, বাকিটা আধান বা প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে প্রক্ষোভ এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও অজ্ঞ।"

সুচারুভাবে লিখিত প্রবন্ধে ক্লেপারেদি (Claparede) অনুভূতি ও প্রক্ষোভের পার্থক্যকে কায়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে বলেছেন প্রথমটি আমাদের মানসিকতার উপযোগী এবং শেষোক্তটি কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না। জেমস্‌-ল্যাঙ্গ

(James-Lange)-তত্ত্বটি এই প্রসঙ্গে একটু অসুবিধা সৃষ্টি ক'রেছে।" যদি প্রক্ষোভ কেবলমাত্র জীবের প্রান্তিক-পরিবর্তনের (peripheral change) চেতনাই হয় তবে কেন তাকে অঙ্গীয় সংবেদন (organic sensation) ব'লে না ধ'রে প্রক্ষোভ ব'লেই প্রত্যক্ষ হয় ?" ক্লেপারেদির মতে, "প্রক্ষোভ, এই বিভিন্ন অঙ্গীয়-সংবেদনাদির গুণগত আকৃতির ধারণা,—একটি গেষ্টাল্ট্‌ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরার্থে প্রক্ষোভ হোল জীবের পরিবৃত্তিক প্রতিন্যাসের (global attitude) একটি চেতনা।" "বলতে গেলে বলতে হয় প্রক্ষোভের চেতনা জীবের আকারেরই চেতনা—তার শরীর-সম্বন্ধীয় প্রতিন্যাস।" প্রক্ষোভের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং অভিযোজনা ও প্রতিযোজনার মিশ্রণের আনুপাতিক হার অনুযায়ী তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ডানল্যাপ (Dunlap)-এর মতে একমাত্র আন্তরযন্ত্রীয় (visceral) পরিবতনের মাধ্যমেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বোঝানো সম্ভব। এইগুলিকেই প্রক্ষোভের বাস্তব সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়—প্রক্ষোভটিকে নয়। আন্তর-যন্ত্রীয় পরিবর্তনগুলি সাধারণ পটভূমিকায় কাজ ক'রে যায়, যার ফলে অন্যান্য বাহ্যিক পরিবর্তনগুলির উপস্থিতি বোঝা যায়। এই আন্তরযন্ত্রীয় পটভূমিকা গতীয় (dynamic) পর্যায়ের—অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া-চালনা ও আধারিত করার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যা' শেষ পর্যন্ত পেশী-সক্রিয়তার (muscular activity) কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রিন্স্‌ (Prince)-এর মতে প্রক্ষোভ-সম্বন্ধীয় বহু রহস্যেরই মীমাংসা হবে যদি একে শক্তি (energy) হিসাবে কল্পনা করা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন ব্যক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কাজ সম্পন্ন করতে যে ধরণের শক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, নিত্যকার কাজে সে পরিচয় রাখা অসম্ভব। মনে হয় এসময়ে তাঁরা যেন কোন সঞ্চিত শক্তির আধারে হাত ডুবিয়েছেন। আমার ধারণা তাঁরা এমন একটি উল্লাস (exaltation) স্তরে ওঠেন বা ভাবোল্লাসে (ecstasy) আপ্লুত হন কিংবা প্রক্ষোভজনিত সর্বকিছু বাধা হ'তে মুক্ত হন বা সেগুলিকে ত্যাগ করেন, যার ফলে সেই সঞ্চিত শক্তির আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে গিয়ে প্রক্ষোভের সব গতীয় শক্তির পূর্ণ কাম্যিকরূপ, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ওঠে। অ্যালবার্ট ভাইস্ (Albert Weiss) বলেছেন যতদিন না মানসিক-ক্রিয়া পর্যালোচনায় আপাতঃ কারণনিচয়কে (causal implications) ত্যাগ করা যাবে আর উদ্দীপন-প্রতিবেদন (stimulus-response) সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত হবে, ততদিন প্রক্ষোভ মনোবিজ্ঞানের একটা বিশেষ বিষয় বলে প্রতিভাত হবে না।। তাঁর মতে—"বৈজ্ঞানিক বিচারে, তুলনামূলক অন্যান্য মানসিকতার আপেক্ষিকতায় প্রক্ষোভ একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ, জৈব-সামাজিক (bio-social) উপযোজনায় এর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। প্রক্ষোভের প্রশ্নটি তখনই আসে যখন

জৈব-সামাজিক কোন নির্দিষ্ট কাজের নিয়তি-নির্দ্ধারক রূপে কোন অনির্দিষ্ট বাধা সৃষ্টি হয় বা কোন আঙ্গিক পরিচালনায় অন্তর্শক্তি এবং জৈব-সামাজিক উপযোজনায় নিয়তি-নির্দ্ধারকরূপে প্রকট হয়।

পুর্বোল্লিখিত 'অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মনস্তত্ত্ব' নামক পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখতে পাই ব্যুহ্‌লার (Buhler) বলেছেন শিশুদের ক্রীডাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে সুখসূত্রের পরে আর কিছু চিন্তা করার আবশ্যকতা নেই। কতকগুলি গতির প্রকাশই সুখের পরিচয়। তিনি এ'গুলির নামকরণ করেছেন 'বৃত্তি-সুখ' (Function Pleasure)। ম্যাক্ ড্যুগাল (Mc Dougall) কার্য্যিক সমগামীত্ব (functional relations)-এর সঙ্গে ঐচ্ছিক কর্মের বৃত্তিয় সম্পর্কের বিচারে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের গুণগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের ব্যর্থতা ও সাফল্য থেকে এবং এগুলির সাপেক্ষে অনুভূতির উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রক্ষোভ সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না বরং এসব কিছুর পুর্বে অভিজ্ঞাত হয়। সীশোর (Seashore) প্রক্ষোভের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বন-চিত্র-লিখন (phonophotography) নামক একটি নূতন দিক, একটি নূতন পদ্ধতির উল্লেখ ক'রেছেন। ষ্ট্র্যাট্‌ন্ (Stratton) উত্তেজনাকে অভিন্ন প্রক্ষোভ হিসাবে চিহ্নিত করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন এবং ব'লেছেন যে, বাহ্যিক পরিস্থিতিতে আমাদের বিভিন্ন আকাঙ্খাগুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। কার্ (Carr)-এর মতে প্রক্ষোভের অবস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম সংবদ্ধ ঘটনা-চক্রের মাঝে অসংলগ্ন ব্যবহারের মধ্যে, অন্যদিকে প্রক্ষোভহীন উপযোজনা অনেক সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ। হয়েসীংটন (Hoisington) ব'লেছেন "আনুভূতিক অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ এক ধরণের প্রেষ-বেদনের (pressure sensation) ন্যায়।" এই প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার স্থান-নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। গ্যল্ট (Gault) মুক-বধিরদের উপর স্পর্শ-উদ্দীপকের প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মুল্যবান পরীক্ষার ফল আমাদের পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

উপরোল্লিখিত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের শারীরবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আছে এই বিষয়ের উপর লিখিত তিনজন বিখ্যাত মনীষী—ক্যান্নন্ (Cannon), বেক্‌তেরেভ (Beckterev) ও পীরেঁা (Pieron)র তিনটি মুল্যবান প্রবন্ধ। ক্যান্নন্-এর মতে বর্তমান শারীরবৃত্তিয় তথ্যের ধারণা অনুযায়ী মস্তিকের থ্যালামাস বিভাগ হ'তে জাত অসাধারণ শক্তিশালী কোন প্রভাব মস্তিকের নিউরন-নিচয়কে উদ্দীপিত

করে, ফলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বেক্‌তেরেভ দেখিয়েছেন—"যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অনুভূতি ও প্রক্ষোভ নামে পরিচিত সেগুলি রক্তের গাঠনিক পরিবর্তনের জন্যই সৃষ্ট হয়। তাই এই মানসিকতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে জানতে হবে সেই সমস্ত শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়াগুলিকে, যার মাধ্যমে রক্তের দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন আসে। এই যন্ত্রগুলির কয়েকটি হোল অন্তর্গ্রন্থিরস-ক্ষারক (internal secretion)।" তিনি আরও দেখিয়েছেন—"কোন ব্যক্তির কোন মানসিক প্রকাশ হোল অনুরূপ উদ্দীপনের সাপেক্ষ প্রতিবর্তক। এই ধরণের প্রতিবর্তকগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরূপিত হয় কারণ প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কর্মের পূর্বানুমান (pre-suppose)। ওয়াট্‌সন (Watson) বিবৃত ত্রয়ী প্রক্ষোভ-প্রতিবর্তের (three emotional-reflexes) সঙ্গে আরও দুটি প্রতিবর্ত—জৈবিক সুখ ও জৈবিক অসুখ, যোগ করা উচিত। পরিশেষে তিনি দেখালেন যে তিনি এমন একটি প্রতিবর্ত-চিকিৎসা-পদ্ধতির (Reflex Therapy) উদ্ভাবন করেছেন যা একদিকে সাধারণ উদ্বায়ুর প্রাথমিক রোগচিহ্নগুলির ক্ষেত্রে, অন্যদিকে জটিল বিরক্তিকর অবস্থাগুলির ক্ষেত্রেও সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে। পীয়েঁ৷ বললেন প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় নার্ভীয় শক্তির অস্বভাবী-মোক্ষণের (abnormal discharge) জন্য। একে অস্বভাবী-মোক্ষণ বলা হয় কারণ, মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াদির জন্য যতটুকু মোক্ষণের প্রয়োজন এর পরিমাণ তার অপেক্ষা অনেক বেশী ; এবং অনেক সময়ে যখন সত্যই কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণ থাকে না তখনও এধরণের মোক্ষণ দেখা যায়। ফলস্বরূপ শারীরিক আন্তরযন্ত্রগুলির মধ্যে উত্তেজিত আবেগ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে,—যা' কেবল যে সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয় তা'ই নয়, ক্ষতিকারক এবং রোগজনিকও বটে। এর সঙ্গে আবার নার্ভীয় ক্ষয়ের ওপর এদের কুপ্রভাবগুলি যুক্ত হয়, ফলে শক্তি-মোক্ষণ অত্যধিক হ'তে থাকে। একমাত্র সেই সমস্ত উচ্চ জৈবিক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বা দ্যোতনা দেখা যায় যাদের আনুষঙ্গিক স্নায়ুনিচয় (associative nervous system) সুসংবদ্ধভাবে কাজ করে।

চতুর্থখণ্ডে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের রোগবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। পীয়ের জ্যানে (Pierre Janet) এখানে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত (melancholia) ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কর্মের প্রতি ভীতি একটা মুখ্য মৌল উপাদান। কোন কিছু করার মাঝে বাধা সৃষ্টি করাটাই কর্মভীতির প্রথম পর্ব। কোন কিছু করাকে বাধা দানের একটি প্রকৃতি হোল কেবল কাজটাই নয়, এর আরম্ভ করাটাই মনের মধ্যে না আনা। "কামনা (desire) আর কিছুই নয় কেবল কাজ সুরু করার ভাব আর এর সঙ্গে চেষ্টা (effort) জড়িত থাকে ব'লে মোটামুটি এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই এই রোগের রোগীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই কামনাকে বাধা দেয়, এমন কি এদের যথাসাধ্য

নিরুদ্ধ (supress) করে। এ ধরণের রোগীরা কেবল যে খাদ্য গ্রহণে গররাজি তা নয়, তারা দাবী করে তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনই নেই কারণ তারা ক্ষুধার্ত নয়, এমনকি তাদের খাবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই।" কামনাকে নিরুদ্ধ করার এই প্রচেষ্টা তাদের মনে জাগে কারণ তখন তারা কোনরকম সন্তুষ্টি বা সান্ত্বনার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না —ভবিষ্যৎ তাদের কাছে এক অন্ধকার গহ্বর বলে মনে হয়। কাজ করা থেকে এই পলায়ন-মনোবৃত্তির প্রসঙ্গে জ্যানে, "কর্ম ও অনুভূতির বিপর্যয়" (inversion of acts and feelings) নামে একটি বিস্ময়কর তথ্যের বর্ণনা ক'রেছেন। একটি কাজ করতে গিয়ে এই ধরণের রোগীরা সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি ক'রে বসল। এই ধরণের অসংগত ব্যবহারের ব্যাখ্যাদানে জ্যানে 'ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণ' (regulation of action) সূত্র নামে কতকগুলি সূত্রের অবতারণা করবার চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "কর্মই হোল মনস্তাত্ত্বিক বিচারে আসল বাস্তবতা এবং নৈতিক জীবনের মূলকথা —এগুলি সম্পাদন করার জন্য আমাদের প্রভূত শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন। এইসব বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত রোগীরা তাদের দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মভীতির বলি হ'য়ে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক-দুর্বলচিত্ততার প্রতিভূ ব'লে চিহ্নিত হন। কর্মভীতি যখন তাঁদের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে না তখন কাজটি করার পরিমাণ অল্পই হয়; তাঁরা মন্থর গতিতে কাজ করতে পারেন তবে তা নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও আমরা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে সব রকম শারীরবৃত্তিয় অপারগতার লক্ষণসমূহ দেখতে পাই যেগুলো কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের (central nervous system) মধ্যে অবক্ষয়ের ফলেই সম্ভব হয়।" তাঁর মতে, রোগীদের ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি গুরুতররূপে প্রকট হয়, সেইগুলিই সাধারণের ক্ষেত্রে লঘুভাবে দেখা যায়।

কার্ল য়োর্গেন্‌সেন্ (Carl Jorgensen)-এর অভিভাবনে ভয়, সুখ, দুঃখ, বাসনা, ক্রোধ, লজ্জা আমাদের প্রক্ষোভজীবনের মৌল উপাদানাদি। য়্যাড্‌লার (Adler)-এর প্রতিবেদনে অনুভূতি কোন স্বতন্ত্র দ্যোতনা নয়, তারা সক্রিয়ভাবে কোন কাজকেই পরিচালনা করে না। কিন্তু তা প্রত্যেক পরিপূর্ত-ক্রিয়ার (global action) ক্ষেত্রে যুক্ত থাকে। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একক উৎপাদক হোল তার মানসিক হীনমন্যতা (feeling of inferiority)। এই হীনমন্যতা এবং সামাজিক অনুভূতিগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। "যদি আমরা কোন অনুভূতিকে, কোন বিষয়ের দ্যোতনা ও জীবন-যাত্রা প্রণালী থেকে পৃথক ক'রে দেখি, তা'হলে কেবলমাত্র শারীরবৃত্তিক উৎপাদকগুলিই চোখে পড়বে। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য আমাদের জানতে হবে অনুভূতিটির গতির লক্ষ্য কি।"

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

["চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের ধারা" শীর্ষক যন্ত্রস্থ পুস্তকের "মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন" অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার।]

সভ্যতার ইতিহাসে বহু যুগ হইতেই উন্মাদরোগ বা Madness শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। হোমারের কাব্যে উন্মাদ রোগের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইউলিসিস পাগলামীর ভান করিয়াছিল। আজাক্সের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। লেভিটিকাসে এই রোগের যাহা বিধানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে বহু জীবন-হানির কারণ হইয়াছিল। "যাহার মস্তিষ্কে ভৌতিক বিকার হইবে অথবা যে মায়াবী— মৃত্যুই তাহার দণ্ড" অথবা "witch কে বাঁচিতে দিও না," এতাদৃশ বহু উল্লেখ যত্র-তত্র দৃশ্যমান। পুরাতন বাইবেলে মস্তিষ্ক-বিকৃতির খুব কম উল্লেখ আছে কিন্তু নুতন বাইবেলে বহু স্থানে মস্তিষ্ক-বিকৃতির উল্লেখ আছে। হিপোক্রিটিসের গ্রন্থমালায়ও ইহার উল্লেখ আছে, এবং অপ্রাকৃতিক কারণ হইতে ইহাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্ত্তীকালের গ্রীক লেখকেরা, বিশেষতঃ সোরেনাস্ (Soranus) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এই রোগের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা উপসর্গ অনুসারে ইহার শ্রেণীবিন্যাস করিয়া সহানুভূতি, বিবেচনা ও মানবিক অনুপ্রেরণা দ্বারা এই রোগের চিকিৎসার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অল্পকাল পরে পরবর্ত্তী শতাব্দীর সূচনার দিকে 'জাদুবিদ্যার' প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মীয় যাজকেরা উহাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের অভিযুক্ত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইল। এই যাদুকরদের দৈহিক লক্ষণ নির্ণয়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইল এবং অনুভূতিশূণ্য চর্ম ও ঝিল্লীস্তরের অবস্থানই উহার প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিল। আসলে ইহা হিষ্টিরিয়া রোগেরই একটি লক্ষণ

ইহাকে 'ভৌতিক চিহ্ন' ("Stigmata Diaboli") বলা হইত। ইহাদিগকে 'ডেভিল আশ্রিত' বলা হইত। বহু 'যাজক' ও 'সেণ্টের' ডেভিল বিতাড়ণের বিষয়ে নানা চিত্র বিশ্বের চিত্রশালাগুলিতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

৪৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'যাদুকর'কে (witch) খৃষ্টান অনুশাসনে সরকারীভাবে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ইহার পর ইহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। জ্যাকব স্প্রেঞ্জার (Jacob Sprenger) এবং হেইনরিখ্ ক্র্যামার (Henrich Kraemer) নামক দুইজন ধর্মযাজক পোপের অনুমোদন লইয়া যাদুকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং নিজেদের 'ভগবানের শিকারী কুকুর' (Domini Canes) বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের কাজ ছিল ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে কুকুরের মত ডাক দিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া। ১৪৮৯ খৃঃতে তাঁহারা "ম্যালিয়াস্ ম্যালিফিকেরাম্" (Malleus Maleficarum) নামক একটি গ্রন্থ (অর্থাৎ যাদুকরী-বিরুদ্ধ হাতুড়ী) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় ভাগে যাদুকরদের লক্ষণের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছিল তাহা সত্যই 'উন্মাদ রোগের' লক্ষণ। সে সময় জনসাধারণের 'জ্ঞান বিকৃতি' এইরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে ঐ পুস্তকখানি ৩০০ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। এইরূপে যাহারাই যাদুকর বলিয়া চিহ্নিত হইত, উৎপীড়নে মৃত্যুই তাহাদের মোক্ষলাভের একমাত্র পথ ছিল। ইহাই সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উন্মাদ রোগের পরিণতি ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই অবশ্য উন্মাদ চিকিৎসালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কেবল 'পাগ্‌লা-গারদ' অর্থাৎ কারাগার ছিল। লণ্ডনের বেথেল্‌হেম হাসপাতাল (Bethelhem Hospital) নামক চিকিৎসালয়টি ১২৪৭ খৃঃতে স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৩৭৭ খৃঃ হইতে উহাতে বিকৃত-মস্তিষ্কদের আগমন আরম্ভ হয়। একটি ১৩৯৭ সালের বিবরণীতে উহার আসবাবপত্রের হিসাবে পাওয়া যায় যে উহার আসবাবপত্রের মধ্যে ৪টি মিনেক্‌ল্‌স্ (Menacles), ১১টি লৌহশৃঙ্খল, ৬ জোড়া তালা-চাবি ও ২ জোড়া স্টক্‌স্ (Stocks) ছিল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ঐ পাগলা-গারদে উন্মাদ-রোগীদের অমানুষিক পীড়নের দৃশ্য লণ্ডনের আকর্ষণ ছিল।

পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের প্রথম আভাষ মনোবিজ্ঞানী জুয়ান লুই ভাইভ্‌সের [Juan Luis Vives (১৪৯২—১৫৪০ খৃঃ)] লেখা হইতে জানা যায়। কিন্তু কার্যতঃ ফলদায়িনী হইয়াছিল রাইণল্যাণ্ডের চিকিৎসক জোহান ভায়ার [Johann wyer (১৫১৫-৪৪ খৃঃ)] লিখিত পুস্তক ডি প্রেষ্টিজিস্ ডিমোনাম্ (De Praestigiis daemonum) —(অপদেবতা-অধিকৃতদের লক্ষণ) হইতে। ভায়ারই প্রথম মনোবিজ্ঞানী যিনি মানসিক

রোগীদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং মনোবিজ্ঞানকে খৃষ্টধর্মের অনুশাসন হইতে মুক্ত করেন। ঐ সময়েই ফেলিক্স প্লেটার [Felix plater (১৫৩৬-১৬১৪ খৃঃ)] বাসলোর শরীর-শাস্ত্রের অধ্যাপক (Anatomy) ছিলেন। পাগলা-গারদে যাইয়া পাগলদের মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনিই পাগলদের বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই শ্রেণীবিন্যাসে আধুনিকতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি মনোবিকারকে স্বাভাবিক কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই—উহা অপদেবতারই ক্রিয়াকলাপ বলিয়া স্থির করেন।

এইরূপ বহু অন্ধকার যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৭৯৩ খৃঃতে ফিলিপ পাইনেল [Philippe Pinel (১৭৪৫-১৮২৬)] নামক প্যারী শহরের একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের লেখক প্যারী নগরের উপান্তে বিয়েত্রে (Bieetre) নামক কুখ্যাত পাগলা-গারদের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইলেন। তিনি গারদখানার অমানুষিক অত্যাচারে আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিলেন। একজন প্রায় ৪০ বৎসর এবং অপর আর একজন প্রায় ৩৬ বৎসর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি তৎক্ষনাৎ উহাদের শৃঙ্খলমুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন। বহু কষ্টে পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন পাওয়া গেল। যাহা হউক এই মুক্তি বহু ক্ষেত্রে উন্মাদ-রোগীদের আরোগ্যের পথে পৌছাইয়া দিল। উন্মাদ-রোগের নূতন আলোকপাতের সুচনা হইল। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক হইতেই উন-বিংশ শতাব্দীর ফরাসী মনোবিজ্ঞানের নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডেও বিভিন্ন কারণে অনুরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল। উইলিয়ম টুকে [William Tuke—(১৭৩২-১৮২২)] ইয়র্ক শহরের কোয়েকস্ দলভুক্ত একজন বিশিষ্ট বনিক ছিলেন। কোয়েকস্ দলের নিয়ম ছিল সাধারণ জীবনযাত্রা ও উচ্চ-মার্গের চিন্তা। তিনি তাঁহার অবসর সময় পরোপকারে নিয়োগ করিতেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক শহরের পাগলা-গারদে একজন কোয়েকার অত্যাচারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টুকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া অতি মনঃকষ্টে সময় কাটাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইয়র্ক শহরের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আবেদন করিলেন। সকলেই অন্তরের সহিত সম্মতি জানাইলেন। অবশেষে সকলের সহযোগিতায় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ৩০টি রোগীর শয্যাসহ "রিট্রিট" (Retreat) নামক একটি উন্মাদ-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইল। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে, শৃঙ্খলমুক্ত, যতদুর সম্ভব বাধা-নিষেধ-মুক্ত আধুনিক যুগের সুচনাস্বরূপ প্রথম উন্মাদ-আশ্রম স্থাপিত হইল। উহাতে মনোচিকিৎসার জন্য দৈহিক নানাবিধ কাজে মনোনিবেশ ও নানারূপ শিল্পকর্মের কাজে

তাহাদের নিয়োগ করা হইল। মানবিক উচ্চ চিন্তাধারার এইরূপ অভাবনীয় শক্তি যে, যে সময়ে ফরাসীদেশে পাইনেল তাঁহার আরব্ধ সংস্কার কার্যসাধনের সঙ্কল্প করেন, ঠিক সেই সময়ই ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপভাবে টুকেকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। ফরাসী দেশে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ফলে পাইনেলের চিন্তাধারা ১৮০১ সালের পূর্বে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। টুকে ও পাইনেলের আন্তরিকতা সত্ত্বেও উন্মাদ আশ্রমের পরিচালনার সুবিধার জন্য বহু কর্মচারী বহু পাগলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিত এবং রক্ষীগণও অতি কঠোর ব্যবহার করিত। ১৮১৪ সালে কয়েকটি উন্মাদ রোগী ইয়র্কের উন্মাদ-আশ্রম হইতে পলায়ন করিলে জনসাধারণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট একটি বিশেষ কমিটি উন্মাদ-আশ্রমগুলির অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োগ করিলেন। উহাদের অনুসন্ধানের ফলে উন্মাদ-আশ্রমগুলির অতি শোচনীয় অবস্থার চিত্র প্রদর্শিত হইল। উন্মাদালয়ের সমস্ত পরিবেশ অতি কদর্য্য ও শৃঙ্খলাহীন ছিল। রক্ষীরা অজ্ঞ ও মমতা-হীন ছিল। শৃঙ্খল ও বন্ধন তখনও নির্বিচারে ব্যবহৃত হইত। একটি উন্মাদাগারে গলায় ও অঙ্গের নানাস্থানে লৌহ-আবেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া একজনকে একটি দণ্ডায়মান লৌহদণ্ডে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া ১২ বৎসর রাখা হইয়াছিল যে সে কেবলমাত্র শয্যাশ্রয় করিতে এবং দণ্ডায়মান হইতে পারিত। আর কোন অঙ্গ-চালনা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এইরূপ বহু অত্যাচারের চিহ্ন বর্ণনা করা হইয়াছিল। কয়েকজন শান্ত সৎকামী মানুষের চেষ্টায় ইহার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব ছিল। নূতন মতবাদ প্রচারের জন্য একজন উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন ছিল। জন কনোলী [John Conolly (1794-1866)] এইরূপ এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে চিকিৎকরূপে আগমন করেন। ১৮২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে উন্মাদ-রোগকে বিশেষ পাঠ্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিয়া ওয়ারউইকশায়ার শহরে সাধারণ চিকিৎসকরূপে কার্য আরম্ভ করিলেন। অচিরে তিনি ১৮৩৯ সালে মিড্‌লসেক্সের হ্যানওয়েল উন্মাদাগারে আবাসিক চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাই ইংলণ্ডের সর্ববৃহৎ উন্মাদাগার ছিল। ইহার পূর্বেই উইলিয়াম টুকে, তাঁহার পুত্র ও অন্য কয়েকজন দয়াশীল ব্যক্তির চেষ্টায় উন্মাদ-রোগীদের উপর অত্যাচার ও বন্ধনাবস্থা বহুলাংশে শিথিল হইয়াছিল। কনোলী হ্যানওয়েলে

যোগদান করিয়াই সকল প্রকার উন্মাদদের শারিরীক সর্বপ্রকাব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উদার ব্যবহার ও চিকিৎসার বিশেষ গুণে ৫ বৎসরের মধ্যে উন্মাদ-রোগীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অপ্রীতিকর কোন ঘটনাই উদ্ভূত হওয়া সম্ভব হইল না। তিনি তাঁহার কার্যপ্রণালী ও নূতন মতবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। সমগ্র ইউরোপে অনুরূপ সংস্কারের প্রবর্ত্তন সূচিত হইল।

এই অনাবদ্ধ আন্দোলন প্রবল প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। আমেরিকায় টমাস কার্কব্রাইড(১৮০৯-৮৩) এবং বেঞ্জামিন রাস (১৭৪৫-১৮১৩) এই সংস্কারের সূচনা করিলেন। কোন কোন গারদ যদিও শৃঙ্খলমুক্ত হইল কিন্তু রোগীদের কামরার বাহিরে তালাবদ্ধ থাকিত, সাম্প্রতিক কালেই কেবল সকল প্রকার মস্তিষ্ক-বিকৃত রোগীদিগকে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করা হইয়াছে। আধুনিক কালে কেবলমাত্র ব্যবস্থা-পণার গুণে ও ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে সর্ব-প্রধান বিষয় ছিল রোগীকে সর্বক্ষণ দিনে ও রাত্রে নজরাধীন রাখিতে হইবে।

তাহার পর ফ্রান্সে জঁা ইতিয়েন ডমিনিক্ এস্‌কুইরল (Jean Etienne Dominique Esquirol—1772-1840) এবং গুইলামে ফেরাস্ (Guilamme Ferrus—1784-1861) উন্মাদ-রোগ বিষয়ে বহু গবেষণালব্ধ পুস্তক রচনা করেন। ফেরাস্ উন্মাদাগারের বহুল বিস্তার করেন এবং তিনিই সবপ্রথম উন্মাদ-রোগীদিগকে অপরাধীদের দল হইতে পৃথক করেন। তিনি বিয়েত্রেতে প্রথম কর্মানিয়োগ-পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনিই ৩০শে জুনের (১৮৩৮) আইনের প্রধান হোতা ছিলেন। ঐ আইনের সাহায্যে পাগলদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং পাগলা-গারদের উন্নতি ও প্রদেশে প্রদেশে নূতন-নূতন উন্মাদ-আশ্রম স্থাপন করা হইল। জার্মাণীতে এই পরিবর্তন আগে মন্থর ছিল। সকল উন্মাদা-গারে জোহান ক্রিশ্চিয়ান রেইলের [Johann Christian Reil—1749-1813] প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। রেইল মানবিক হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি উন্মাদদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। তৎসহ মনস্তাত্ত্বিক কারণে "অনাঘাত উৎপীড়ন প্রথার" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উন্মাদদের জলে ডুবাইয়া রাখা হইত ; তাহাদের নিকট কামান ছোঁড়া হইত এবং সময়ে-সময়ে হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে নাটকীয় পরিস্থিতি উপস্থিত করা হইত—যাহাতে চিকিৎসক ও রক্ষকগণ বিচারক, দেবদুত প্রভৃতির ভূমিকা লইয়া রোগীর কল্পনায় দেখা দিতেন। কখনও বা কবর হইতে সদ্য-উত্থিত প্রেতাত্মার অভিনয় করিতেন। এই আদিম যুগের মানসিক আঘাত দেওয়ার পদ্ধতি বহুকাল প্রচলিত ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইহার পরিবর্তে প্রগতিশীল ওয়াইন্‌স্ এ্যাক্ট (Wynnes Act) প্রবর্ত্তন দ্বারা উন্মাদ রোগীরা সব সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল।

তাহার পর ১৮২৮ সালে পাগলা-গারদে প্রবেশ করিলে অনুমতি-পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। এবং ১৫ জন কমিশনার লইয়া অনুমতি-পত্র বিলির জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করা হইল। যাহাতে এই আইনের কোন অপব্যবহার না হয় তাহার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা লওয়া হইল। যাঁহারা এ ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন লর্ড শ্যাফ্‌টসবেরী তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন ডোরোথিয়া লিণ্ডে ডিক্স [Dorothea Lynde Dix—1802-87]। ইনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শিক্ষয়িত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কারাগারে, উন্মাদ-আশ্রমে প্রভৃতির অব্যবস্থা ও মানবিক অধিকারচ্যুতির শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আন্দোলন সুরু করিলেন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া প্রায় ৩২টি নূতন পাগলদের আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অন্যগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিকট বিবরণ দিলেন যে তিনি স্বচক্ষে ৯০০০ উন্মাদ, মৃগী-রোগগ্রস্থ ও বুদ্ধিভ্রংশদের দেখিয়াছেন। উহাদের যত্ন করিবার কেহ নাই। উহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। উহাদের লৌহদণ্ড দ্বারা শাসন করা হয়। হৃদয়হীন ব্যবহার দ্বারা তাহারা দিন-রাত উৎপীড়িত হইতেছিল। মহিয়সী মহিলা লিণ্ডে ডিক্স অতঃপর স্কটল্যাণ্ডে আসিয়া সেখানকার পাগলা-গারদগুলির অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন এবং তাঁহারই বিপুল চেষ্টায় এবং আন্দোলনে অচিরে মস্তিষ্ক-বিকৃত রোগীদের আশ্রমের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি রাজকীয় সমিতি গঠিত হইল। সদস্যদের আমন্ত্রণে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও বক্তৃতা দিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাগলা-গারদের আরো অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অনাবদ্ধ (non-restraint) অবস্থা কিছু কাল চলার পরই মানসিক-চিকিৎসালয়-সমূহে প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হইল। এই পৃথকীকরণের দ্বারা তাহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ব্যাধিকে কেবলমাত্র ব্যাধি ভাবিয়া চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের সাফল্য আসে নাই।

(ক্রমশঃ)

এক ঝলক

তরুণচন্দ্র সিংহ *

আমি আমার কথা লিখিতে বসি নাই, কলমচির কাজ করিতেছি মাত্র। তাহা কাহারও নির্দেশে বা অনুরোধে নয়, সেখানে আমার ইচ্ছার ক্রিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিব। তাহার বেশী কিছু নহে। কেন আমার অপরের কথা লিখিতে ইচ্ছা হইল সে কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন হইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো কারণ আরোপ করিবেন—তাহাতে তাঁহাদের মন্তব্য সিদ্ধ হইবে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজ বিশেষ ছিল না। রবীন্দ্র সরোবরের পারে চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া একটু জনবিরল ঠাঁই দেখিয়া ঘাসের উপর বসিলাম। আপন মনে সময় কাটাইতে নিরালায় বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই, তারাগুলি তাই যেন আরও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। বেশ লাগিতেছিল। এই শহরে আরামে নির্জনতা উপভোগ করার ভাগ্য বোধ হয় কাহারও নাই। একটু পরেই দুইজন যুবক আসিয়া কাছেই বসিয়া নিজেদের কথা বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজনই মূল বক্তা, অপরজন শ্রোতা। মাঝে মধ্যে দুই একটা কথা সে বলিয়াছিল মনে হয়। বক্তা যত কথা বলিয়াছিল সব মনে নাই। তবু মোটামুটি তাহার কথা যথাসম্ভব তাহার ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। ঠিক ঠিক লেখা সম্ভব হইবে না তাহা আমি জানি। অত কথা কি মনে থাকে! তবু যতটা পারি লিখিতে চেষ্টা করি।

হঠাৎ কানে আসিল বক্তা বলিতেছে "এই মাঠে বাদাড়ে অন্ধকার তবু সহ্য হয়, কিন্তু বাড়িতে বসেও যদি অন্ধকারে গুম হয়ে থাকতে হয় তবে কি তা সহ্য হয়! যখন তখন বাতি নিভে যাচ্ছে। কখনো তিন চার ঘণ্টা এক নাগাড়ে অন্ধকার চলল। কখনো আবার ফোক্কোরি করে—একবার অন্ধকার করে দিয়ে, ১৫ মিনিট পরে আবার জেলে দিয়ে, আবার ১০ মিনিট পরে নিভিয়ে দিচ্ছে। এ সব কি বলতো!

---

* মনঃ সমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়

বাজারে কেরোসিন পাওয়া যায়না। সাতদিন লাইন দিলে যাও বা সামান্য মেলে তাতে একটা বাতি কয়েক ঘণ্টা জ্বালানো চলে। মোমবাতির দাম এত বেশী যে কেনা সম্ভব নয়। আলোও এত কম হয় যে লেখাপড়া করা অসম্ভব। বাড়ীতে আর ৪জন লোক আছে তাদেরও তো আলো দরকার, কিন্তু পাবো কোথায়? ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা আছে, স্কুল-কলেজ আছে—পড়বার উপায় নেই। কেরোসিন নাকি চালান আসছে না। বিদেশের সাহায্য না পেলে আমাদের ঘরে শিবের সলতে জ্বলবে না। তারপর রেল চলে না, কর্মীদের ধর্মঘট, যাত্রীদের ইচ্ছে-মত রেল চলে না বলে লাইনে বসে থেকে গাড়ী চলা বন্ধ করা, ষ্টেশন লুটপাট, ভাঙ্গাচোরা, তছনছ, তার কেটে ফেলা, সব মিলে রেল চলাচল বিপর্যস্ত। তাই কয়লা আসে না, তেল আসে না, চাল ডাল আনাজ কিছুই ঠিকমত সরবরাহ হতে পারে না। রেশনের দোকানে বরাদ্দ মাপা চাল গম তাও মেলে না। খোলা বাজারে কেনবার উপায় নেই, সামর্থ নেই। কয়লার অভাবে, তেলের অভাবে কল চলে না—বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না, অন্যান্য কল চলে না বলে জিনিষ তৈরী হয় না—বাজার তাতে শুকিয়ে যাচ্ছে—ব্যবসা বানিজ্য—বন্ধ হয়ে আসছে, দেশে টাকা আসছে না।

কলের মালিকরা কল চালাতে পারে না বলে মজুর ছাঁটাই করছে বা ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে। লোকের রোজগার বন্ধ হচ্ছে—অরোজগারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—তাদের আর তাদের পোষ্যদের খাওয়াবে পরাবে কে? বড় বড় অফিসের প্রায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লেগেছে। ছোট আর মাঝারি ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বাজারে আগুন লেগেছে সব জিনিষের দামে। আয় নেই—ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আর রোজ খালি মিছিল আর অবরোধ-অভিযান চলছে।—

আজকাল'তো শিক্ষকরাও দিন-মজুরদের মত রাস্তায় মিছিল বের করছেন। তাতে পুরুষ-স্ত্রীলোক বলে আর বাছ-বিচার নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষণ বন্ধ করে রাস্তায় তাঁরা আন্দোলন সুরু করেছেন। তাঁদেরও এক কথা—টাকা চাই। ডাক্তার, ইনজিনীয়ার সব বড় বড় দায়িত্বপুর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁরাও সে দায়িত্ব অনায়াসে ঠেলে ফেলে দেশের ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের বেতন আর মর্যাদার মান বাড়াতে ধর্মঘট করে বসে আছেন।

এক রাজনীতির দল যুবকদের তোয়াজ করে চলেছেন, আরেকদল কৌশলে তাদের নিজের দলের সুবিধে করে নেবার কাজে লাগাচ্ছেন। আমাদের কেউ বা লাফ-ঝাঁপ করছে, কেউ মারধর করছে। কেউ বা মিটিং করছে। রাস্তার মোড়ে ভিড় জমিয়ে বেহিসেবী মন্তব্য করছে। পড়াশোনার পালা শিকেয় তোলা আছে। পরীক্ষার সময় স্বাধীনভাবে টোকাটুকি করবার সুযোগ না দিলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। পরীক্ষা বন্ধ, কর্তাদের ঘেরাও—যা-

খুশী তাই চলল। শিক্ষক পড়ান না—নিজেদের আত্মম্ভরিতা জাহির করে সময় কাটান আর একে অপরের বিরুদ্ধে দল পাকান। এইতো সাধারণ ছবি। ছাত্ররা শিখবে কাকে দেখে! বিশেষ খাতিরী ব্যাপারতো অকাতরে চলছে। যার যত বিদ্যে কম তার তত গর্জন বেশী। লেখাপড়া আর হবে কি করে! বিদেশী কর্তাদের লেখার থেকে ক' লাইন টুকে এনে ক্লাসে নোট লিখিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষার মান দেখানো হচ্ছে। দেশের টাকা যাচ্ছে ড্রেনের এঁদো জলে।

সহরে লোক গিজগিজ করছে। ট্রামে-বাসে ওঠবার উপায় নেই। সহরের উন্নয়ণ-পর্বের কল্যাণে যে দশা করা হয়েছে, তাতে পায়ে হেঁটে চলাও সহজ নয়। যদি একটু বৃষ্টি হয় তবে আর কিছু ভাববার অবসর থাকে না। সহরের অনেক বাড়িতে নোংরা জল উঠে আসে। যানবাহন চলাচল বন্ধ। ব্যাস, এদিকে কলকারখানায় অফিসে বা কলেজে, পরীক্ষার কেন্দ্রে সময় মত হাজির না হলে বিপদ। তাই নিয়ে আবার হাঙ্গামা। নাও এখন কোন দিকে কি করবে! অবস্থাটা এমন বাড়তে দেওয়া হয়েছে যে আর কোনও দিকে একপা বাড়ানোর উপায় নেই।

হ্যাঁ, সমস্যার সমাধান হবে কি করে? আমের চেয়ে আঁটি এখন বড় হয়ে গেছে যেমন দুর্নীতিগ্রস্থ দুর্বল শাসক, তেমন দুর্নীতিগ্রস্থ সাধারণ মানুষ। দেশের এ অবস্থায় চট্ করে কিছু হওয়া কি সম্ভব! জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—দেশের খাবার আজ সে পরিমান জোটানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বার্থপর বিদেশীদের নানা ক্রুর খেলা'তো চলছেই। যে কোনও সময় দেশের মধ্যে গোলমাল—বাইরে থেকে আক্রমন চাপিয়ে দিয়ে আমাদের উন্নতির চেষ্টায় যত রকমে পারে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের স্বার্থ তারা দেখছে। দোষ দিয়ে কি হবে, আমাদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করতে না পারলে অন্যে তার জন্যে দায়ী হবে কেন?

আমাদের ধন গেছে, নীতি গেছে, আদর্শ গেছে, বেঁচে আছে কেবল লোভ আর অহংকার। এদিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না—বিশৃঙ্খলা দুর করতে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। তার জন্য যদি কিছু দুর্বৃত্তের ধ্বংস করবার প্রয়োজন হয় তাও সাহসের সঙ্গে করতে হবে কালোবাজারীদের, মুনাফাবাজদের আর একদিনও সহ্য না করে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এসব যদি সরকার নিজে না করে জনতার উপর ছেড়ে দেন তবে দেশে অরাজকতা দমন করা যাবে না। দেখতেই পাচ্ছ, দেশ সেই দিকেই যাচ্ছে। সময় মত ঠিক মত অন্যায় দমন যেমন করেই হোক করতেই হবে। তারপরে আসবে আদর্শানুসারে গড়বার কাজ। আদর্শ ঠিক করতে হবে। মানুষ চাই। কেবল দলের

লড়াই নিয়ে দেশ শাসন করা চলে না—উন্নতি করা তো নয়ই। সকলের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে হলে জনসংখ্যা যেমন করে হোক কমাতেই হবে। বাধ্যতামূলক জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা নিতেই হবে। তা না হলে উপায় নেই। মানুষের খেয়াল-খুশীর উপর এতবড় বিষয় ছেড়ে দেওয়া এই প্রায় অশিক্ষিত দেশে চলতে পারে না—কঠোর হতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কোন বিদ্যালয়ের শেখানোর কথা বলছি না। সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বোঝাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান কথা মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শেখাতে হবে। সহজ কাজ মোটেই নয়, তবু তা করতে হইবে। কেবল ভাঙবার নেশায় মাতলে চলবে না। গড়বার দিকেও নজর দিয়ে চলতে হবে। দেশের যাঁরা জ্ঞানী-গুণী আছেন তাঁদের কাছ থেকে সরকারের উপদেশ নিয়ে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। শাসক-গোষ্ঠির হলেই সে কিছু সব-জান্তা হতে পারেনা। তাদের নিজেদেরও সে কথা বোঝবার, সেই অনুসারে মেনে চলবার শিক্ষা নিতে হবে। তা না হলেও আর উপায় নেই। বিপ্লব হলেও এই পন্থাই নিতে হবে— তা সে যে দলেরই দখলে দেশ শাসনের ভার আসুক না কেন। তোমাকে তো কতবার বলেছি......"

এক নাগাড়ে অনেক কথা শুনিয়া সেখান হইতে বাড়ি চলিয়া আসিয়াছি। আরও কত কথা হয়ত হইয়াছিল আর শুনিবার মত মন ছিল না—এলো-মেলো কথাগুলির মধ্যে কোথাও যেন গূঢ় সত্য নিহিত আছে এই বিশ্বাস লইয়াই বক্তা নিজের কথা বলিয়া গিয়াছে। আমি তার কিছু শুনিয়াছি।

ধৈষণা

তরুণচন্দ্র সিংহ

নব-বর্ষকে স্বাগত জানাই।

আশা না থাকিলে জীবনের রস-স্বাদ থাকে না, বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহও লোপ পাইয়া যায়। অতীত যেমনই হউক না কেন তবু সে অতীত। প্রতি মুহূর্তে বর্তমান অতীতে ঢলিয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান ক্ষণিকের, অতীত সেই তুলনায় অনেক বেশী বড় ভাণ্ডার। সেখানে কত ইতিহাস, কত সুখ-দুঃখের কথা, কত সফলতা-বিফলতার স্মৃতি, কত পাওয়া কত না-পাওয়া, কত সঞ্চয়ের, কত ক্ষতি ও হারানোর কাহিনী জমা হইয়া আছে। সেইসব স্মৃতি কখনো বা উজ্জল রং ছড়াইয়া বর্তমানকে ঝলক লাগাইয়া যায়, আবার কখনো কোনও বিষাদ মলিন ছায়া মনকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। বর্তমান ক্ষণিকের হইলেও তাহা অতীতের প্রসাদবিরহিত নহে। পিছনে যাহা ফেলিয়া আসা হয় তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। বর্তমানকে সেও কিছু দেয়। সে দান নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া আমরা বর্তমানকে দেখি আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ছক কাঁটি। এও এক রকমের স্বপ্ন দেখা। আমরা অতীতের স্বপ্ন যেমন দেখি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখি। বাঁচিয়া থাকার পথে প্রতিদিনের যত দ্বন্দ্ব-সমস্যা সে সবই এই আশা আমাদের অনায়াসে কাটাইয়া দিবার, ভুলাইয়া দিবার যাদু সামনে মেলিয়া দেয়। সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার কিনারায় এই আশার সোনালী আলো মাখাইয়া দেয়। আমাদের শত দুঃখেও তাই বাঁচিবার, উঠিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা করে। সম্মুখে তাকাইয়া, শূণ্যে হাত বাড়াইয়া, কিছু পাইবার জন্য চলিতে থাকি। কত চাই? তাহার কিছু বা পাই অনেকই পাই না। তবু চাই, তবু আশা করি, তবু চলি!

একটা বৎসরও কাটিয়া গেল। অতীতের ভাণ্ডারে আরও একটা বৎসর জমা হইল। তাই বলিয়া ভবিষ্যতের ভাণ্ডার হইতে কিছু কমিয়া গেল এমন কথা বলা যায় না। অতীত যেমন অনাদি, ভবিষ্যত তেমনই অনন্ত। মাঝখানে এই বর্তমানটাই ক্ষণিক। কিন্তু অতীত এই ক্ষণিকেরই মালা গাঁথা, ঐশ্বর্যে পুষ্ট, অনাগত অনন্ত ভবিষ্যত এই ক্ষণিক বর্তমানের প্রকাশের জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষারত। এই বর্তমানে দাঁড়াইয়া মানুষ একদিকে অতীত ও অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া চলে। এই দুই দিক হইতেই

সে জীবনের রস, জীবনের সম্পদ ও শক্তি আহরণ করিয়া চলে। জীবন তাই পরিমাপহীণ বিস্ময়ভরা, সেখানে কেবল দেখা-শোনা। অনুভব করার অফুরন্ত স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতে কত ঢেউ, কত বুদ্বুদ, কত রং-রেখার সৃজন অবিরাম ধারায় চলিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৃজনের শেষ নাই, মানুষের সৃজনেরও শেষ নাই। মহাকালের এ লীলার ছন্দে জগৎ-জীবন দোলায়িত। ইহার কোনও পরিমাপ করা চলে না। কত যুগ-যুগ ধরিয়া কত পাওয়ার সাথে কত না-পাওয়া মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। হাসি-কান্না এক সঙ্গে গলিয়া মিলিয়া এক অরূপের সৃষ্টি করিয়াছে। অতীতের এক বিশেষ শক্তি আছে। বর্ত্তমানে যাহা দুঃসহ, কদর্য, গ্লানিকর মনে হয় অতীত তাহাকেও রসসিক্ত করিয়া তুলিতে পারে। খণ্ডকে অখণ্ড, পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। বর্ত্তমান যেমনই হউক তাহা অতীতের ভাণ্ডারে যাইয়া আমাদের জীবনে রসের জোগান দিতে পারে, অতীত তাই জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবার পাথেয় জোগায়। আশা লইয়া মানুষ সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে।

আরও একটা বৎসর কাটিয়া গেল। কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, স্বভাবতই তার হিসাব করিতে চায় আমাদের ভয়ার্ত হিসাবী মন। কিন্তু সে হিসাব কোনো দিনই শেষ হয় না, হিসাব মেলে না। ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতার মত জীবনের হিসাব লেখা চলে না। জীবনে ক্ষণিকের মূল্যও অনন্ত হইয়া যায়, সামান্য সেখানে অসীম হইয়া যাইতে পারে, কণিকা মণিকা হইয়া দেখা দিতে পারে। কোন হিসাবী তার হিসাব রাখিতে পারিবে ! কৃপণের মত সে চেষ্টা করিয়া লাভ নাই, তাহাতে বর্ত্তমানটাকেই অকাল-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। এই অপমৃত্যুর দিকে তাই পা বাড়াইব না। সহজ খোলা মনে নববর্ষকে আহ্বান জানাই, সম্ভাষণ জানাই। আশার অরুণাঞ্জন মনে মাখিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিব, বর্ত্তমান তাহাতে সহজ হইবে, মধুর হইবে। বন্ধুর বিধুর পথে চলিতে হইলেও অতীতের রসসম্পদ আমাদের পাথেয় জুটাইবে। নববর্ষকে স্বাগত জানাই।

এই চিত্ত পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও আমরা অনেক পাইয়াছি ; অনেক সম্পদ লাভ করিয়াছি, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছি। আমাদের গত ১৫ বৎসরের চেষ্টায় যে কয়েকজন নিষ্ঠায় নিজেদের বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তা আমাদের পাঠকদের মনে নূতন চিন্তার সহায়ক হইয়াছে, নিজেদের ভুল ত্রুটি বুঝিবার, নূতন সৃজনশীল পথে চলিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের সেই অবদান সামান্য নহে। সাধ্যমত আমরা আরও চিন্তাশীল জ্ঞানী-গুণীদের নিকট হইতে সম্পদ লাভের চেষ্টা করিয়া চলিব। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও

প্রায় অরাজক অবস্থার কথা বলিয়া লাভ নাই, এ সম্বন্ধে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের মারফৎ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কম-বেশী সকলেই জানি। এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের বাঁচিতে হইবে, এবং ভবিষ্যতে যাহারা বাঁচিবে তাহাদেরও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। সকলের কাছে এই বিষয়ের সুস্থ চিন্তা ও মনোবল আশা করা যায় না। কিন্তু সর্ব কালেই এমন কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁহারা জীবনের সম্পদ-গৌরব ও সৃজনের শক্তিকে রক্ষা করিয়া চলেন ও সাধারণের মধ্যে তাহার প্রকাশ ও প্রচার করিয়া চলেন। সকল অবস্থায় সকল সময় তাঁহাদের সেই চেষ্টার স্পষ্ট ফল চোখে পড়ে না। এমন কি সকল চেষ্টাই ব্যর্থ এমন কথাও মনে হইতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা ভুল। দুর্দিনে কোথাও কোনও একটি প্রদীপও যদি জ্বালা থাকে তবে সময় মত তাহা হইতে হাজার বাতি জ্বালাইতে অসুবিধা হয় না। আর কিছু না থাকুক অন্ততঃ চকমকি পাথরখণ্ডকে রক্ষা করারও অশেষ মূল্য আছে। তেমন দুর্দিন যদি সত্যই ঘনাইয়া আসে তবু আমাদের চকমকি পাথরের খণ্ডগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। কালের কবলে পড়িয়াও তাহা অজেয়, অব্যয়। সত্য অমর। জ্ঞান অমর। সত্য, জ্ঞান ও কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাই।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

- লেখকদের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়; লেখকের অনুরোধসাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্‌ প্রিন্টও দেওয়া হয়।

- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

১৪, পার্সিবাগান লেন

কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

ষোড়শ বর্ষ

চিত্ত

প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় * ১৩৮১

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। নির্বিশেষ তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি অনুসৃত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হইবে না।

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Maharaja Printing Works, 6/1, Cornfield Road, Calcutta-19.

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

ষোড়শ বর্ষ | শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

স্থাপিত—১৯২২

সঞ্চল স্মৃতি

রমেশ দাশ *

যেখানে মৌচাক বাঁধে মৌমাছিরা, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত দূরদূরান্তের পুষ্প-বনে মধু আহরণ করতে যায়। নতুন নতুন পথে যাত্রা করলেও মৌচাকে ফিরে আসতে কিন্তু তাদের পথ ভুল হয় না। যে পথ দিয়ে যায় সে পথ দিয়েই তারা আবার ঠিক ফিরে আসে। মৌমাছিদের মতো পিপীলিকারাও খাদ্য সন্ধানে নিত্য-নতুন অভিযান করে নতুন নতুন পথে, কিন্তু ঘরে ফেরার পথ তাদের ভুল হয় না কোনদিন। যে পথ দিয়ে যায় ঠিক সেই পথ বেয়েই ফিরে আসে ঘরে। কীটপতঙ্গের মতো পশুপাখীর ক্ষেত্রেও এই বিস্ময়কর ক্ষমতাটি দেখতে পাওয়া যায়। সুদূর সাইবেরিয়ায় যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে তখন যাযাবর পাখীরা অনেক নীচে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ মণ্ডলে নেমে আসে, ঠাণ্ডা কমলে আবার তারা ফিরে যায় প্রিয় প্রদেশ সাইবেরিয়ায়। কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রতি বছর শীতকালে তাদের একাংশকে নিয়মিত আসতে দেখা যায় অনেকেই তা লক্ষ্য করেছেন। আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে একটি পোষা টিয়া ছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম গঙ্গারাম। গঙ্গারাম এতই পোষ মেনেছিল যে তাকে দাঁড়ে বেঁধে রাখার দরকার হতো না। সে মুক্ত অবস্থায় ঘরময় ঘুরে বেড়াত, ইচ্ছেমত বাইরে উড়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি যেত, আকাশে উড়ে বেড়াত, গাছপালার মগডালে বসে দোল খেত আবার খাবার সময় হলে কিংবা সন্ধ্যে নামলে বাড়ি ফিরে আসতো। গঙ্গারাম আমাদের সংসারের একজন হয়ে গিয়েছিল, তাকে ছাড়া আমাদেরও চলতো না। কিন্তু মাঝে মাঝে গঙ্গারামের কী যে হতো। দিনের পর দিন তার আর পাত্তাই মিলতো না। আমরা মন খারাপ করে বসে থাকতাম, চারপাশে ছুটোছুটি করে অথবা লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নিতাম। বেশ কিছুদিন পরে হয়তো খবর পেলাম দুতিনটে গাঁ ছাড়িয়ে আর এক গাঁয়ে কোন একজনার বাড়ির আনাচে কানাচে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। খবর পেয়েই ছুটতাম সেখানে। গঙ্গারাম আমাদের দেখতো কিন্তু ধরা দিতনা, পালিয়ে যেত। কিন্তু বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরে আশ্চর্য হয়ে সানন্দে লক্ষ্য করতাম আমাদের ফিরবার আগেই গঙ্গারাম বাড়ি পৌঁছে গেছে। এ ব্যাপারে বেড়ালের কেরামতি বোধ করি সবাইকে

---

*অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা সংস্থা, ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ, কলিকাতা।

হার মানায়। গৃহস্বামী বিরক্ত হয়ে তস্কর বেড়ালকে বস্তাবন্দী করে তিন চার মাইল দূরে ছেড়ে এসেছেন, নিশ্চিন্ত বোধ করছেন উৎপাত বিদেয় হলো বলে। কিন্তু হায়! দিন কয়েক পরেই দেখা গেল মূর্তিমানের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা একেবারেই বিরল নয়। গাড়ির বলদের এ ধরনের ক্ষমতার কথা পল্লীবাসী মাত্রেরই জানা আছে। দূর শহর থেকে মাল বোঝাই গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান বাড়ি ফিরছে। দু'চোখ ভরে তার রাজ্যের ঘুম নামলো। গাড়িতেই শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু গাড়ি ঠিক পথ ধরেই যথা সময়ে বাড়ি পৌঁছে গেল। এটা একটা অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ইষ্টিশন থেকে বারো মাইল দূরবর্তী মামাবাড়ীর গাঁয়ে যাচ্ছিলাম গোরুর গাড়ি চড়ে। ধু-ধু করা প্রান্তরে যখন পৌঁছলাম তখন অকস্মাৎ কালবোশেখীর ঝড় উঠলো। কী দুরন্ত সেই ঝড়! গাড়ি উল্টে পড়লো। আমরা ঝড়ের প্রচণ্ড ঠেলায় উড়ে চললাম। বলদগুলো কোথায় গেল কে জানে। আধঘণ্টা পরে আমরা একটা গাঁয়ে এসে ঢুকলাম। তখন ঝড় থেমে গেছে, প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। পরের দিন যখন হেঁটে মামাবাড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি তার আগের রাত্রেই বলদগুলো বাড়ি ফিরে গেছে।

কী করে এমন হয়? কীট পতঙ্গ পশুপাখীর মতো নিম্নস্তরের প্রাণী যাদের মস্তিষ্ক নিতান্তই অনুন্নত, পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ তাদের পক্ষে পথের নিশানা সতর্কভাবে লক্ষ্য করা এবং চিনে রাখা কি সম্ভব? বস্তাবন্দী বেড়ালের পক্ষে তো পথের নিশানা লক্ষ্য করে মনে করে রাখবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাহলে কেমন করে এইসব প্রাণী দলিত পথ দিয়ে আবার ফিরে আসে নিজের আশ্রয় নীড়ে? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এটা সম্ভব হয় সঞ্চল স্মৃতির (Kinaesthetic-memory) সাহায্যে।

অঙ্গ সঞ্চালনের (movement) যে অনুভূতি বা সংবেদন (sensation) তার রেশটিকে বলে সঞ্চল স্মৃতি। মনে করা যাক মৌমাছি 'ক' বিন্দু থেকে যাত্রা সুরু করে বরাবর পাঁচ মিনিট উড়ে চলার পর ডান দিকে বাঁক নিয়ে সোজা উড়ে চললে তিন মিনিট ধরে, তারপর বাঁদিক ঘুরে দু'মিনিট উড়ে যাবার পর 'খ' নামক একটি মধুপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলে এসে বসলো। এই অভিযাত্রার ফলে তার গতি পথের (সময়, দিক ও বাঁকের) একটি ছাপ পড়লো তার গহন সত্তায়। এই ছাপটাই তাকে 'খ' থেকে 'ক' বিন্দুতে ফিরে যাবার একটা অন্ধ অথচ নির্ভুল প্রেরণা জোগাবে। দম দেওয়া যন্ত্রের স্প্রিং যেমন পাকে পাকে খুলতে থাকে তেমনি ফেরার পথে মৌমাছি উল্টো দিকে প্রথম দু'মিনিট সোজা উড়ে গিয়ে ডান দিক ঘুরে তিন মিনিট উড়বার পর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে পাঁচ মিনিট উড়ে চলার পর ঠিক এসে পৌঁছে যাবে তার

মধুচক্রে। সে এ কাজটা করবে যন্ত্রবৎ নিছক দৈহিক অনুভূতির আবেশে, ভেবে চিন্তে নয়। সব কিছু মিলিয়ে সঞ্চল স্মৃতিকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালনের অনুবোধ বা অনুবেদন বলা চলে। জীবজন্তুর আশ্চর্য সময়বোধ দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। যে কোন লোকই পরীক্ষা করে এটা দেখতে পারেন। বাড়ির পোষা পাখী বা কুকুরকে যদি পাঁচ ঘণ্টা অন্তর খাবার দেওয়া হয় তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে পাঁচ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হলেই তারা খাবার জন্য ব্যাকুল হবে, তিন ঘণ্টা অন্তর খাবার দিলে ঠিক তিন ঘণ্টা পর পর তাদের মধ্যে এরকম ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়বে—যে খাবার দেয় তার কাছে, যেখানে খাবার দেওয়া হয় সে স্থানে এবং যে পাত্রে খাবার দেওয়া হয় সেই পাত্রের কাছে এসে নির্দিষ্ট সময়ে তারা ডাকাডাকি সুরু করে দেবে।

নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা করে আবার সেখানে ফিরে আসবার অদ্ভুত ক্ষমতাটি কবিগুরু তাঁর "প্রত্যাগত" কবিতায় সুন্দর ভাবে বলেছেন—"হেথা ফিরিবার তরে হেথা হতে গিয়েছিলে……আমার প্রাঙ্গণদ্বারে যে পথে করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।" "পথিক" কবিতায় তিনি বলেছেন—"কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা।" পথের রেখা পথিকের চিত্তে আঁকা হয়ে যায়, সেই রেখা ধরে আবার সে ফিরে ফিরে আসে। বলা বাহুল্য একই পথ দিয়ে যত বেশী যাতায়াত হবে, চিত্তে আঁকা পথের রেখাটি তত বেশী গভীর হবে, ফলে আসা-যাওয়ার কাজটাও হবে তত সহজ আর নিখুঁত।

সঞ্চল-স্মৃতি যে শুধু কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীকেই চালিত করে তা নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও তার প্রভাবটি অপরিসীম। নিশিচারণ (Somnumbulism) তার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। ঘুমের ঘোরে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় কেউ কেউ রাতের বেলা (সাধারণতঃ) ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন, তারপর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে আসেন বাড়িতে। কিন্তু সবটাই করেন সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায়, অথচ পথ চলতে ভুল হয় না। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিদেশী কাহিনী আছে। দীর্ঘ অদর্শনের পর শহরের বন্ধু এসেছে পল্লীর বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে তার সাদর আমন্ত্রণে। পল্লীর বন্ধু ডাকসাইটে জমিদার, বিরাট অট্টালিকা, অঢেল জমিজমা, ফুল ফলের বাগান। অতিথির আপ্যায়নের ত্রুটি হয়না। পান-ভোজনের এলাহি ব্যবস্থা। বন্ধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিকে সব কিছু দেখায়, ঘোড়ায় চড়ে বাগান পুকুর দেখিয়ে আনে। তারপর অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুজনে প্রাণ খুলে কত গল্প করে, অবশেষে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে শুতে যায়। এমনি করে মহানন্দে কয়েকটা দিন কাটবার পর একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। অতিথি বন্ধু দিনে দিনে বিমর্ষ

হয়ে পড়তে লাগলো। বিষন্ন মুখে বসে থাকে কথা বলে না। কিসের দুশ্চিন্তা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। বহু অনুনয় বিনয়ের পর বললো—প্রত্যেক দিন যে 'পোষাক'-গুলি ছেড়ে সে শুতে যায়, সকালে উঠে দেখে সেগুলি চুরি গেছে, অথচ ঘরের খিল ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গৃহকর্তা ব্যাপারটা কী জানবার জন্য একদিন অতিথি বন্ধুর কাছে একদিনের জন্য বিদায় নিয়ে তার অজান্তে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। রাত্রিবেলা বন্ধু যথা সময়ে ঘরে ঢুকে পোষাকগুলি ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে ঘরে খিল এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। অনেক রাত্রে গৃহকর্তা সবিস্ময়ে দেখলো বন্ধু শয্যা ছেড়ে আলো জ্বাললো তার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, চোখ মুখের চেহারা অস্বাভাবিক। সে ধীরে ধীরে পোষাকগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৃহকর্তা তার পিছু নিল। সে দেখলো এক মাইল দূরে একটা ফলের বাগানে ঢুকে বন্ধু মালীর কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি কুপিয়ে গর্তের ভেতর নিজের পোষাকগুলি রাখলো, তারপর সেগুলি মাটি চাপা দিয়ে আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে. আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পডলো বিছানায়। সকালে যথারীতি ঘুম ভেঙে দেখলো তার পোষাক নেই, সুতরাং বিষন্ন বদনে খাবার টেবিলে এসে বসলো। গৃহকর্তা তখন ধীরে ধীরে তাকে সব কিছু বললো। বাগানে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত হারিয়ে যাওয়া পোষাকগুলি তাকে দেখালো। এ ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিক অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু আমি আপাততঃ তার কথা এখানে বলছিনা, আমি বলছি বন্ধুটির বেহুঁস অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে ফিরে আসার কথা যা সঞ্চল স্মৃতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এ কাহিনীটি এক ধরণের মনোবিকারের উদাহরণ, কিন্তু সুস্থ মানুষও যে কখনো কখনো আচ্ছন্ন অবস্থায় নির্ভুল ভাবে জানা পথে চলতে পারে তার একটি নিদর্শন ছিল আমার মামাবাড়ির এক অতি পুরাতন ভৃত্য ভীম সিং, যাকে আমরা ভীমমামা বলে সম্বোধন করতাম। মামলা মোকর্দমার কাজে দাদামশাই প্রায়ই ভীমমামাকে চৌদ্দ-পনেরো মাইল দূরের এক কাছারিতে পাঠাতেন। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ চলা সহজ বলে ভীমমামা যথেষ্ট রাত্রি থাকতেই কাছারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পডতো। মাঝে মাঝে সঙ্গীও থাকতো দু-একজন। তারা বলতো, এবং ভীমমামাও স্বীকার করতো, যে সে বেশীর ভাগ পথটাই পাড়ি দিত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, তার সুশিক্ষিত পদযুগল কখনোই বিপথে যেত না, বিচ্যুত হতো না।

'কানামাছি' খেলার সময় ছেলেরা অনেকাংশে সঞ্চল স্মৃতির সাহায্য নেয়। অন্ধদের নিখুঁত গতিবিধি দেখে আমরা বিস্মিত হই। দেখতে না পেলেও তারা নির্দিষ্ট পথ

দিয়ে নির্ভুল ভাবে যাতায়াত করেন এবং বাড়ির কোথায় কি আছে সহজেই তার নাগাল পান। এটা স্পষ্টতঃই সঞ্চল স্মৃতির অপূর্ব কার্যকারীতারই নিদর্শন।

বস্তুতঃ সঞ্চল স্মৃতি যে আমাদের শুধু পথ চলতেই সাহায্য করে তা নয়, আমাদের অজস্র দৈহিক দক্ষতা গড়ে ওঠে তারই সাহায্যে। আমরা লিখতে শিখ, নাচতে শিখি, গাড়ি চালাতে শিখি, সাইকেল চড়তে শিখি—এই রকম আরও অসংখ্য দৈনন্দিন কাজে দক্ষতা অর্জন করি সঞ্চল স্মৃতির সাহায্যেই। বার বার 'ক' এই বর্ণটি লিখতে লিখতে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে ঠিক ভাবে হস্ত সঞ্চালন শুরু হলে পর নিভুল ভাবে বাকী সঞ্চালন গুলিও হয়ে যায়। বিশেষ তালে নাচতে আরম্ভ করলে নির্ভুল মাত্রায় পা গুলি পড়তে থাকে। যেখানে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন জড়িত, অথবা আগ্রহ খুব বেশী, সেখানে অভ্যেস না থাকলেও অঙ্গসঞ্চালনের পারম্পর্যে বড় একটা ত্রুটি ঘটে না। সেই কোন শৈশবে সাঁতার শিখেছিলাম, তারপর দীর্ঘকাল সাঁতার কাটিনি, কিন্তু আজও জলে নামলে নিশ্চয়ই সাঁতার কাটতে পারবো।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সঞ্চল স্মৃতির প্রভাব তার ওপর তত বেশী। শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার পথরোধ করলে দেখা যাবে তারা বিভ্রান্তভাবে অসহায় হয়ে দিকভ্রষ্টের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। তার কারণ তাদের চিন্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা নেই। তারা চালিত হয় যান্ত্রিক তাড়নায়। কিন্তু মানুষ যান্ত্রিকতা থেকে নিজেকে অনেকটাই মুক্ত করতে পারে তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। তার একটি দেহ আছে, তাই সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিকতা থেকে সে নিজেকে কখনোই মুক্ত করতে পারবে না। তাছাড়া অজস্র প্রয়োজনীয় দক্ষতা যান্ত্রিকতার পথেই সুষ্ঠু ভাবে গড়ে ওঠে, তাই মানুষের জীবনে যান্ত্রিকতারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু যান্ত্রিকতা থেকে বিচ্যুতি তার জীবনে এনে দিয়েছে নব নব বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বপ্ন ও সাফল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ভুল" কবিতায় বলেছেন--

"অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনা ভরা ত্রুটির মাঝখানে"।

ত্রুটির মধ্য দিয়েই আসে নতুন প্রচেষ্টা, মহত্তর কৃতিত্ব। ভুল করে বলেই মানুষ এত বড় হতে পেরেছে, পক্ষান্তরে ভুল করবার ক্ষমতা নেই বলেই মানুষের চাইতে অনেক বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েও মৌমাছি আর পিপীলিকারা এতটুকুও অগ্রসর হতে পারে নি।

মা ও শিশু

অমরেন্দ্র নাথ বসু*

কথায় বলে 'নাড়ীর টান'; মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর যোগ। এ যোগ ছিন্ন হবার নয়। সত্যই কি তাই? গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীরের অংশ হিসাবেই থাকে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য আলাদা ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় না; মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস। আলাদা ভাবে আহার করতে হয় না। মায়ের আহারই তার আহার। বেঁচে থাকার জন্য তার কোন প্রচেষ্টা নেই; মায়ের প্রচেষ্টাই তার প্রচেষ্টা। গর্ভাবস্থায় শিশু এই ভাবে মাতৃ-দেহে বসে পরিপুষ্ট হতে থাকে। তাই এই সময় মায়ের শরীরের সুখেই তার সুখ; মায়ের অসুস্থতা, তার আরামের বিঘ্ন।

কিন্তু জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ যোগ বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্ত থেকেই সে মাতৃ-শরীর থেকে পৃথক; শারীরিক একত্বের পরিসমাপ্তি; নাড়ীর যোগ ছিন্ন। তবুও নিজে নিজে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা শিশুর এই সময়ও কিছুই থাকে না। তাই মায়ের শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মায়ের উপর নির্ভরশীল তাকে থাকতেই হয়। তাই যে নির্ভরতা শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাকেই উন্নীত করতে হয় মানসিক বন্ধনে। প্রকৃতি শিশু ও মায়ের প্রবণতা ও আচার-আচরণের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যবস্থা করে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই মানসিক বন্ধন এবং শিশুর বেঁচে থাকার সর্তাবলী পরিপূর্ণ হয়। এ সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ একেবারে প্রবৃত্তিগত। মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর থেকে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ এ বন্ধন ছাড়া শিশু বাঁচতে পারে না। তাই এদিক থেকে যে সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় শিশুকে সাহায্য করে সেগুলির একটা উদ্‌বর্তন মূল্য (Survival value) রয়েছে।

মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর শাবকদের মধ্যে এরকম কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয়, যার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীটির মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ উদ্দীপিত হয় এবং যার ফলে মা-প্রাণী ও শাবকের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয় ও ফলে শাবকের বেঁচে থাকার

[* মনঃসমীক্ষক; শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়; অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।]

সর্তসমূহ পরিপূর্ণ হতে থাকে। এরকম ঘটনা প্রায় সকলেই দেখেছেন যে বাড়ীর গ্যারেজে বা দালানের আনাচে-কানাচে কয়েক দিনের কুকুর ছানাগুলো কুঁ কুঁ করে যখন আওয়াজ তোলে তখন মা-কুকুরটা দুরে থাকলে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ছানাগুলোকে আগলে ধরে ও মাই খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। যাঁরা গ্রামে থেকেছেন তাঁরা পাখীর বাসায়ও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। এই জাতীয় শব্দ করাকে আমরা কান্না নাম দিয়ে থাকি। এই কান্না মায়ের মনকে আকর্ষণ করে এবং তার মনে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে যার ফলে সে কতগুলি বিশেষ আচরণ করে থাকে অর্থাৎ কান্না ঐ সকল আচরণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। মায়ের কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণের ফলে শাবকের মধ্যে যে অস্বস্তিকর ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফলে কান্নারও পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটা সাম্য অবস্থায় ফিরে আসে। এই শাবক ও মায়ের আচরণ একই সূত্রে বাধা। আর এই বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষা বা উদ্‌বর্তন। প্রাকৃতিক পরিবেশে যাঁরা বানর ও বানর শাবককে দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শাবকটি মা-বানরের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকে। মা-বানরটিও বাচ্চাটিকে ধরে রাখে। মা-বানরকে জীবন সংগ্রামের তাগিদে গাছ থেকে গাছে খুব দ্রুত ছুটে চলতে হয়। সে অবস্থায় এই ধরে থাকার ও ধরে রাখার সহজাত ক্ষমতাটি ও ইচ্ছাটি চাই। শাবকের দিক থেকে এই আঁকড়ে থাকার প্রবণতার পরিতৃপ্তির অভাবে তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই শাবকের এই আচরণ মা-বানরের মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণকে উদ্দীপিত করে। শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীদের শাবকদের মধ্যে এই আঁকড়ে থাকার বৃত্তিটি সমধিক চোখে পড়ে। এমন কি প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই সকল শ্রেণীর শাবকেরা মায়ের মাই চোষার ক্ষমতা লাভ করার আগেই মায়ের দেহ আঁকড়ে থাকার ক্ষমতাটি লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর শাবকেরা বিভিন্ন ধরণের কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন (instinctive behaviour and response) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শাবকদের আচরণের প্রতিবেদনে মা কতগুলি আচরণ করে থাকে, মায়ের আচরণের প্রতিবেদনে শাবকেরা কতগুলি আচরণ করে বা পূর্ব আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যেমন মানব-শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় পর্যন্ত মায়ের অদর্শনে শিশু কাঁদছে, মা এসে তাকে আদর করল, কোলে তুলে নিল; তখন তার প্রতিবেদন হিসাবে শিশু কান্না থামিয়ে মুখ দিয়ে নানা রকম খুশির আওয়াজ করতে লাগল। মা তাকে আরো নানা ভাবে আদর করতে লাগল। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শাবকেরা যে সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন করে থাকে (যার উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার পথ সুগম করা), তার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীরা কতগুলি আচরণ করে থাকে।

এই ভাবে এই সকল আচরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কতগুলি মানস-বৃত্তিও গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবেই মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হতে থাকে।

মানব শিশুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার প্রথম আচরণ কান্না। জন্ম লগ্নে কান্নার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তার জীবনস্পন্দন। যে অস্বস্তিবোধ তার কান্না উদ্দীপিত করে, সেই কান্নাই তার ফুসফুস্‌ যন্ত্রের স্পন্দন ঘটায়, তার প্রতি মায়ের (বা মাতৃস্থানীয়ার) দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কাজেই মানব শিশুর ক্ষেত্রে কান্নাকেই মা-শিশু সম্পর্কের প্রথম আচরণ বলতে পারি। শিশু অস্বস্তি বোধ করলে বা যন্ত্রণা বোধ করলে কাঁদে, খিদে বোধ করলে কাঁদে। মায়ের স্তনের অনুভূতি, তার গায়ের স্পর্শ, গলার স্বর, এমন কি কেবল মাত্র তার উপস্থিতিই শিশুর কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই কান্নার মধ্য দিয়েই শিশুর অসহায় অবস্থা, তার নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়। এই কান্না মায়ের মনে কতগুলি ভাবের উদ্রেক করে এবং মাকে কতগুলি আচরণে উদ্দীপিত করে।

এর পরই আসে চোষার (sucking) আচরণ। মায়ের বুকের মাই চোষার মধ্য দিয়ে এর পরিতৃপ্তি। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তার সুখানুভূতি হয়। তবে চোষার প্রবণতার পরিতৃপ্তি বোতলের দুধ খাইয়ে, চুষিকাঠি প্রভৃতি দিয়েও ঘটান সম্ভব। কিন্তু মায়ের মাই খাওয়ার মধ্যে যে চোষার পরিতৃপ্তি তা কৃত্রিম উপায়ে ঘটান সম্ভব কিনা তা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই আঁকড়ে (cling) থাকার প্রবণতা। শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষায় জানা যায় যে জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর নিজের হাত দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে। শিশু যখন মায়ের কাছে শুয়ে থাকে তখন সে মায়ের কোলের মধ্যে আঁকড়ে থাকতে চায়, মায়ের আঁচল ধরে থাকে। কোনও শিশু অনেকক্ষণ ধরে তার মাকে পাচ্ছে না, তারপর যখন তাকে পায় তখন আর ছাড়তে চায় না, আঁকড়ে ধরে। মা-দের অনেক সময় শিশুকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায় (বিশেষ করে যখন কাজ-কর্মের তাড়া থাকে), "সব সময় পায় পায় ঘুরছে, গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকবে, কোন কাজ করার উপায় নেই।" খুব ছোট্ট শিশু ঘুম ভাঙার পর যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত দু'খানা উপরে তুলে কাঁদছে। আমরা এর অর্থ করে নেই—কোলে উঠতে চায়। মা ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়। শিশু আর একটু বড় হলে কোলে ওঠার জন্য আরও স্পষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে দেয়। আঁকড়ে থাকার প্রবণতারই পরিণতি এই কোলে ওঠার আচরণ। শিশু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত হয়, কোন ব্যথা

পায় এবং ভয় পায় তখনই শিশুর মধ্যে এই আঁকড়ে ধরার প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। মায়ের কোলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটে।

এসকল ছাড়া মানব শিশুর মধ্যে আরও দু'একটি বিশেষ ধরণের প্রবৃত্তিমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যেমন শিশুর হাসি, অপরের উপস্থিতি নজর করা ও অপরের নজরের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা। এ সকল আচরণগুলির মধ্যে দিয়েও মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়। ছ'সাত সপ্তাহ বয়স থেকেই শিশু মৃদু হাসতে পারে। মাকে আবদ্ধ করে রাখার এমন শক্তিশালী ক্ষমতা আর কী আছে! শিশু খুশিতে মৃদু হাসছে; মাও ঝুঁকে পড়ে তার প্রত্যুত্তর জানাচ্ছে, আদর করছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি মুগ্ধ। এমন অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে যে কোনও মায়েরই সুখ। শিশুর এই হাসির বিনিময়ে মা নিজেকে শিশুর ক্রীতদাসীত্বেও পরিণত করতে রাজী। ঐটুকু শিশুর কী অসীম ক্ষমতা! প্রকৃতি বেঁচে থাকার জন্য শিশুকে কী শক্তিশালী হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছে।

তিন-চার মাস বয়স থেকেই শিশু শুয়ে শুয়ে তার আশে-পাশের লোকদের চলা-ফেরার ও উপস্থিতির প্রতি খুব অল্পক্ষণের জন্য নজর রাখতে আরম্ভ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ক্ষমতা বাড়ে। শিশুর কাছ থেকে সরে গেলে সে বুঝতে পারে। তাকে একা রাখলে বুঝতে পারে। তখনই সে অপর কারুর উপস্থিতি চায়; কারুর নজরের মধ্যে আসতে চায়। শিশু যখন ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে ক্ষুধার্ত হয় তখনই সে অপরকে অনুসন্ধান করতে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে কেবলমাত্র মায়ের উপস্থিতিই তাকে শান্ত করে। এমন কি যদি সে মাকে দেখতে নাও পায়, কিন্তু তার কথা শুনতে পাচ্ছে, গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, তাহলেই শিশু পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর মায়ের নজরে থাকার এই প্রবণতার কতটা পরিতৃপ্তি ঘটল বা না ঘটল, তার সাথে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক উদ্বেগ বোধ করা বা না করার কিছু যোগ থাকতে পারে বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী অনুমান করে থাকেন। নজর পাওয়ার এই ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়ার প্রতিক্রিয়া মানসিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে দেখা দিতে পারে।

উপরে শিশুর যে সকল প্রবণতা ও প্রবৃত্তিমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করা হ'লো, সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার প্রত্যেকটিই শিশুর জীবনে কোনও না কোনও সময়ে শুরু হচ্ছে, আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে, আবার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মা ও শিশুর পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে এগুলির উদ্বর্তনের প্রয়োজনীতাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু যথা সময়ে মা বা মাতৃস্থানীয়া কারুর

মধ্য দিয়ে যদি এগুলির পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তি না ঘটে তাহলে শিশুর মানসিকতায় নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। শিশু প্রকৃতিদত্ত এই হাতিয়ারগুলি তার প্রয়োজনের তাগিদে. অর্থাৎ উদ্‌বর্তনের তাগিদে ব্যবহার করে। কিন্তু তাই বলে উদ্‌বর্তনের প্রয়োজনের শেষে এসকল হাতিয়ারের অর্থাৎ প্রবণতা ও আচরণসমুহের অবলুপ্তি ঘটে না। বয়স্কদের মধ্যেও এগুলি যেন কোষ-বদ্ধ অবস্থায় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমরা কি কাঁদি না? দারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে আমরা কি পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরি না? নিদারুণ একাকীত্ববোধের মধ্যে আমরা কি চাই না যে প্রিয়জন ও বন্ধুজন আমাদের ঘিরে থাকুক? আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক যুগলের আচরণের মধ্যেও এই সুপ্ত আচরণগুলির প্রকাশ সুখানুভূতিকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিশুর জীবনে এই সকল প্রবৃত্তিমুলক আচরণসমুহ প্রধানতঃ যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সে হ'লো মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন ব্যক্তি। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে এসকল আচরণসমুহ মাকে বাদ দিয়ে অপর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেমন চোষার আচরণের পরিসমাপ্তি দুধের বোতল বা চুষি কাঠির মধ্যে দিয়ে ঘটান হয়। আঁকড়ে থাকার আচরণটিকে বালিশ জড়িয়ে থাকার মধ্যে পরিচালিত করা হয়। আবার হয়ত এমন হতে পারে যে এক একটা প্রবণতার পরিতৃপ্তি এক এক জনের মারফত ঘটেছে। যেমন শিশু তার প্রকৃত (natural) মায়ের বুকের মাই খাচ্ছে; কিন্তু সারা দিনই তাকে আয়ার নজরের মধ্যে থাকতে হচ্ছে (যে সকল মা চাকুরী বা অন্য কাজের জন্য বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন তাঁদের শিশুর ক্ষেত্রে)। কিন্তু শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার পরিতৃপ্তির উৎস-বিন্দুকে যতই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করাই না কেন তার বেশির ভাগ প্রবণতাসমুহের পরিতৃপ্তি ঘটে মায়ের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই শিশুর জীবনে মা কেন্দ্রবিন্দু। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মায়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়েই সকল প্রবণতা সমুহের পরিতৃপ্তি ঘটা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্র-বিন্দু যতই বিভিন্ন হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি ততই বিনষ্ট হবে; কেবল মাত্র মাকে কেন্দ্র করে সকল প্রবৃত্তিমুলক আচরণসমুহের পরিসমাপ্তির মধ্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি নির্ভর করে। মায়ের স্থান এদিক থেকে অদ্বিতীয়। এর দ্বারা যেন এরকম মনে না করা হয় যে শিশু অপর কারুর সংস্পর্শে যাবে না। সকলের সাথেই তার যথাযোগ্য সংস্পর্শ থাকবে এবং গড়ে উঠবে। কিন্তু জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু থাকবে মা; এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি এই কেন্দ্রাভিমুখতা শিথিল হতে থাকবে। শিশু পালনের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থাই করতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে তীব্র মাতৃ-কেন্দ্রাভিমুখতা, যদি শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথেও শিথিল না হয়, তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পর শিশুর সাথে মায়ের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হলেও শিশুর কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও মাতৃনির্ভরতার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মানসিক যোগ গড়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব-শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে এসকল আচরণগুলি হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছে। এভাবে মা ও শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা আবেগ সঞ্চিত হয় এবং একটা মানসিক বন্ধন স্থাপিত হয়। শিশুর তিন-চার-পাঁচ বছরের সময় এই যোগ তীব্রতম হয়। এই যোগ শিশুর কিশোর জীবন পর্যন্ত কিছুটা থাকে। তারপর ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু মাতৃ-মূর্তির প্রতি আবেগ মানবমনে সমগ্র জীবন ধরেই প্রবাহিত হতে থাকে। সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। এদিক থেকে মায়ের সাথে শিশুর যোগ অবিচ্ছেদ্য।

(বিঃ দ্রঃ :— এই প্রবন্ধে 'মা' বলতে প্রকৃত মা (natural mother), বিকল্প মা বা মাতৃস্থানীয়া যে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝাবে।)

ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা

পুষ্পা মিশ্র*

মনঃসমীক্ষণের জগতে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান হল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের শৈশব-কাম সম্পর্কে মতবাদ। এবং এই মতবাদের মধ্যে তাঁর ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার মতবাদটি সমগ্র মনোচিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড তাঁর উদ্বায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালীন জ্ঞাত ও প্রাপ্ত তথ্যের উপর মনোবিশ্লেষণের মুল সিদ্ধান্তগুলি গড়ে তোলেন। পরবর্ত্তীকালে এই মুল সিদ্ধান্তগুলি তথাকথিত সুস্থ মানুষের মনোবিশ্লে-ষনের মাধ্যমে সমর্থিত হয়। ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তগুলি মানব মনের সাধারণ নিয়ম-রূপে ফ্রয়েড স্বীকার করেন। ইডিপাস-গূঢ়ৈষার মতবাদ নিয়ে সম্ভবতঃ ফ্রয়েডকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। তবু সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়ই—অতএব ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার ধারণাটিকেও আজ অনেকে সহজভাবে গ্রহণ করে তার সম্পর্কে নানান অনুসন্ধান চালিয়ে তার গভীরতা, জটিলতা, বৈচিত্র্য, মানসিক রোগ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তার অবদান ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণভাবে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

আমরা যেমন এক প্রকার দৈহিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং তা যেমন শিশুর বয়সের ক্রমোন্নতির সঙ্গে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তেমনি আমরা এক মানসিক কাম-শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। এই মানসিক কাম-শক্তিকে বলা হয় libido। আমাদের সর্বপ্রকার সুখ ভোগের অন্তরালে যে মানসিক শক্তি কাজ করে, তাই হল লিবিডো। অর্থাৎ যে কার্যের সঙ্গে আমাদের মানসিক কাম-শক্তি জড়িত থাকে, যে কার্যে আমরা সুখ ভোগ করি, এবং যে কার্যের সঙ্গে লিবিডো যুক্ত হয়ে থাকে না, সে কার্যে আমাদের সুখ থাকে না। এই মানসিক কাম-শক্তি জন্মের পর হতে ক্রমপরিণতির কতকগুলো স্তর অতিক্রম করে অবশেষে তার লক্ষ্যে উপনীত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। লিবিডোকে যে স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়, তার প্রথমটি হল, মুখ-কাম। এই স্তরে শিশু মুখ্যত ঠোঁট, গলা ও মুখের মাধ্যমে সুখ উপভোগ করে। এর পরের স্তরটি প্রধানতঃ পায়ু-মুখের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—একে বলা হয়, পায়ু-কাম স্তর।

---

* মনঃসমীক্ষিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়া।

অতঃপর শৈশ্নিক দশা বা phallic phase অতিক্রম করে লিবিডো ঈডিপাস-স্তরে এসে উপনীত হয়।

ঈডিপাস-স্তরে পৌঁছোবার পূর্বে ফ্রয়েডের মতে—শিশুর নারী ও পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয় না। ঈডিপাস-স্তরে শিশু, প্রথমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। যদিও নির্দ্দিষ্ট কোন বয়সে শিশুর কাম-শক্তি এই স্তরে উপনীত হবে, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না তথাপি সাধারণতঃ আড়াই বৎসর থেকে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে এই গূঢ়ৈষার আগমন হতে দেখা যায়: এই গূঢ়ৈষার মুখ্য উপাদান হল দু'টি— ১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার (parent) প্রতি যৌন-আকর্ষণ ও সমলিঙ্গের জনয়িত্রীর প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিরোধী মনোভাব যা অনেক সময় হত্যা করার ইচ্ছা পর্যন্ত উপনীত হয়। এখন দেখা যাক্, কি ভাবে এই ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে উদিত হয়।

শিশুর ব্যবহার একটু লক্ষ্য করলেই, শৈশব-কামের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। প্রাক্-ঈডিপাস অবস্থায় বা শৈশ্নিক স্তরে শিশুকে প্রায়ই লিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে দেখা যায়। অনুরূপ কার্য-গুলি প্রায়ই পিতা-মাতার দ্বারা নিন্দিত হয় এবং শিশুও ক্রমশঃ এগুলির নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর নিকট তার প্রধান ভালবাসার বস্তু হচ্ছে মা অথবা মাতৃস্থানীয়া। কারণ মা অথবা মাতৃস্থানীয়াই তার সকল চাহিদা পূরণ করছেন এবং শিশু তাঁর সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসছে। অর্থাৎ শিশু-সন্তান পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন প্রাক্-ঈডিপাস অবস্থায় মা অথবা মাতৃস্থানীয়ার প্রতিই তার কাম-শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক আরোপিত থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমাদের কাম-শক্তি বাস্তব বস্তু অথবা মানুষের প্রতি আরোপিত হয় না, হয় সেই বস্তু বা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক প্রতিরূপ (mental image) থাকে, তার উপর। এই সময় শিশুর যৌনাকাঙ্খা ক্রমশঃ জাগরিত হতে থাকে। পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে তার যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রধান কেন্দ্র স্বাভাবিকরূপেই তার মা অথবা মাতৃস্থানীয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। একদিক দিয়ে বলা যায়, তার বহু সুখ ও আরামের কেন্দ্র রূপে তার মাই ছিলেন তার ভালবাসার প্রধান বস্তু। যৌনতৃপ্তির প্রশ্ন উঠলে কার্যতঃই তার মাকে ঘিরেই তার আবেগ প্রথম জাগরিত হয়। শিশু তার স্বল্পপরিণত বুদ্ধি দিয়ে এটুকু ধরতে সক্ষম হয় যে পিতার সঙ্গে মায়ের এক বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং মায়ের উপর পিতার দাবী তার চেয়ে অনেক বেশী। মায়ের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা কিরূপ তা নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতার উপর। যদিও যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়—তবু নিজের শরীরে নিজে সে যে যৌন-সুখ অনুভব করে, অস্পষ্ট ধারণায় পিতা-মাতা সম্বন্ধে সে কথাগুলি তার মনে উদিত হওয়া সম্ভব। অনেক

সময় শিশু সন্তানের জন্মের সঙ্গে পিতার যোগাযোগ অনুভব করতে পারে এবং পিতার মত হয়ে মাকে সন্তান দেবার ইচ্ছাও ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার একটি অঙ্গরূপে প্রকাশ পেতে পারে পুরুষ-শিশু এই স্তরে বিশেষ করে মায়ের প্রশংসা ও ভালবাসা দাবী করে।

মায়ের প্রতি এই আকর্ষণের সঙ্গে আরও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনে উদ্রিক্ত হয়—তা হচ্ছে পিতার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতার ভাব। শিশু যেহেতু মাকে চায় অতএব মায়ের প্রাত তার দাবী অগ্রগণ্য। মাকে শিশু পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে চায়। মা তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসবেন এ পরিস্থিতি শিশুর নিকটে পীড়াদায়ক। পিতা যেহেতু তার মাকে অধিকার করার পক্ষে প্রবল ও প্রধান বাধা, সুতরাং এই বাধার বিরুদ্ধে তার সমস্ত রাগ পরিচালিত হয়। সে মনে-মনে পিতার এবং অন্য ভ্রাতা-ভগ্নীর ধ্বংস কামনা করে।

এই প্রবল ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে এক প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ দুটি কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ শিশু পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিঘাতের আশঙ্কা করে। পিতা যদি তার ধ্বংসাত্মক যৌন-ইচ্ছাগুলি জানতে পারেন তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন—এই আশঙ্কা শিশুর মনে দেখা দেয়। পিতা-মাতাকে শিশু এই সময় তার নিজের ক্ষুদ্র শক্তির তুলনায় প্রবল শক্তিশালী মনে করে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর মনে পিতার প্রতি শুধুই যে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে তা নয়। পিতার শক্তি তার নিকটে বিস্ময়কর ও প্রশংসার বস্তু। এতদ্ব্যতীত, পিতা-মাতার উপর শিশুর নির্ভরতাও রয়েছে। তাদের ভালবাসা বজায় রাখা শিশুর নিকট প্রায় জৈবিক প্রয়োজনের সামিল। ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি আক্রমণ-মুলক (aggressive) মনোভাবও যে পিতা-মাতার নিকট স্বীকৃতি লাভ করবে না, এ অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। সুতরাং শাস্তি এবং পিতা-মাতার ভালবাসা হারানোর ভয়—এই দুই মনোভাব শিশুর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কি ধরণের শাস্তির ভয়, শিশুর মনে সর্বাপেক্ষা প্রবল—মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে তাও জানা গেছে। রোগীর মনঃসমীক্ষণ, বিভিন্ন দেশের আচার-অনুষ্ঠান, গল্প, রূপকথা, পৌরাণিক কথা ইত্যাদির মাধ্যমে এ তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, শিশুর মনে যে শাস্তির প্রবল ভয় বিদ্যমান থাকে, তা হচ্ছে উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কা (castration fear)। এই আশঙ্কা কতকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত কিছু বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হস্তমৈথুন থেকে বিরত করার জন্য অনেক সময় পিতা-মাতা শিশুকে উপস্থচ্ছেদের ভয় দেখান। ছোট্ট মেয়েকে দেখে, পুরুষ-লিঙ্গ ছাড়াও যে মানুষ থাকে, সে সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমুল হয়। অতএব, সে প্রকৃতই উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে এই castration fearই হচ্ছে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধানের উপায়। এতগুলি ভয় আর

আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে শিশুর পক্ষে এই ঈডিপাস-ইচ্ছা গুলিকে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। অতএব, এই সকল ইচ্ছার কিছু অংশ ত্যাগ করে এবং কিছু অংশ অবদমিত করে—অর্থাৎ তার নির্জ্ঞান মনের দুরতিগম্য স্তরে প্রেরিত করে। এই অবদমনের সঙ্গে শিশুর আনুষঙ্গিক শৈশব-কামও দমিত হয়। এই কারণে আমরা সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়সের পূর্ব্বের ঘটনাগুলি মনে আনতে পারি না। ফ্রয়েড এই বিস্মরণকে শৈশব-অস্মার বা infantile amnesia বলেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুষ শিশুর ঈডিপাস-গূঢ়ৈষায় দু'টি অনুভূতির প্রাধান্য থাকে—(১) মায়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা, (২) পিতাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা। এই দু'টি মূল অনুভূতির সঙ্গে থীব্‌সের রাজা ঈডিপাসের কাহিনীর সাদৃশ্যের জন্য ফ্রয়েড এই গূঢ়ৈষার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা। ঈডিপাস জন্মকালে তার পিতা-মাতা, থীব্‌সের রাজা ও রাণী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এক মেষ পালকের নিকট মানুষ হয়েছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে তিনি নিজের পিতাকে বধ ও মাতাকে বিবাহ করতে বিধিনির্দ্দিষ্ট, তখন মেষপালককে নিজের প্রকৃত পিতা ভেবে সেখান থেকে পলায়ন করেন। পথে দস্যু ভ্রমে থীব্‌সের রাজা অর্থাৎ নিজের প্রকৃত পিতাকে হত্যা করেন এবং থীব্‌সের রাণী অর্থাৎ নিজের মাতাকে পরিচয় না জেনে বিবাহ করেন। অনেক পরে তিনি যখন প্রকৃত সত্যটি অবগত হলেন, তখন রাগে, দুঃখে নিজের দুই চোখ অন্ধ করে ফেলেন ও রাজ্য পরিত্যাগ করেন। ফ্রয়েড বলেন যে ঈডিপাসের করুণ কাহিনী [১] যে আমাদের মনের গভীরতর স্তরে নাড়া দিতে সক্ষম, তার কারণ আমরা মনে-মনে সবাই এক একটি ঈডিপাস। আমরা আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে পিতাকে ধ্বংস ও মাতাকে ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করি।

দেখা যাচ্ছে, 'মানসিক কাম-শক্তির বিবর্ত্তনের দিক দিয়ে এই স্তরটির গুরুত্ব অসীম। এই স্তরে শিশুর মানসিক জগতে নানান্ অনুভূতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্নতা এক জটিলতার সৃষ্টি করে। এই কারণে এই স্তরকে Œdipus-complex নাম দেওয়া হয়েছে। উদ্বায়ু-রোগের একটি কারণ স্বরূপ এই গূঢ়ৈষার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ উদ্বায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালেই এই তথ্যগুলি ধরা পড়ে। ফ্রয়েড তাঁর মহিলা উদ্বায়ু-রোগীদের চিকিৎসাকালে অনেকের নিকট হতে অভিযোগ শোনেন যে তাঁরা তাঁদের পিতা কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হয়েছেন। বাস্তবক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে এই সকল অভিযোগগুলি ভ্রান্ত ও কাল্পনিক। কিন্তু ফ্রয়েড এরই মধ্যে উদ্বায়ু-রোগের কারণের সন্ধান পেলেন। যা ঘটেনি, রোগী তার মানসিক জগতে তাই

[১] এই ঘটনাক্রম পুরুষ-শিশুর প্রতিই প্রযোজ্য।

ঘটিয়ে চলেছে—এবং এর পশ্চাতে নিশ্চয় কোন মানসিক উপাদান ক্রিয়াশীল। গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে এই ঘটনাগুলির অন্তরালে রোগীর তার পিতার প্রতি যৌনাকাঙ্খা ও মাতার প্রতি গভীর আক্রোশ প্রকাশ পায়।

ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা সমস্ত উদ্বায়ু-রোগের মূল কারণ। পরিণত বয়সে যৌন বস্তু (sex object) নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে এই গূঢ়ৈষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা।

ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার গুরুত্ব অন্য কারণেও অপরিসীম। ফ্রয়েডের মতে এই গূঢ়ৈষা থেকেই আমাদের অধিশাস্তা বা super-egoর জন্ম হয়। অধিশাস্তা হল সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে বিবেক বা আমাদের নৈতিক-বোধ বলে থাকি। যদিও ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের পূর্বেই পিতামাতা শিশুকে সাধারণভাবে নৈতিক শিক্ষা দিতে শুরু করেন, কিন্তু এই শিক্ষাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অথবা 'এটা নিও না, ওটা কোরো না'—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে শিশু শাস্তির ভয়ে অথবা পিতামাতার অসন্তুষ্টির ভয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণে বিরত থাকে। অর্থাৎ বিবেক বা নৈতিক-বোধের যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ—বাইরের শাস্তি নয়, অন্তরের আদেশে বিশেষ বিশেষ কার্য বা চিন্তায় বিরত থাকা—তা এ স্তরে অনুপস্থিত থাকে। ঈডিপাস-স্তরে যখন বহু বিচিত্র ও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনকে নাড়া দিতে থাকে ও শিশু সেগুলির হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় খোঁজে, তখনই অন্তঃস্থিত নীতি-বোধের গঠন আরম্ভ হয়। যখন শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে যে মা তার ইচ্ছাগুলি পূরণ করবেন না, তখন তার মানসিক প্রবণতা আবার পিতার প্রতি ধাবিত হয়। পিতার প্রতি তার যে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাগুলি জেগে ছিল, সেগুলির কিছুটা সে সমাধান করে, পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ (Identification) করে। অর্থাৎ মাকে পাবার ইচ্ছা সে ত্যাগ করে 'বাবার মত হব' —এই আশায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় শিশু-মনের এই ইচ্ছা অতি সুন্দর ও সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণের সময়, শিশুর আচরণে পিতার আচরণ, হাঁটা-চলা, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির অনুকরণ করার প্রবণতাও একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। এই একাত্মীকরণের ফলে পিতা-মাতার বিধি-নিষেধ, অনুশাসন ক্রমে-ক্রমে শিশু নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। অর্থাৎ পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা ক্রমশঃ তার নিজের নিষেধাজ্ঞাও হয়ে ওঠে। সুতরাং পিতাকে হত্যা ও মাকে ভোগ করার ইচ্ছাত্যাগ শুধু মাত্র বহির্জ্জগতের দাবী থাকে না—তার অন্তর্জ্জগতেরও দাবী হয়ে পড়ে। এই অন্তঃস্থিত বিবেককে ফ্রয়েড অধিশাস্তা বা Super-ago আখ্যা প্রদান করেছেন। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সঙ্গে অধিশাস্তার গঠনের শুরু হলেও, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার

সমাধানের সঙ্গেই তা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি কার্যকরী থাকে এবং বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর অধিশাস্তা গঠিত হয়। পরবর্তী কালের বহু গুরুত্বপুর্ণ অভিজ্ঞতা, অধিশাস্তার মুল গঠন পরিবর্ত্তিতও করে দিতে পারে। অধিশাস্তার গঠন ব্যক্তির মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ। সামাজিক দিক দিয়েও এর গুরুত্ব কম নয়। অন্তঃস্থিত এই অধিশাস্তাই আমাদের সামাজিক নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে—যা সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য। মানসিক দিক দিয়ে, এই অধিশাস্তা অহমের হাতে একটি গুরুত্বপুর্ণ অস্ত্র। প্রবৃত্তিগুলির কোন্‌টি অহম চরিতার্থ করবে কোন্‌টি করবে না—তা এই অধিশাস্তাই নির্দ্ধারিত করে। প্রবৃত্তিগুলির সংজ্ঞান-মনে প্রবেশের ও ইচ্ছাপুর্ত্তির ক্ষেত্রে অধিশাস্তাই তাদের যাথার্থ্য বিবেচনা করে এবং অধি-শাস্তার 'আদেশ-বিরুদ্ধ' ইচ্ছাপুর্ত্তির জন্য আমাদের মনে অপরাধ-বোধ ও শাস্তি পাওয়ার ইচ্ছাও সৃষ্টি হয়। সুতরাং ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সঙ্গে অধিশাস্তা গঠনের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ বলে ফ্রয়েড্ মনে করেন।

অধিশাস্তা কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিথিল, কারুর কারুর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আবার কারুর-কারুর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কঠোর ও শাস্তিমুলক হয়। সাধারণভাবে হয়ত এ পার্থক্যের কারণস্বরূপ বলা যায় যে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা যে মাত্রায় হবে, শিশুর অধিশাস্তার কঠোরতাও সেই মাত্রায় হবে কেন না অধিশাস্তার গঠনই হচ্ছে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞাকে অন্তঃক্ষেপিত (introject) করে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতার সঙ্গে অধিশাস্তার কঠোরতার যোগা-যোগ নেই। অধিশাস্তা, হয় অনেক বেশী কঠোর, অথবা অনেক বেশী শিথিল। এর উত্তরে কি আমরা একথা বলতে পারি যে বাস্তব নিষেধের কঠোরতার উপর অধিশাস্তার কঠোরতা নির্ভর করে না, করে কঠোরতার বিষয়ীগত (subjective) মুল্যায়নের উপর। — অর্থাৎ শিশু পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তির কঠোরতাকে যতটা কঠিন বা অকঠিন ভাবে, তার উপর। এর উত্তরে একথাও বলা হয়েছে যে শিশুর নিজস্ব ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলির মাত্রা ও গভীরতার উপর অধিশাস্তার কঠোরতা নির্ভর করছে। অর্থাৎ শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির কঠোরতা যদি অনেক বেশী হয়, তাহলে সে যখন পিতা-মাতার সঙ্গে একাত্মীকরণ করছে তখন ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মুলে যে মানসিক শক্তি ছিল, তা নবনির্মিত অধিশাস্তার দখলে চলে আসছে এবং অধিশাস্তা সেই শক্তিবলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অধিশাস্তার কঠোরতা এবং শিথিলতাও বহু মানসিক রোগের কার্যকারণের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরুষ-শিশু পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ (identification) করে তার ঈডিপাস-জটিলতার সমাধান করে। (মনে রাখতে হবে, এই সকল পন্থা

শিশু সচেতন ভাবে গ্রহণ করে না।) এই ক্ষেত্রে, আরও বহু উপাদান কার্যশীল থাকতে পারে। আমরা সকলেই উভয়কামী (bisexual)। এই উভয়কামিতার পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা জন্মজাত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে। সুতরাং যদি কোন পুরুষ-শিশুর মধ্যে স্ত্রী-সুলভ মনোভাব অধিক পরিমাণে থাকে, তাহলে মাকে পিতার মত ভালবাসবার আকাঙ্খার পরিবর্তে সে পিতার কাছে মেয়ের মত ভালবাসা কামনা করতে পারে। এই প্রবণতা পরবর্ত্তী কালে তার স্বাভাবিক যৌন-বস্তু নির্ব্বাচন ও ভোগে বাধা দান করতে পারে। সমকামিতার (homosexuality) অনেকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত এই ভুল একাত্মীকরণ কাজ করে। পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ ও মায়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা আবার আনুষঙ্গিক বহু উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যদি কোন শিশু মাতৃহারা হয় এবং পিতা যদি বাবা-মা উভয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে লালন-পালন করে থাকেন, তাহলে পিতার প্রতি তার আসক্তি প্রবলতর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ের প্রতি তার ভোগ-লিপ্সা, মাতৃস্থানীয়া আয়া, নার্স, বা পিসি, মাসী ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি চালিত হবে। মা যদি স্নেহপ্রবণ না হন, যদি কর্কশ, রূঢ় বা কটুভাষিনী হন, তাহলে সেই মাকে কেন্দ্র করে শিশুর আসঙ্গ-লিপ্সা নাও জাগরিত হতে পারে। আবার পিতার মৃত্যু বা দীর্ঘকাল পিতার অনুপস্থিতি, পিতার ব্যবহার ইত্যাদিও পিতার সঙ্গে একাত্মী-করণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক পরিণতি ঠিক কোন দিকে যাবে, তা আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক বহু উপাদান ও শিশুর জন্মগত মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

এতক্ষণ আমরা পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস্-গূঢ়ৈষার জটিলতার আলোচনা করেছি। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ঈডিপাস্-গূঢ়ৈষার আকার, প্রকার, গতি-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত জটিলতর ও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধান ও অভিযোজনই তার তথাকথিত "রহস্যময়" ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম। আমরা নিম্নে ফ্রয়েডের মত আলোচনা করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুর প্রথম ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন তার মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া। ঈডিপাস-স্তরের আগমনের সঙ্গে পুরুষ-শিশুর ভালবাসার পাত্র অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু নারী-শিশুর ভালবাসার পাত্র পরিবর্ত্তিত হয়। যৌন-ক্ষেত্রেও নারী-শিশুকে শৈশ্নিক হস্তমৈথুনের স্থানে vaginal pleasure এ আসতে হয়। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ভালোবাসার পাত্র পরিবর্ত্তন তার মনোজগতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্-ঈডিপাস স্তরে নারী-শিশু পুরুষ-শিশুর মতই মায়ের প্রতি অনুরক্ত। তার হস্তমৈথুন কালেও মায়ের প্রতিরূপকে কেন্দ্র করেই তার চাহিদার পূরণ ঘটে।

অবশ্য এ সময় নারী-শিশু মাকে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকারিণী রূপেই কল্পনা করে (Phallic mother)। শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তি বহু কারণে পরিবর্ত্তিত হতে পারে—যেমন, মা তাকে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ দেন না অথবা নতুন শিশুর আগমনের পরে মা তাকে পূর্বের ন্যায় আদর-যত্ন বা ভালবাসা দেন না। কিন্তু এই সকল পরিস্থিতি পুরুষ ও নারী উভয় শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে। এতদ্‌সত্ত্বেও পুরুষ-শিশুর তার মায়ের প্রতি আকর্ষণ বজায় থাকে কিন্তু নারী-শিশুর ভালবাসার পাত্র পরিবর্ত্তিত হয়। ফ্রয়েড বলেন, এমন একটি কারণ আমাদের সন্ধান করতে হবে, যা কেবলমাত্র নারী-শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে এবং যার গভীরতা ও গুরুত্ব নারী-শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তির পরিবর্ত্তন ঘটাতে সক্ষম। তাঁর মতে, এই কারণটি উপস্থচ্ছেদ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারী-শিশু পুরুষ শিশুর লিঙ্গের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অনুভব করতে পারে এবং নিজের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে সকল অসুবিধাসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে তাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধি নারী-শিশুর নিকটে প্রবলরূপে নৈরাশ্যজনক। প্রথমে সে এটিকে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেই ধরে নেয় কিন্তু ক্রমশঃ সে এর জাতিগত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। সে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকারিনী নয়, এই অনুভূতি তার মনে এক প্রবল ঈর্ষা-বোধের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন—Penis-envy. নিজের এই প্রবল ক্ষতির জন্য নারী-শিশু সম্পূর্ণরূপে তার মাকে দায়ী করে। ফ্রয়েডের ভাষায় "It was a surprise, however, to discover from analysis that the girl holds her mother responsible for lack of a penis & never forgives her for that deficiency." এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারই নারী-শিশুকে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত করে। মাকে নিজের শারীরিক হীনতার জন্য দায়ী করার পর, স্বভাবতঃই নারী-শিশু পিতার প্রতি আকর্ষিত হয়। সুতরাং প্রাক্-ঈডিপাস দশায় মায়ের প্রতি তার যে আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিল, তা এখন পিতার প্রতি ধাবিত হয়। ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ঈডিপাস-দশা দু'টি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। প্রথমটি হল, পিতার প্রতি আসক্তি এবং মাতার প্রতি বিরূপ মনোভাব—এই মানসিক অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া; দ্বিতীয়টি হল—নারী-শিশু যেন নিজের এই শারীরিক হীনতাকে অস্বীকার করে এবং পূর্বের ন্যায় আচরণ বজায় রাখে। অর্থাৎ পিতাকে ভালবাসার বস্তুরূপে স্বীকার না করে, নিজের পূর্বাবস্থাকেই (Phallic motherএর প্রতি আসক্তি) মেনে চলে। এই মনোভাবই পরবর্ত্তী জীবনে Masculinity-complex এর জনক।

আমরা দেখেছি, পুরুষ-শিশু তার ঈডিপাস-আসক্তি ত্যাগ করে উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কায়। নারী-শিশুর ক্ষেত্রে, ঘটনাক্রম বিপরীত। নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তর আরম্ভ হয় নিজের উপস্থচ্ছেদের আবিষ্কারের পর। ফ্রয়েডের ভাষায়, "The castration com-

plex prepares the way, instead of destroying it ; under the influence of penis-envy, the girl is driven from her attachment to her mother and enters the Œdipus situation as though it were a heaven of refuge." এই কারণে নারী-শিশু তার ঈডিপাস-অবস্থার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি কখনই পেতে পারে না। কেননা, পুরুষ-শিশুর উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কার মত প্রবল কোন ভীতি তার ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকে না। বরং পিতার নিকট হতে পুরুষ-লিঙ্গসম্পন্ন সন্তান-লাভের মাধ্যমে নিজের শারীরিক হীনতা দুর করার ইচ্ছায়, পিতার প্রতি তার আকর্ষণ দীর্ঘদিন বজায় থাকে। অনেক পরে, নারী-শিশু পিতার প্রতি তার এই আসক্তি অসম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারে। পরবর্ত্তী জীবনে, পুরুষ-সন্তান লাভের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের হীনতা-বোধ দুরীভূত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণে পুরুষ-শিশুর জন্মে মায়ের আনন্দ এতটা প্রবল হয়। ফ্রয়েড বলেন, এই সকল ঘটনা নারী শিশুর অধিশাস্তার গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। নারী-শিশুর অধিশাস্তা, পুরুষ-শিশুর অধিশাস্তার ন্যায় কঠোর ও স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন কখনই হয় না। নারী চরিত্রে ঈর্ষার প্রাধান্যও একটু অধিক। নিজের দৈহিক আকর্ষণের উপর তারা যে গুরুত্ব আরোপ করে, তার মুলও তাদের এই প্রাথমিক হীনতা-বোধের মধ্যে নিহিত। নারীদের মধ্যে স্বকামের মাত্রাধিক্য থাকায়, ভালবাসা দেওয়া অপেক্ষা ভালবাসা পাওয়ার দিকে তাদের আগ্রহ অধিকতর।

যেখানে নারী-শিশু সহজ ভাবে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হতে পারে না, সেখানে এক প্রতিরক্ষামুলক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। নারী-শিশু নিজের হীনতা অস্বীকার করে, পুর্বের আচরণ বজায় রাখে এবং সাধারণ নারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরিণত বয়সে, এরা অনেকেই বিবাহ করেন না এবং নানান্ বৌদ্ধিক ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন। অনেকে সমকামিতার দিকেও আকর্ষিত হন। ফ্রয়েডের মতে, এর পশ্চাতে কোন জন্মগত উপাদান কার্যকরী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

নারী-শিশুর মনোজগতের এই সকল বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য তথ্য ফ্রয়েড ও কয়েকজন বিখ্যাত মনঃসমীক্ষিকা তাঁদের রোগিনীদের সমীক্ষাসুত্রে প্রাপ্ত হন। অতএব, অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে যে এ ধরণের মানসিক বিবর্ত্তন ঘটে, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু সাধারণ-ভাবে দেখতে গেলে ফ্রয়েড নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হওয়ার যে ঘটনাক্রম বর্ণনা করেছেন তা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। প্রথমে ধরা যাক্ নারী-শিশুর নিজের লৈঙ্গিক হীনতার আবিষ্কার। ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশু পুরুষ-লিঙ্গের সঙ্গে নিজ-লিঙ্গের পার্থক্য অনুধাবনের ফলে হস্তমৈথুনকালে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকতর সুখ প্রদানের ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় নিজেকে হীন মনে করে। কিন্তু তথ্যগত ভাবে কি সকল ক্ষেত্রে এটি সত্য? জীব মাত্রেরই কতকগুলি যৌন সুখ-স্থান (erotic zones) আছে।

নারী-শিশুর ক্ষেত্রে clitoris একটি অনুরূপ তীব্র সংবেদনার স্থান। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে, নারী ও পুরুষ-শিশু স্ব-স্ব দৈহিক গঠন অনুসারে সুখ লাভে সক্ষম এবং সুখ লাভও করে। যদি সুখ লাভে কোন বাধা না থাকে, তাহলে অকারণে লৈঙ্গিক-ঈর্ষা কেন জাগবে? কোন বস্তুরই মুল্য বস্তুর জন্য নির্দ্ধারিত হয় না; হয় সেই বস্তুর আমাদের সুখ প্রদানের ক্ষমতার মাধ্যমে। ফ্রয়েডের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হলে, আমাদের একথা মানতে হয় যে নারী-শিশু পুরুষ-শিশুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে, পুরুষ-শিশুর সুখকে অধিকতর কাম্য বলে অনুভব করে ও সেই কারণে নিজের অভাব-বোধের জন্য নিজেকে হীন মনে করে। প্রথমতঃ এর মধ্যে একটা তুলনামুলক মুল্যায়ন রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ নিজের যৌনসুখকে হীন মনে করার বোধ রয়েছে। এই দু'টির কোনটিই সব ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। কোন একটা সুখকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেই সে সুখের সঙ্গে অন্য সুখের তুলনা করা যায়। যে সুখ নারী-শিশু ভোগ করেনি, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সে এতটা নিশ্চিত কি করে হল যে তার জন্য নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রকে ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে নি? বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ না করলেও, একাত্মীকরণের মাধ্যমে সে সুখ সে ভোগ করেছে। কিন্তু ভোগ করলেই কি নিজের সুখকে হীন বলে মনে হবে? এই বিচার তখনই আসতে পারে যখন পুরুষ-লিঙ্গের দ্বারা প্রাপ্ত সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। নইলে, দু'টো সুখ দু'টো বিশেষ ধরণের সুখ মাত্র। একথা অবশ্য বলা যায়, শিশু কোন্ সুখকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে, তা নির্ভর করছে, তার চাহিদার উপর। যে নারী-শিশু পুরুষ-লিঙ্গের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুখকে অধিকতর সুখকর বলে মনে করে এবং অনুরূপটি কামনা করে, তার ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক-ঈর্ষা এবং হীনতা-বোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু যে নারী-শিশু নিজের সুখটা কাম্য বলে মনে করে, তার ক্ষেত্রে এই ঈর্ষা-বোধ নাও জন্মাতে পারে। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পুরুষ অপেক্ষা হীন মনে করতে পারে কিন্তু তার কারণ তাদের লৈঙ্গিক হীনতা-বোধের মধ্যে নাও নিহিত থাকতে পারে। পৃথিবীতে সভ্যতা নির্বিশেষে সকল সমাজেই পুরুষরা অধিকতর সুখ, সুবিধা ও মুল্য পেয়ে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুলো অপেক্ষাকৃত কম। জন্ম থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে অন্ততঃ সুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্বিশেষে নারীদের পুরুষ অপেক্ষা নিম্ন স্থানই দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এই হীনতা-বোধ কতটা তার শারীরিক হীনতা-বোধ থেকে উৎপন্ন, এবং কতটা সামাজিক ব্যবহার-বৈষম্যের পুঞ্জীভূত ফল, সেটা সম্ভবতঃ বিচারের দাবী রাখে। বহির্জগতের মুল্যায়নের উর্দ্ধে উঠতে পারার জন্য ক্ষমতাশালী, সবল ও পরিণত অহমের প্রয়োজন। শিশুর ক্ষেত্রে অহম্ অপরিণত ও দুর্বল। তাছাড়া, সমস্ত হীনতা-বোধের ধারণাটিই সমাজ উদ্ভূত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারীর শরীরে যৌনসুখের স্থান বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষ অপেক্ষা নারীর যৌন-সুখ-বোধের বৈচিত্র্য ও বিস্তার অনেক বেশী, এ কথা প্রায় স্বীকৃত সত্য। দৈহিক শক্তিতে অবশ্য নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন এবং জীবনের বহু ক্ষেত্রে, বহু অবস্থায় পুরুষের উপর নির্ভরশীল। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারী তা উপলব্ধি করতে পারে। যদি এই অবস্থা সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে, নারী এই তথাকথিত নীচু অবস্থা অথবা পুরুষের প্রতি তার নির্ভরশীলতা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং নিজেই পুরুষ হয়ে উঠ্‌তে চায়—সে ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বে বিকৃতি দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহের মতে, ঈডিপাস-অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার্য নয়—বিশেষ করে নারী-শিশুর ক্ষেত্রে. তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ-সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি এক বিকল্প সমাধান উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ঈডিপাস-অবস্থার মুল দু'টি বৈশিষ্ট হল—(১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আসক্তি এবং (২) প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রোশ। অতি শৈশবাবস্থা থেকেই শিশুর মাতা কিংবা মাতৃ-স্থানীয়ার প্রতি আসক্তি এবং সেই আসক্তির পথে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রোশ লক্ষ্য করা যায়। Sibling rivalry অথবা ভাই-বোনেদের প্রতি ঈর্ষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের বহু পুর্বেই এই ঈর্ষার প্রকাশ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ঈডিপাস-অবস্থায় পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের প্রতি যে ঈর্ষা তার সঙ্গে এই ঈর্ষার গুণগত কোন প্রভেদ নেই। ডঃ সিংহের ভাষায়, I have not been able to trace any such distinctive feature between the two as yet. Only some differences that are noticeable are found in the area of forms of ideas connected with the sentiments & emotions of love & hate etc. and their expressions in the later phase." অর্থাৎ প্রাক্-ঈডিপাস স্তরের আক্রমমুলক মনোবৃত্তির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। পার্থক্যটি শুধু মানসিক contents এর ক্ষেত্রে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে তার বৃত্তি, প্রবণতা ও ব্যবহারের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সুচিত হতে থাকে। অতি শৈশব থেকেই শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও অল্প-সল্প সামাজিক শিক্ষাও দেওয়া হতে থাকে। ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আগমনের বহুপুর্ব থেকেই শিশুর মনে শাস্তি সম্পর্কে ভীতি দেখা দিতে ও প্রকাশ পেতে পারে। "fear or threat of punishment is understood from fairly early days of life. It is not possible to indicate any strict age limit for such understanding...... Handling & tickling of the sex-organ are first restricted & then thre-

atened with punishment......Are we justified, then, to hold that the castration threat modifies the Œdipus wishes of a child?" অবশ্য এ কথা স্মর্তব্য যে ডঃ সিংহের "উপস্থচ্ছেদ-ভীতির" ধারণা ফ্রয়েডের ধারণা থেকে কিছুটা পৃথক। ডঃ সিংহের মতে—Separation from, denial of or missing anything considered valuable may he felt as a loss." এবং এই ধরণের যে কোন প্রবল ক্ষতির আশঙ্কা নির্জ্ঞান-মনে উপস্থচ্ছেদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, অধিশাস্তার গঠন, যা ফ্রয়েডের মতে উপস্থচ্ছেদ-ভীতির প্রত্যক্ষ ফল, সম্পূর্ণরূপে উপস্থছেদ-ভীতির উপর নির্ভর করে না। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে পিতা-মাতার নিকট হতে রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশাস্তা অনুরূপ কঠোর নয়, আবার স্নেহপূর্ণ, কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশাস্তা অতিশয় কঠোর। ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, উপস্থছেদের-ভীতির কারণ হচ্ছে অবদমিত উপস্থচ্ছেদ-ইচ্ছা। এই উপস্থচ্ছেদ-ইচ্ছা শিশুর নিষ্ক্রিয়তা বা passivityর ইচ্ছা—যা অতি শৈশব-কাল থেকে অবদমিত হয়ে আসছে। "Castration threat, therefore, cannot be accepted as a product of Œdipus-complex. All that can be said is that gradually the threat of punishment gains wider range with the growth & development of the child which gets a further fillip in the Œdipus-stage." নারী-শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস-স্তরের আগমনের যে বর্ণনা ফ্রয়েড দিয়েছেন, ডঃ সিংহের মতে, মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সব সময় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। লৈঙ্গিক-ঈর্ষা অনেক মেয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, "but in actual analysis it is not found to be sufficiently strong to effect the change in shifting the choice of the object of love from her mother to her father as suggested by Freud. তাঁর মতে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ইত্যাদি বহুলাংশে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বা প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রবণতার স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন বহু পরিবার রয়েছে যেখানে অতি অল্প বয়স থেকে মা ও মেয়ে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। মনঃসমীক্ষণ কালে অবশ্য প্রায় প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে উভয়বলতা (ambivalence) এর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য যে পিতা-পুত্র ও মা-মেয়ের সম্পর্কের বিরোধিতাকে সাধারণ নিয়মরূপে মেনে নিতে হবে—তা সমর্থন-যোগ্য নয়। সন্তানদের মধ্যে পিতার কন্যার প্রতি এবং মায়ের পুত্রের প্রতি আসক্তি বহুলাংশে আমাদের জৈবিক-প্রবণতার (biological tendency) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে তিনি মনে করেন। কোন শিশুই পিতা কিংবা মাতার প্রতি আকর্ষিত হবে না যদি পিতা-মাতা তার প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার প্রদর্শন না করেন অথবা অতিশয় কঠোর, শাস্তিপ্রবণ

ও নির্দয় হন। শিশুর প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে তার প্রয়োজনের তৃপ্তি। যেহেতু মা বা মাতৃস্থানীয়া তার সেই প্রয়োজনগুলি মেটান, সুতরাং শিশুর প্রথম আকর্ষণ মায়ের প্রতি। ক্রমশঃ শিশুর চাহিদার সঙ্গে মানসিক চাহিদা, যথা প্রশংসা পাবার ইচ্ছা, মুল্য পাবার ইচ্ছা, স্নেহ, ভালবাসা পাবার ইচ্ছাও যুক্ত হতে থাকে। এই চাহিদার কেন্দ্র প্রথমে তার পিতা-মাতাই হন। শিশুর এই সকল চাহিদা যদি পিতা-মাতার নিকট হতে তৃপ্তি লাভ না করে অথবা যদি বিপরীত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্যবহারকারীর প্রতি শিশুর আকর্ষণ বজায় থাকে না, অথবা শিশু তার প্রতি আকর্ষিত হয় না। নিজেদের জৈবিক-প্রবণতা অনুসারে পিতারা কন্যার প্রতি এবং মাতারা পুত্রের প্রতি অধিকতর স্নেহ-ভালবাসা অনুভব ও প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং শিশু যেহেতু বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার নিকট হতে অধিক পরিমাণে মুল্য ও স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে থাকে, সেহেতু ঈডিপাস-স্তরে তার ইচ্ছাগুলি বিপরীত জনয়িতার প্রতি ধাবিত হয়।

ডঃ সিংহের মতে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার নির্দ্ধারণে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কার্যকরী—তা হচ্ছে আমাদের উভয়কাম-প্রবণতা বা bisexuality. প্রতি পুরুষের মধ্যে নারীত্ব ও নারীর মধ্যে পুরুষত্বের শারীরিক ও মানসিক উপাদান রয়েছে। ব্যক্তিত্বের পুর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে এই দুই বিপরীত মানসিকতার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে। যৌন-সুখও পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করা তখনই সম্ভব, যখন নারী ও পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরস্পরের সুখ-ভোগে সক্ষম হবেন। আমাদের এই উভয়কামিতার জন্য বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাত্মীকরণ সহজতর হয়। কারণ বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে আমাদের উভয়কামিতার বিপরীত অংশটি তৃপ্ত হয়—অর্থাৎ পুত্রের সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে মায়ের মধ্যে যে পুরুষত্ব (Masculinity & Activity) রয়েছে তা তৃপ্ত হয় এবং পিতার ক্ষেত্রে কন্যার সঙ্গে একাত্মীকরণের ফলে তার নারীত্ব (femininity ও passive desires) তৃপ্ত হয়। সুতরাং পিতা-মাতা বিপরীত লিঙ্গের শিশুর প্রতি অধিকতর ও গভীরতর স্নেহ অনুভব করেন এবং এই স্নেহের প্রদর্শনের ফলে শিশুও বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আকর্ষিত হয়। ডঃ সিংহের ভাষায়, "The child of the opposite sex thus acts as a pleasant stimulus for whom the parent feels greater attachment. The child also learns to respond to this special attachment in the process of which the child also finds greater pleasure by identification with the parent of the opposite sex for the same reason."

অতএব, দেখা যাচ্ছে, ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার কারণ সম্পর্কে এই দুই মনঃসমীক্ষক এক মত নন, যদিও তার অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে দু'জনেই একমত। দু'জনের বর্ণনাই

মনঃসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর। সম্ভবতঃ লিবিডোর বিবর্তনের এই স্তর সম্পর্কে আরও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। জৈবিক-প্রবণতাকে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার কারণ বা একটি কারণরূপে স্বীকার করা, ফ্রয়েডের মতে, প্রশ্নটির অতিশয় সরলীকরণ। অপরদিকে, তিনি নিজে যে জটিল তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তার সম্পূর্ণ সমর্থনও পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতের গভীরতর অনুসন্ধান হয়ত আমাদের এ বিষয়ে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দানে সাহায্য করবে।

ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার বহু উদাহরণ বিভিন্ন দেশের রূপকথা, পুরাণের কথা, কাব্য-সাহিত্য ও বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত যে সকল নৃতাত্ত্বিক (anthropological) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যেক সভ্যতায় কোন না কোন রূপে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ফ্রয়েড তাঁর "Totem and Taboo" গ্রন্থে বিভিন্ন আদিম জাতির Totem এর প্রতি আপাতবিরোধী ও অব্যাখ্যাত ব্যবহারগুলিকে তাঁর ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার মাধ্যমে এক সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, Totem হচ্ছে সাধারণভাবে পিতার প্রতীক। যে জাতির যে Totem, তাদের সেই Totem (totem সাধারণতঃ কোন বিশেষ জাতির জন্তু হয়) মারা নিষিদ্ধ এবং যে যে জাতির সেই এক totem তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই প্রথার মূল কারণ পিতার প্রতি শিশুর যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি তাকে সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে বাধা দান করা। দ্বিতীয় প্রথার মাধ্যমে incest বা সেই একই দলের লোকেদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে এই বাধাগুলির মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রবৃত্তিগুলি মানব-মনে ক্রিয়াশীল। তাঁর নিজের ভাষায়—"The law only forbids men to do what their instincts incline them to do, what nature itself forbids & prohibits, it will be superfluous for the law to prohibit & punish.........instead of assuming, therefore, from the legal prohibition of incest, that there is a natural aversion to incest, we ought rather to assume that there is a natural instinct in favour of it & that if law represses it, it does so, because civilized men have come to the conclusion that the satisfaction of these natural instincts is detrimental to the general interests of society."

বিশেষ বিশেষ উৎসবে totemকে হত্যা করা, তারপরে শোক পালনকরা ও শেষে আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথাটিও ঈডিপাস-গূঢ়ৈষার আলোকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নির্জ্ঞান-মনে অবদমিত পিতার প্রতি ক্রোধ ও রাগ সামাজিকভাবে বিশেষ বিশেষ দিনে

Totemকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ক্রোধ-প্রকাশের পর, পিতার প্রতি ভালো লাগা বা ভালবাসার ইচ্ছাগুলি প্রবল হয়ে ওঠে—তাই শোকপালন। অবশেষে, ইচ্ছাপুরণের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজেও নানান্ প্রথার মাধ্যমে ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার ইঙ্গিত মেলে, যেমন, কন্যাকে মা ও পুত্রকে বাবা বলে সম্বোধন করা। উত্তর প্রদেশের এক বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম পুত্রের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—তাতে নাকি তার আয়ুক্ষয় হয়। (স্বামীর নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—পুত্রের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ—একই কারণ। নির্জ্ঞান-মনে স্বামী পিতার প্রতীক।) ঐ একই প্রদেশে এক প্রচলিত বিশ্বাস যে মায়ের শরীরের দৈর্ঘ ছেলের কাঁধ পর্যন্ত হওয়াটা শুভ। এইগুলির পশ্চাতে ঈডিপাস-প্রবণতার উঁকি-ঝুঁকি ধরতে পারা কঠিন নয়। এছাড়া নানান্ পুজো-পার্বন, ব্রতকথা ইত্যাদির মাধ্যমে এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করার সম্ভাবনা বর্তমান।

যৌন-বস্তু নির্বাচনে অবদমিত ঈডিপাস-কামনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণভাবে, পুরুষরা তাঁদের স্ত্রীর মধ্যে এক মাতৃরূপও সন্ধান করেন এবং নারীরা তাঁদের স্বামীর মধ্যে পিতার ভাবরূপের সন্ধান করেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চাহিদা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মনে তাঁর মায়ের ভাবরূপের নিকট তাঁর চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বহু পুরুষের দাবী থাকে, স্ত্রী তাঁকে দেখবে, সেবা-শুশ্রূষা করবে, যত্ন করবে, সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখবে ইত্যাদি। অবশ্য তার সঙ্গে বয়স্কজনোচিত অন্যান্য চাহিদাও যুক্ত থাকে। স্ত্রীর প্রতি মাতৃসুলভ চাহিদা কতটা হবে—সেটা নির্ভর করে তাঁর শৈশব ঈডিপাস-গুঢ়ৈষার সমাধানের উপর। শিশু যদি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মায়ের প্রতি তার আকর্ষণের স্বরূপ অনুধাবন করে, সেই গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ বয়স্ক পুরুষের সুখভোগে সক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রীর নিকট তার মাতৃসুলভ চাহিদার পরিমাণ কম হবে। আর যদি বয়োবৃদ্ধির পরও ঐ চাহিদাই প্রধান হয়ে মানসিক চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে থাকে তাহলে অবস্থা ভীতিকর হয়ে ওঠে কেননা তাহলে স্ত্রীদের চাহিদা-তৃপ্তির উপায় হারিয়ে যায়।

সংকলন :—

শিশুর ক্রমবিকাশ

দীপালি বসু

প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ ধরে একটি জীব-কোষ মাতৃজঠরে থেকে মাতৃ-দেহরস আহরণ করে একটি শিশুতে পরিণত হয়। সদ্যজাত শিশু একটি অসহায় জীব। কান্না এবং তারপর চোষার ক্ষমতার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের সাথে মোকাবিলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে থাকে ও নানা ক্ষমতার অভিব্যক্তি হয়। দেহে ও মনে একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর বিকাশ ধাপে-ধাপে কিভাবে ঘটে তা মনোবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে শিশুর পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশ ধারার উপরই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের রূপ ও মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এই কারণেই স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুর বিকাশধারা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার। নিচে এই বিকাশধারার একটি তালিকা দেওয়া হলো। এটি মনোরোগ-চিকিৎসক Stella Chess লিখিত একটি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত স্বাভাবিক শিশুর আচরণের তালিকার (Land marks of Normal Behaviour Development) সংক্ষিপ্তসার। প্রবন্ধটি 'Comprehensive Text Book of Psychiatry (Editors-Freeman & Kaplan ; 1967) নামক পুস্তকে প্রকাশিত।

৪ সপ্তাহের নিচে বয়স :—

চিত হয়ে শুয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে পারে। উপুড় করে রাখলে মাথা এদিক ওদিক নাড়াতে পারে। ঝুমঝুমি বা অনুরূপ কিছুর শব্দে সাড়া দেয়। ক্ষণিকের জন্য আশে-পাশের লোকজন বা বস্তুসামগ্রীর নড়াচড়া লক্ষ্য করতে পারে। গলা দিয়ে অল্প-অল্প বৈশিষ্ট্যহীন আওয়াজ বের করে। কাঁদলে কোলে তুলে নিলে চুপ করে।

৪ সপ্তাহ বয়স :—

হাত মুঠি করতে পারে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাথা সোজা করে রাখতে পারে। চলমান কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি নজর রাখতে পারে। গ্‌—গ্‌—গ্‌ ইত্যাদি ধ্বনি

করে। কাছে কেউ এসে দাঁড়ালে বা ঝুঁকে পড়লে চুপ করে। কেউ কথা বললে লক্ষ্য করে।

১৬ সপ্তাহ বয়স :—

ঘাড় শক্ত হয়। মাথা সোজা করে রাখতে পারে। উপুড় করে দিলে মাথা ৯০° ডিগ্রী অনুরূপ উঁচু করে তুলতে পারে। সামনে কোন জিনিষ আস্তে আস্তে নড়া-চড়া করলে তার প্রতি ভালোভাবেই নজর রাখতে পারে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে ঝুমঝুমি জাতীয় কোন জিনিস ঝুলিয়ে দিলে হাত দিয়ে তা ধরবার চেষ্টা করে। খিল্‌খিল্ করে হাসতে পারে। কিছু সময় ধরে উ—উ—উ—, আ—আ—আ— ইত্যাদি ধ্বনি করতে পারে। অন্য কারুর হাসিতে সাড়া দিতে পারে। অপরিচিত পরিস্থিতি ও পরিবেশ বুঝতে পারে।

২৮ সপ্তাহ বয়স :—

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতের উপর ভর রেখে বসতে পারে। দাঁড় করিয়ে ধরে রাখলে লাফাতে শুরু করে। হাত বাড়িয়ে খেলনা ধরে। ঝুমঝুমি ধরে ঝাঁকাতে চেষ্টা করে। কাঁদবার সময় ম্—ম্—ম্ ধ্বনি করে। বিভিন্ন স্বরবর্ণমূলক ধ্বনিও করতে পারে। পায়ের বুড়ো আঙুল মুখে দেয়। মুখের সামনে আয়না ধরলে তার উপর চাপড়াতে থাকে।

৪০ সপ্তাহ বয়স :—

একা একা সহজভাবে বসে থাকতে পারে। হামাগুড়ি দেয়। কিছু ধরে নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। আঁকি-বুকি দেবার মত হাতের ভঙ্গী করতে পারে। দা—দা—দা শব্দ করতে পারে। নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়। দুধের বোতল ধরে খেতে পারে। ওর সঙ্গে কেউ খেলা করলে তাতে যোগ দেয়।

৫২ সপ্তাহ বয়স :—

অন্য কারুর হাত ধরে হাটতে পারে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে। কিছু প্রকাশ করার জন্য অর্থহীন শব্দ করে। কেউ চাইলে নিজের খেলনা অন্যকে দেয়। জামা-কাপড় পরাবার সময় সহযোগিতা করে।

১৫ মাস বয়স :—

টলতে টলতে হাটতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৩-৫টা অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের কোন ছবি দেখালে তার উপর চাপড়াতে

থাকে। নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। খেলার ছলে বা অপছন্দ হলে জিনিষ-পত্র ছুঁড়ে মারে।

১৮ মাস বয়স :—

ভালোভাবেই হাটতে পারে। অন্যের হাত ধরে সিঁড়ি উঠতে পারে। বল ছুঁড়ে মারতে পারে। পেন্‌সিল বা চক দিয়ে আঁকি-বুকি দেয়। নিজের নাম বলতে পারে। প্রায় ১০টা অর্থপুর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। ছবিতে পরিচিত জিনিস দেখাতে পারে। খুব সাধারণ নির্দেশ যেমন 'মাকে গ্লাসটা দাও', বা 'টেবিলের উপর বল রাখ' —ইত্যাদি পালন করতে পারে। কিছু-কিছু খাবার ফেলে ছেড়ে নিজে নিজে খেতে পারে। নিজের পুতুল কোলে তুলে নিয়ে আদর করে।

২ বছর বয়স :—

না পড়ে ভালোভাবে দৌড়াতে পারে। বড় বল পা দিয়ে মারে। একা একা সিঁড়ি উঠতে বা নামতে পারে। ট্রেনের অনুকরণে দিয়াশলাইয়ের বাক্স বা ঐ জাতীয় জিনিষ পর পর সাজায়। দেখে দেখে খাড়া বা গোলমত দাগ দিতে পারে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করে বাক্য বলতে পারে। সাধারণ নির্দেশ পালন করে। টেনে জামা খুলতে পারে। ঘর-সংসারের কাজের অনুকরণ করে হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি ইত্যাদি দিয়ে রান্না-বাটি বা পুতুল খেলে। নিজেকে নিজের নাম বলে উল্লেখ করে।

৩ বছর বয়স :—

তিন চাকার সাইকেল চড়তে পারে। নিচের সিঁড়ি থেকে লাফ দেয়। একের পর অন্য পা ব্যবহার করে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৯-১০টা কাঠের টুকরো বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ পর-পর স্তম্ভের মত করে সাজাতে পারে। গোল এবং ক্রশ চিহ্ন অনুকরণ করে আঁকতে পারে। নিজে ছেলে না মেয়ে তা বলতে পারে। বহুবচন ব্যবহার করে। বইয়ের পরিচিত ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারে। নিজে নিজে জুতো পরে। জামার বোতাম খুলতে পারে। ভালোভাবে নিজের হাতে খেতে পারে।

৪ বছর বয়স :—

এক পদক্ষেপে এক সিঁড়ি নামতে পারে। এক পায়ে ৪ থেকে ৮ সেকেণ্ড দাঁড়ায়। চার সংখ্যা পর্যন্ত কেউ বললে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তিনটি জিনিষ দেখিয়ে দেখিয়ে গুনতে পারে। রংয়ের নাম ঠিকমত বলতে পারে। 'উপরে', 'নীচে', 'মধ্যে',

'সামনে', 'পিছনে' এবং 'পাশে' —এগুলি বুঝতে পারে। নিজে নিজে দাঁত মাজতে মুখ ধুতে ও মুছতে পারে। অপর শিশুদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা করে।

৫ বছর বয়স :—

একের পর অন্য পা দিয়ে লাফাতে পারে। পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয়। চতুষ্কোন আঁকতে পারে। দেখে বোঝা যায় এমনভাবে মাথা, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ মানুষের ছবি আঁকতে পারে। ১০টা জিনিষ নির্ভুলভাবে গুনতে পারে। প্রচলিত মুদ্রা চিনতে পারে। বুঝতে না পারলে· শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। জামা, প্যান্ট ইত্যাদি নিজে নিজে পড়তে ও খুলতে পারে। কিছু কিছু বর্ণ লিখতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা করতে পারে।

একটি নব প্রক্ষোভবাদ সম্বন্ধে অভিভাবন (৩য়)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় *

(ইং ১৯৩২ সনে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা-বিভাগের সভাপতি ডঃ সুহৃদ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাষণ, —Suggestions for a new Theory of Emotion -এর বাংলা অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫ম খণ্ডে শিশুদের প্রক্ষোভ ও অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে ষ্টার্ণ (Stern) প্রক্ষোভকে ব্যক্তিত্বের একটি প্রলক্ষণ (trait) হিসাবে দেখিয়েছেন। প্রক্ষোভ ও অনুভূতির সম্পর্ক আলোচনায় তিনি বলেছেন—"আধুনিক জীবনের ধারা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মাত্রায় অভিব্যক্ত ; অনুভূতির তীক্ষ্ণতাবোধ ছাড়াও অনুভূতি-গুরুত্বেরও মাত্রাবোধ হয়। এমন অনেক অনুভূতির উপলব্ধি হয় যেগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া সত্বেও সেগুলিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সামান্যই দেওয়া হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতির প্রকাশে তীক্ষ্ণতার মাত্রা থাকে খুব কম।" কাৎজ্ (Katz) এই খণ্ডে শিশুদের সঙ্গে বয়স্কদের কথাবার্ত্তার মাধ্যমে শিশুদের বিবেক গঠন সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করেছেন।

৬ষ্ঠ খণ্ডে, নন্দনতত্ব (Aesthetics) এবং ধর্মের সঙ্গে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারি। ল্যাঙ্গফেল্ড্ (Langfeld) এর মতে—"যেখানে একধরণের কোন মানসিক দ্বন্দ্বকে বাস্তব জগতের চিরাচরিত কোন কর্মের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেখানেই সুরু হয়েছে কলাসৃষ্টির আকাঙ্খা।" এই সূত্রে তিনি ফ্রয়েড-এর সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঠিক একই রকম ভাবে নান্দনিক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস আমরা আয়ত্ব করতে পেরেছি। য়্যাঞ্চ্ (Jaensch) দেখিয়েছেন, ব্যক্তি বিশেষ যে ধরণের ধর্মীয় আধানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যে আদর্শবোধের

---

* মনোমিতিবিদ, ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাধ্যমে সেগুলির মুল্যায়ন করেন সেগুলি তিনি যে ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারই ফলস্বরূপ। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) 'আই' (I-) অথবা সম্পুরিত জাতিরূপ (integrated type) এবং (২) 'এস' (S-) বা সহসংবেদন জাতিরূপ (synaesthetic type)। গ্রুহেন (Gruehn)-এর মতে ধর্ম-অনুভূতির মানসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দু'টি কর্ত্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ ধর্মানুভূতির মৌল উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও গঠনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার কর্ত্তব্যটি আমরা সম্পাদন করেছি। "ধর্ম, যাকে আমরা সাধারণতঃ ধর্মানুভূতি বলি সেটি একটি বিশেষ যৌগিক আধান, একটি সংশ্লেষণ (synthesis) বা একটি গেষ্টাল্ট, সেটি দুই গোষ্ঠীর (মানসিকতা ও মতাদর্শ) একান্ত মিলিত প্রকাশ। আবার একই ধারে এটি স্ব-কার্মিক (self-function) এবং একটি মানস-ক্রিয়া (mental operation)"। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে কর্ত্তব্যটিকে আমাদের সামনে রাখতে হবে তা হোল, "বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতিগুলিকে একটি একটি করে সাজানো আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করা।"

৭ম খণ্ডে ব্রেট (Brett) সংক্ষেপে প্রক্ষোভ-তত্ত্বগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ৮ম খণ্ডে টেরী (Terry) শিশুদের আবেগাদি নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার এবং প্রক্ষোভগুলিকে যথাযথ পরিচালন করার বিষয়ে বয়স্কদের কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা জনিত বিপদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পুস্তকটির সবকটি পরিচ্ছেদকে তাড়াতাড়ি আর খানিকটা অপ্রতুল নিরীক্ষণের পর, এই অধিবেশনে পঠিত প্রথম প্রবন্ধটিকে, যেটিকে খানিকটা ইচ্ছা করেই বাদ রেখেছিলাম, সেটিকে এখন স্বস্তিতে আলোচনা করছি। স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় বেণ্টলে (Bentley) এখানে প্রশ্ন তুলেছেন,—আজকের দিনে প্রক্ষোভ কি কেবল পাঠ্য-পুস্তকের একটি শিরোনামা মাত্র না আরও কিছু? প্রসঙ্গটিকে এত দৃপ্তকণ্ঠে বলার মাধ্যমে তিনি বহু অনামী মনোবৈজ্ঞানিক গবেষকের মনোভাবকেই প্রকটিত করেছেন যাঁরা এটার প্রকাশ্য আলোচনায় নানা কারণে ভয় পাচ্ছিলেন। আমি জানি না, এই অধিবেশনের শেষে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন করা বা তাঁর মনোভাবের কোন রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কিনা! তিনি কি বুঝতে পেরে-ছিলেন, মতবাদগুলির বৈপরীত্ত কমে গেছে বা প্রক্ষোভ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধানের কাছে এসে পৌছেছে?

সমস্যাগুলি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছতে পারাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি কি না তার চাইতে প্রধান সমস্যাটির পটভূমির একটি প্রশ্ন আমাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বর্তমান দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যায় বলা হ'য়েছে প্রক্ষোভের অনুসন্ধান মাত্র অল্পকাল হোল শুরু হ'য়েছে—তাইজন্য তখনও পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে যথার্থ পদ্ধতি বা নির্দ্দিষ্ট গবেষণা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। আজ আমার জান্‌তে ইচ্ছা করে, এতদিন পর্য্যন্ত মানসজীবনে প্রক্ষোভের অবদানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'লেও যতটা অনুধাবন করা উচিত ছিল তা' না ক'রে, ঐ সম্বন্ধে কী এমন ঘটল যার ফলে ইদানীং কালের বিখ্যাত সব মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়ে হঠাৎ এই ধরণের একটি বিশেষ আলোচনা সভার আহ্বান করতে হোল!

সাধারণতঃ এইধরণের জিজ্ঞাসার যে উত্তরগুলি দেওয়া হ'য়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান হোল—প্রক্ষোভ মানবমনের এমনই এক অদ্ভুত (peculiar) অবস্থা, যাকে অন্যান্যসব মানস-ক্রিয়ার অনুশীলনে প্রযোজ্য প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা করা যায় না। প্রয়োগশালায় একটি যথার্থ আবেগ সৃষ্টি ক'রে সেই মানসিকতার উপর অনুসন্ধান চালানো একরকম অসম্ভবই বটে—সেইজন্যে ইচ্ছা থাক্‌লেও কাজের অভাব দেখা দিয়েছে। আমি মনে করি, এই ধরণের ব্যাখ্যা অর্দ্ধসত্য,—এতে আমার প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব হয়ত কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এমন 'হঠাৎ-উৎসাহের' প্রাবল্যের কারণটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এর জবাবটিকে আমাদের অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

আমার মনে হয়, প্রক্ষোভ সম্বন্ধে জানার এই নূতন প্রচেষ্টার কারণ বোঝা অনেক সহজ হবে যদি আমরা মনে রাখি যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড-এর নির্জ্ঞানতত্ত্ব এই সময়েই আবিষ্কৃত হ'য়েছে। জ্যাস্ট্রো (Jastrow)'র মতে এই সমসাময়িকতা আকস্মিক নয়; অবশ্য, তিনি এর যে বিরাট গুরুত্ব ও প্রভাব আছে সেটাকে স্বীকার করেন নি। আমার মতে, এটাই একমাত্র ঘটনা যা অনুভূতি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে আরও জানার প্রেরণা এনে দিয়েছে। এককথায় ফ্রয়েড মানুষের মনের ঢাক্‌না খুলে দিয়ে তার মধ্যে যা' লুকিয়ে ছিল সেগুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কারাকক্ষের দরজা খোলামাত্রই যেন বন্দীরা বাইরে এসে প'ড়েছে।

তাই মনে হয় লোকে আজ শক্তিশালী প্রক্ষোভগুলির প্রভাবে মানসচেতনা কিভাবে আলোড়িত হয় তা জানতে পেরেছে আর সেই কারণেই মনস্তাত্ত্বিকরা বেশী করে সেইদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। এই নবস্ফুরিত আবেগ আজ সর্ব্বমনে সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। যখন ফ্রয়েড উদাহরণ ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিমানসকে অবদমন মুক্ত ক'রে নতুন ক'রে প্রতিভাত করলেন তখন থেকেই পার্থিব সব কিছু যেন তাদের অবগুণ্ঠন

ত্যাগ ক'রে আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হোল। এই তত্ত্ব অপেক্ষা আজ পর্যন্ত আর কোন যথার্থ অভীক্ষা এবং অভিক্রীয়াযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আমার চোখে পড়েনি। ফ্রয়েড এক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান, যখন তিনি সবেমাত্র অস্বাভাবিক অবদমনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে শুরু ক'রেছেন তখনই বিশ্বের বিদ্বৎসমাজ চিরাচরিত ধারা পাল্টে ফেলে তাঁর মুল প্রতিবেদনগুলির পরীক্ষায় এবং প্রধান মতবাদগুলির সত্যতা নিরূপনে বিরাট এক অভিক্রীয়া শুরু করলেন।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি কারণ আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, প্রক্ষোভকে তার নিজস্ব আঙ্গিকে বুঝবার চেষ্টা না ক'রলে কখনই এর প্রারম্ভিক ও শুদ্ধসত্ত্বা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হবে না। টিচেনার তাঁর মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলেছেন, মানুষ নিজেকে চিন্তাশীল জীব ব'লে গর্ব্ব করে, কিন্তু সারাজীবনে বাস্তবিক সে কতটুকু সময় অতিবাহিত করে তার চিন্তায়! —বস্তুতঃ মানুষ প্রায় সবকিছুকেই প্রায়সময়ই বিনা সমালোচনায় মেনে নেয় আর সংস্কারগুলিকে তো বিনা যুক্তিতেই আত্মস্থ করে। আমার মনে হয়, আবেগের ব্যাপারেও এইধরণের একই মন্তব্য করা যেতে পারে—। মানুষ সারাজীবনে কতটুকু সময় প্রক্ষোভকে অনুভব করতে পারে! অনুভুতিগুলি হোয়ে দাঁড়ায় অভ্যাস আর আবেগগুলি সামাজিকতার কয়েকটি বিশেষ দিক হিসাবে দেখানো হ'য়ে থাকে। সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের দিনে শুদ্ধ প্রক্ষোভের বিভিন্ন প্রকাশ ও প্রকারকে কিভাবে অনুভব করা যাবে? বিভিন্ন বীক্ষনাগারে মনস্তাত্ত্বিকরা প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা' দেখেছেন তা তার কঙ্কালমাত্র—একটি ক্ষুদ্রাংশ। জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের সহায়তায়, মনোবিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রক্ষোভের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানই অর্জ্জন করেছে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত স্নায়ু-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে এবং মানসিক হাসপাতালগুলিতে অস্বভাবী-মন সম্বন্ধে জানা না গেছে ততদিন পর্যন্ত প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নি, আর, গবেষণার আঙ্গিকে তার স্থানও যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নি। প্রক্ষোভ-দ্যোতনার (expressions of emotion) প্রকার ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণায় শারীরবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সাফল্যলাভ ক'রেছেন কিন্তু প্রক্ষোভের সূক্ষ্ম ও বিভিন্নমুখী উদ্গতিগুলি (sublmations) সম্বন্ধে সবেমাত্র আমরা কিছু কিছু জানতে পারছি!

এ পর্য্যন্ত যা বলেছি তা যদি সত্য হয়, তবে এটাও বলা উচিত যে, সামগ্রিক বিচারে 'অনুভুতি ও প্রক্ষোভ' পুস্তকটিতে মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বের স্থান খুব কমই দেওয়া হ'য়েছে। এখানে মনঃসমীক্ষণকে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের রূপাবস্থার সঙ্গে এক ক'রে দেখানো হ'য়েছে

আপাতঃদৃষ্টিতে এইধরণের মনোভাব সমর্থনযোগ্য, কারণ মনঃসমীক্ষকরা সাধারণতঃ মানসিকরোগীদেরই পর্যবেক্ষণ চিকিৎসা ক'রে থাকেন। অধিকাংশ মনঃসমীক্ষকরাই চিকিৎসক, তাই স্বভাবতঃই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরাই তাঁদের কাছে আসেন আর তাঁরা এঁদেরই মানসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের বেশী সুযোগ পান। সেই কারণে তাঁরা যে মনস্তত্ত্বের চিরাচরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারেন নি সেটা তাঁদের অপারগতা নয়। এদিক থেকে বিচার করলে, তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের দায়িত্ব হ'ওয়া উচিত, চিকিৎসকসমাজ যে বিশাল তথ্যগুলির পরিবেশন করছেন সেগুলিকে উপযুক্তভাবে আত্তীকরণ করা এবং মনস্তত্ত্বের পরিধিতে যথাযথ পরিচয়ে সেগুলিকে বিন্যস্ত করা। চোখ বন্ধ ক'রে আর কিছু নেই—এই ধরণের চিন্তা করার অভ্যাস যেমন বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে ক্ষতিকর, তেমনি অষ্ট্রীচ্ পাখীর আত্মহননকারী ব্যবহারের মতই পরিত্যাজ্য। আমি জানি না, এই অধিবেশনে ফ্রয়েড, জোন্স, ব্রীল প্রমুখ চিন্তানায়কদের নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল কি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমি অন্য বহু কর্মীর সঙ্গে একমত হ'য়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হ'চ্ছি যে এই ধরণের বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থে একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ বাদ পড়ে গেছে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককভাবে যত সুন্দরই হোক না কেন তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমিতি না থাকলে তা' কখনই সৌন্দর্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। ঠিক এই ঘটনাই এই পুস্তকটির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এখানে প্রতিটি প্রবন্ধই নিজ ভঙ্গীতে সুন্দর, কিন্তু যেটি সেগুলির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারত, তাদের সকলের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনা করতে পারত, বাদ-প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে একটা ঐকাত্ম্যবোধের সূচনা করতে পারত—তারই অভাব এখানে ঘটে গেছে।

সমগ্র পুস্তকটি সম্বন্ধে মোটামুটি এই আলোচনার পর প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্বন্ধে এখন আলাদা করে কিছু বলার চেষ্টা করছি। প্রধানতঃ পুস্তকটির প্রথমাংশের ওপরই আমি বেশী নজর দেব কারণ সেখানেই অনুভূতি ও প্রক্ষোভের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আর একটি কারণ হোল, আমার প্রধান উদ্দেশ্য হোল প্রক্ষোভ বা আবেগের একটি সাধারণ তত্ত্বের আবিষ্কার করা,—কোন নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর আলোচনা করা নয়।

বর্ণনামূলক মনস্তত্ত্বের (Descriptive Psychology) ক্ষেত্রে ক্র্যুগারের প্রবন্ধটি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর চিন্তাশীলতা, যুক্তির সংগতির পরিচয়ে এক অসামান্য নিদর্শন। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলীর বর্ণনায় যথাসম্ভব সত্যতা রক্ষা করার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই তত্ত্বটির মূলকথা হোল, আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা সব সময়েই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াসে এক একটি যৌগিক সামগ্রীকতা

(complex total)। তাঁর মতে অনুভূতিগুলিও এই ধরণের সামগ্রীক অভিজ্ঞতার যৌগিক উপাদানগুলির দ্বারা সৃষ্ট। অভিজ্ঞতাসমূহের গুণগত পরিবর্তনের একটি অনবচ্ছেদক মান আছে, আর তারই ভিত্তিতে অনুভূতিসমূহ একটি থেকে অপরটিতে, এমন কি বিপরীত গুণসম্পন্ন দিকেও পরিবর্তিত হয়। যে অনুভূতিগুলি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ তাদের গুণগত প্রকারভেদের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। এখানে গেষ্টাল্ট্ মতবাদকে অনুসরণ করা হয়েছে, অবশ্য সেটা প্রতিবেদিত হয়েছে গ্যান্‌ৎসীট (Ganzheit) নামক আর একটি ব্যাপকতর তত্ত্বের পরিচয়ে। অভিজ্ঞতারূপ অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর এই মতবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় হিন্দুশাস্ত্রের রসাভাব, চিদাভাব ইত্যাদি ভাবকে। এছাড়াও এই পূর্ণ-অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রকাশে যে প্রবল ইচ্ছার রূপ আমরা দেখেছি, অনুভূতি ও প্রক্ষোভের ব্যাখ্যায় তার একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ক্রুগারের উপরোক্ত তত্ত্বটি আমি যথাযথ বুঝতে পেরেছি কিনা তা' সঠিক বলতে পারছি না। উদাহরণ স্বরূপ মনে হয়, তিনি যে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি-অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে যৌগিক পূর্ণতা বা গ্যান্‌ৎসীটের প্রতি নোদনার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার কোন চেষ্টাই করেন নি। যখন তিনি দেখালেন সর্বতোরূপে অভিজ্ঞতা সংজ্ঞানকে ভরিয়ে রেখেছে, তখন কি তিনি ধরে নিয়েছিলেন অনুভূতিই অভিজ্ঞতার পটভূমি ? অনুভূতিগুলি কি যৌগিক পূর্ণতার একটি বৃত্তি (function), না এগুলি মানসিক সংগঠনের অংশগুলির মাত্রা ও গুণের সংযোগে পূর্ণতা প্রাপ্তির হেতু ? এটা সত্য যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় একটি অনবচ্ছেদক গুণমানের ভিত্তিতে। কিন্তু কখনো কখনো, যেমন, দ্বি-অস্মিতা (double personality) বা বহু-অস্মিতা (multiple personality) সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই অনবচ্ছেদকের মাঝে বিপজ্জনক ভাঙনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এছাড়াও আমার মনে হয় সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতায় তথাকথিত অনবচ্ছেদক গুণমানের আংশিক কারণ হিসাবেও নির্জ্ঞান-মনের তথ্যগুলিকে আমল দেওয়া হয়নি।

জেম্‌স্-ল্যাঙ্গের প্রান্তিক তত্ত্বের (peripheral theory) সমর্থনে রেপারেদি যা বলেছেন তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু তিনি মূল সমালোচনাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। শারীরবিদ্যার বিচারে বলা যায় আমরা যে প্রক্ষোভগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করি সেগুলি আমাদের অবয়বিক পরিবর্তনের (organic changes) সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই উক্তির দ্বারা প্রক্ষোভের গুণগত ভাব সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। তাই শুধুমাত্র শারীর-বিদ্যার মাধ্যমে প্রক্ষোভকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলে তা হয়ে পড়বে সর্বতোভাবে একমুখী। ক্যানন, বেথ্‌টেরেভ এবং অন্যান্যদের প্রক্ষোভ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ও

উচ্চমানের শারীরতাত্ত্বিক গবেষণাদির কথা কেউই অস্বীকার করেন না। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাঁদের ও চেষ্টিতবাদীদের উদ্দেশ্যে প্রিন্স্ যা' বলেছেন তা' সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে বলি—"ঈশ্বর আপনাদের গতি দিন ; যান, যতদূর পারেন যান ; কিন্তু কোথাও কোন সময়ে আপনাদের এমন কোন পাথরের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে যখন আপনারা সেই অভিজ্ঞতায় চেতনা লাভ করবেন।"

ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্লেপারেদি প্রক্ষোভকে ব্যবহারের প্রত্যাবৃত্তি (regression of conduct), এবং হাওয়ার্ড (Howard) এটিকে মানসিকতার সম্ভেদ (disruption) বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে অনুভূতিকে প্রক্ষোভের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন কিন্তু হাওয়ার্ডের মতে প্রক্ষোভ-চেতনার কেন্দ্রস্থলে সংবেদন বা অনুভূতির উপাদানাদি থাকে না। অবশ্য আমরা পরে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে পারব যেখানে তিনি বলেছেন—"বোধ হয়, আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্তর্দর্শনবাদীরা (introspectionists) যাকে অনুভূতি-স্বণ (affective tone) বলেন বা বলবার চেষ্টা করেন, তা বর্তমান।"

বিভিন্ন নীতির ওপর ভিত্তি করে অনুভূতিকে প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। ক্লেপারিদি বলেছেন—"আমাদের ব্যবহারে অনুভূতির উপযোগীতা আছে কিন্তু প্রক্ষোভের কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।" গুণ ও তীক্ষ্ণতা ছাড়াও অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে গভীরতার বিচারে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টাও হয়েছে। "একটি যাত্রী ভর্তি জাহাজ-ডুবির ঘটনার থেকেও যে একটা সূঁচ ফোটার ব্যথা আমার বেশী লাগে একথা ঠিক কিন্তু প্রথমটি অতি অবশ্যই আরও গভীর ব্যথা।" ম্যাক্‌ড্যুগাল (McDougall) -এর মতে বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতি একটি যৌগিক ক্রিয়া আর সেটা কেবল সুখ ও দুঃখের মধ্যেই আনাগোনা করে না। ব্যক্তি-মানসে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-শক্তি বিকাশের সাথে সাথে এই যৌগিকত্ব সৃষ্ট হয়। তবে যৌগিক অনুভূতিগুলিকে প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করেই বিচার করা উচিত। এইগুলি আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতার পরিমাপের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচেষ্টাদির পূর্বাপর কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। "অপরপক্ষে, বিবর্তনের মান-এ শুদ্ধ প্রক্ষোভ যৌগিক অনুভূতিগুলি অনেক আগেই প্রকটিত হয়েছে' বলে অনুমিত হয়।" হয়ত যৌগিক বা জটিল অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের পরে সৃষ্টি হয়েছে বলে, তাদের প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানো সম্ভব হয়েছে, —কিন্তু সরল অনুভূতিগুলি ? ম্যাক্‌ড্যুগাল বর্ণিত সরল প্রাথমিক অনুভূতির সঙ্গে প্রক্ষোভের বিষম-নির্ণায়কটির পরিচয় কি ?

কেউ কেউ অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় (passive) এবং প্রক্ষোভকে কোন পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ামূলক প্রতিন্যাস (attitude) হিসাবেও দেখিয়েছেন। টিচেনারের মতে এটি কতকগুলি প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু মধ্যবর্তী বহু ক্ষেত্রে এই সত্যতার যথার্থতা স্বীকৃত হয়নি।

অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য একটি পার্থক্যেরই আন্দাজ আমরা করতে পারি, তা হ'ল তাদের জটিলতার মাত্রার। অনুভূতি ও প্রক্ষোভ একই মানসিকতা থেকে জাত, কতকগুলি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূতি প্রক্ষোভের রূপ নেয় এবং একইভাবে প্রক্ষোভ অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

মনস্তত্ত্বের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সাধারণভাবে দেখান হয় যে মনোযোগ (attention) অনুভূতির বিলোপ করে আর প্রক্ষোভ চিন্তাশক্তির গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। প্রাত্যহিক প্রতীয়মান এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও কিছু গভীর অর্থ নিহিত আছে যা এ পর্যন্ত দেখাবার চেষ্টা হয়নি। চিন্তার দ্বারা প্রক্ষোভকে সীমিত করা বা প্রক্ষোভের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথাই মনে হয় যে, চেতনার মধ্যে এই দুই মানস-ক্রিয়ার অবস্থান একসাথে সম্ভব নয়। যদি আমরা ধরে নিই এগুলি একই শক্তির দুইটি রূপান্তর, তবেই একটির বিনিময়ে অপরটির বৃদ্ধি বা বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ এই ধরণের রূপান্তর নিজস্ব শক্তির মাত্রা ছাড়ায় না, অর্থাৎ একটি অপরটির সর্বশক্তি আত্মস্থ করে না যাতে কিনা অন্য কোন রূপান্তর আর সম্ভব হয় না। তবে অনেক চরম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, যেখানে উপরোক্ত ঘটনাগুলি, যেমন চিন্তা প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রিত করছে বা প্রক্ষোভ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে,—একথা মনে আসে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে, এ যাবৎকাল, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিচয়ে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি-বিকাশ সংক্রান্ত রূপান্তরকরণের বিষয়টির প্রতিই প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজ চালু আছে। এই রেওয়াজের বিভিন্ন দোষ সম্বন্ধে আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্বের গবেষনায় জানা গেছে এবং টেরী-র পুস্তকেও প্রক্ষোভ-শিক্ষার অভাবজনিত বিপদেরও নানা উল্লেখ আছে। শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় বা আদিবাসীরা সভ্য মানুষের তুলনায় বেশী আবেগ-প্রবণ—এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। এখানে আমার বক্তব্য হ'ল, জাতিজনিত (phylogenic) এবং প্রচয়জনিত (ontogenic) উদাহরণগুলির মাধ্যমে যে সত্যটির উদ্ঘাটন হয়েছে তা হোল অনুভূতি ও প্রক্ষোভ মানুষের আদিম মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির ভিতর থেকে বা এর বিনিময়ে অন্যান্য মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন ব্যক্তির, তিনি সাধারণ অসাধারণ বা বায়ুগ্রস্ত—যে ধরণেরই হোন না কেন, তাঁর চিন্তাধারা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়তি নিহিত রয়েছে, তিনি কিভাবে তাঁর

অনুভূতিগুলিকে চালনা করেছেন তার ওপর। টিচ্‌নার অনুভূতিকে অবচ্ছ সংবেদন (unclear sensation) হিসাবে দেখিয়েছেন ; এই সংজ্ঞাটি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ তাঁরা অভিরাগ ও প্রক্ষোভের অত্যাচারকে উত্তরণ (transcended) করতে সক্ষম হ'য়েছেন। অবশ্যই এই বক্তব্যের দ্বারা বিজ্ঞতার এই সংজ্ঞাকে আমি সমর্থন করি— এই ধারণা ঠিক নয় ; আমি যা' বলতে চাই তা হোল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার প্রক্ষোভ-যন্ত্রাদির বিনিময়েই গঠিত হয়েছে।

প্রক্ষোভ (perception)-এর কথাই ধরা যাক। এটা যে কেবল প্রকৃতিগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল—একথা জানার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। দেখা গেছে আতঙ্কিত অবস্থায় অন্ধকারে গাছের ঝোপকে ভালুক ব'লে মনে হ'তে। প্রত্যক্ষের এই ধরণের বিষয়গত পরিবর্ত্তনের জন্য কিন্তু সবসময়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রক্ষোভ উদ্দীপনের প্রয়োজন হয় না। মাত্রাতিরিক্ত তীব্র প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে যে ধরণের মানসিকতার সৃষ্টি হয়, সাধারণ অনুভূতির ক্ষেত্রে তাই ঘটে স্বমিত (normal proportion) মাত্রায় যেটা ক্রুগারের মতে 'অনুভূতির ন্যায় একটা কিছু অভিজ্ঞতা'। আমাদের দেশে এবং বিদেশেও সমসাময়িককালে ওজন-পরিমাপের ওপর বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ওজনের ধারণা ও ওজন-বিনিশ্চয়তার (difference beween weights) ক্ষেত্রে প্রতিন্যাস যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে তা' প্রমাণিত হ'য়েছে। সরল পরীক্ষা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষের অন্যান্য দিকেও বসু (Bose) এই ধরণের ঘটনাবলীর প্রমাণ দিয়েছেন (Bose, G. Is perception an illusion ? Indian Journal of Psychology, 1926, 1, 135)। হলিংওয়ার্থ (Hollingworth)-এর মতে প্রত্যক্ষের সৃষ্টি হয় কোন সূত্রের (clue) ব্যাখ্যা থেকে, আর তাই প্রত্যেক ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষেরও পরিবর্ত্তন আসে। আর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স, স্ত্রী-পুং ভেদ, শিক্ষা ও মেজাজের ওপর নির্ভর করে। এর অর্থ হোল ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, ব্যক্তিমানসে আদি অনুভূতি (original feelings)-গুলির গঠনপ্রক্রিয়া ও সেগুলির পরিবর্ত্তনের উপর।

অন্যান্য মানস-ক্রিয়া, যেমন স্মৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বিকল্প মনোবিদ্যা (differential psychology) এই ধরনের পার্থক্যগুলিকে যথার্থ পরিমাপের ভিত্তিতে মাত্রিক (quantitative) পরিচয়ে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছে। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বই কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য সৃষ্টিতে অনুভূতির অবদানকে প্রদর্শিত করেছে। প্রাত্যহিক মনোরোগবিদ্যা, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের বিস্মৃতি, কথা-বার্ত্তার ভুল ইত্যাদি দৈনন্দিন নানা ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করেছে। এই সূত্র ধরে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা যায় তবে তাঁর স্মৃতির স্বরূপকে

বোঝা সহজ হয়। অনুভূতি-সংক্রমণ এবং প্রসারণ (affective transfer and expansion) বর্ণনায় টিচেনার মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও চিন্তার মাঝে অনুভূতির প্রভাবের গুরুত্বকে স্বীকার করার মুখে এসেও, শেষ কথাটি বলা থেকে নিবৃত্ত হ'য়েছেন। তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞান-অভিজ্ঞতা তত্ত্বের সঙ্গে এই ধরণের বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'ত না। তাঁর এই নিবৃত্তি হয়ত অনেকের কাছে সুখবর হ'তে পারে, তবে আমি মনে করি, এটা সম্ভব হ'য়েছে তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনিময়ে। সমসাময়িক মনস্তত্ত্বের ইতিহাসে টিচেনার একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর অবদান আমেরিকার মধ্যেই কেবল আবদ্ধ থাকে নি। আমি অনেক সময়ে কল্পনা করেছি, যদি আজ তিনি তাঁর স্ব-নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু সরে এসে, একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে দেখ্‌বার চেষ্টা করতেন, তবে আজ তাত্ত্বিক-মনস্তত্ত্ব কতটা উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান পেত !

আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন মনস্তত্ত্বের নবমতাদর্শীরা টিচেনারের এত বিরোধীতা ক'রেছেন। চেষ্টিতবাদীদের সম্বন্ধে আমার এখন কিছু বলার নেই, কারণ যা বলবার তা আগেই বলেছি। গেষ্টাল্ট্ মতাদর্শীরা সবরকম মনোবিশ্লেষণের বিরোধীতা করেছেন এবং বিচলন-প্রত্যক্ষ (movement perception)-এর ক্ষেত্রে তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি টিচেনার-তত্ত্বের মৃত্যুদূত হয়ে এসেছে। এঁদের মতে বিচলন-প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত কিন্তু এটাও আমি বলতে চাই যে টিচেনার স্বয়ং এ সব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অপারগতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিছু অভিজ্ঞতার গঠনে মৌলিক উপাদানগুলি ছাড়াও আরও কিছু থাকে যাকে 'কর্টিকাল সেট' (Cortical set) নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপ হোল প্রতিন্যাস। ঠিক এই ভাবটিই গেষ্টাল্ট মতবাদীদের বিচারে প্রকট হয়ে উঠেছে যখন তাঁরা বলেছেন, সব লোকই 'ফাই-ফেনোমিনা' (Phi-phenomenon) দেখতে পান না।—এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষের ফাই-ফেনোমিনা দেখ্‌বার পূর্ব্বে বিচলন-প্রত্যক্ষণের প্রতি তাঁর সাধারণ প্রতিন্যাসের অবস্থিতি ওঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন। বিশ্লেষণ করা, প্রত্যেক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই, তা ভৌত-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান যা'ই হোক না কেন, একটি প্রধান কর্ত্তব্য এবং বস্তুনিরপেক্ষ-স্তর ((abstraction stage) পর্য্যন্ত এই বিশ্লেষণ ক'রে যেতে হবে। ইথার, ইলেক্ট্রন, আয়ন কিংবা পরমাণু—প্রত্যেকটিই প্রত্যয়িত বিচারে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ধারণা। সেইরকম ধারণাই করা হ'য়েছে সংবেদন ও অনুভূতিকে নিয়ে। ভৌতজগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, একটি অনবচ্ছেদক পরস্পর-সম্পর্কান্বিত পরিচয়ের প্রকাশ এবং সব অংশই পূর্ণ, অখণ্ড—একটি গেষ্টাল্ট্। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদন-প্রত্যয় বা বৈশ্লেষণিক পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে তো পড়েই নি বরং মনস্তাত্ত্বিক বিচারে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হবে।

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগ-চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

["চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের ধারা" শীর্ষক যন্ত্রস্থ পুস্তকের "মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্ত্তন" অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বহু সামাজিক কর্মীর প্রচারের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ক্রমশঃ অধিকভাবে উন্মাদাগারগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল। পাইনেল্ (Pinel) ফ্রান্সে এবং কনোলী ব্রিটেনে বন্দীদের আরও অধিকতর উদার ব্যবহার ও মুক্ত অবস্থায় চিকিৎসার উপর জোর দিতে লাগিলেন। টুকে প্রত্যেককে উপযুক্ত কাজে মন আবদ্ধ রাখিবার বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সর্ব দিকে আমুল পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অগ্রগতি সেই সময় হইতে এখনও-পর্যন্ত অব্যাহত-গতিতে চলিয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ ঔষধাদি ব্যবহারেও উন্নতি হইতে লাগিল। সামাজিক কর্মীগণ ক্রমশঃ আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের সহিত উহাদের পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাহাদের পরিবারে প্রত্যাবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিলেন (Rehabilitation) এবং সব সময় তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য এবং আরোগ্যোত্তর যত্নের জন্য বিবিধ সংস্থা ও আবাসের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের উপযুক্ত চাকুরীরও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর উন্মাদ-রোগীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রেরণাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ ক্রেপেলিন (kraepelin) বিভিন্ন প্রকার উন্মাদ-রোগের মধ্যে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থা ছিল, তাহা দূর করিলেন। একটি শ্রেণী বিভাগ প্রস্তুত হইল (classification) যাহা দ্বারা উন্মাদ-রোগীদের চিকিৎসার প্রভূত উপকার হইল।

এই উন্নতির অগ্রগতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ও শেষার্দ্ধের সহিত তুলনা করিলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ টমাস্ মনুরো (Thomas Monroe) রাজকীয় বেথেলহেম্ হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি উন্মাদাগার-অনুসন্ধান কমিটির সভ্যদের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেন, "চিকিৎসার সুবিধার জন্ত আমাকে বহু রোগীকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বহু বৎসর হইতেই তাহাদের ঐ অবস্থায় রাখা হইয়াছে। মে মাসের প্রথম ও শেষের দিকে প্রত্যেক রোগীর শরীর হইতে রক্ত নিঃস্বরণ করা হয়। তাহার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ তাহাদের "বমন-পদার্থ" খাইতে দেওয়া হয়; এবং তাহার পর আমরা রোগী-দের কয়েকবার জোলাপ দিয়া শরীরের ক্লেদ পদার্থ বাহির করিয়া ফেলি। এই ব্যবস্থা বহু বৎসর অবধি প্রচলিত আছে এবং আমার পিতামহের সময় হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। আমার মতে ইহাই উন্মাদদের প্রকৃত চিকিৎসা।" সমিতির সভ্যগণ দেখিতে পান রোগীদের একটি লম্বা লৌহদণ্ডের সহিত শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অতি কষ্টে উহারা দাঁড়াইতে ও বসিতে পারে।

মানসিক রোগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। স্নায়ু-প্রবণতা বা স্নায়বিক-বিকার অথবা মনোবিদ্যার পরিভাষা অনুযায়ী উন্মায়ু (Neurosis) মানুষের অনুভূতি, প্রেরণা ও বুদ্ধির বিকারমাত্র। ইহা কেবলমাত্র সব মানুষই যাহা অনুভব করে অথবা প্রকাশ করে তাহারাই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ। কিন্তু বাতুলতা (Psychosis) (কাল্পনিক বিকার) মানবের স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ নয়। উহা অবাস্তব-কল্পনার বিকারমাত্র। উহা কল্পনার জগৎ।

এই বিকারগ্রস্ত রোগীদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে মানব-মনের অভ্যন্তরে আর একটি সীমাহীন কল্পনাতীত বিস্তৃত জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আমরা আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োগ-পদ্ধতির ধরণ বুঝিতে পারিব। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের রোগের প্রকাশ—বাতুলের সাধারণ পক্ষাঘাত রোগ (General Paralysis of the insane)। এই রোগের সাধারণ লক্ষণ, রোগীর অস্মিতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন, স্মরণ-শক্তির হানি, ক্রমশঃ দুর্বলতা বৃদ্ধি, বাক্যের বিচ্যুতি, বিবিধ রকম স্নায়বিক বৈকল্য ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত; অব-শেষে অচিকিৎসিত অবস্থায় থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই এই রোগ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে ১৮২২ হইতে ১৮২৬ এর মধ্যে বেইল (Bayle) এবং ক্যালমিল্ (calmeil)

দেখাইলেন যে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশের ঝিল্লি ও স্নায়ু-পদার্থের সাধারণ প্রদাহজাত ক্ষত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার পর হইতে পরিসংখ্যান ও আনুষঙ্গিক নানা সাক্ষ্য হইতে ক্রমশঃ ইহার বিষয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল যে পুরাতন উপদংশ রোগ হইতেই ইহার উৎপত্তি। অবশেষে হাইদেও নগুচি (Hideyo Noguchi—1876-1928) এবং জোসেফ্ ওয়াল্ডন্ মুর (Joyeph Waldron Moore—1879) ঘোষণা করিলেন যে তাঁহারা ৭০টি সাধারণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ উন্মাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া ১৪ টির মধ্যে উপদংশ বীজাণু পাইয়াছেন। এইরূপে প্রমাণ হইল যে সাধারণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ উন্মাদ-রোগ মস্তিষ্কের একটি অংশের পীড়া হইতে উৎপন্ন। এইরূপে অতিরিক্ত মদ্য, আফিম, গাঁজা প্রভৃতি সেবনের পর মস্তিষ্কের প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মস্তিষ্ক হইতে একই প্রকারের উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়। আবার বার্দ্ধক্যজনিত উন্মাদ-রোগ রক্ত-সঞ্চালনের অভাবে মস্তিষ্কের অবক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে 'আব' (Tumour) হইলে অথবা রক্ত-মোক্ষণ হইলে (Hemorrhage) তাহা হইতে উৎপন্ন চাপে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালনে ব্যাঘাত হয়—তাহাতেও মস্তিষ্কের প্রদাহ হয় ও ক্ষমতা লোপ পায়।

এইরূপ স্নায়ু-প্রধান ও কল্পনা-প্রধান বিকারের পৃথকীকরণের ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করিয়া ফ্রঞ্জ য্যাণ্টন্ মেস্মার (১৭৩৪—১৮১৫) নামক একজন অষ্ট্রিয়ানিবাসী হাতুড়ে চিকিৎসক বহু অর্থ ও যশ অর্জ্জন করেন। ডাক্তারীতে স্নাতক পরীক্ষার সময় তাঁহার বিশেষ রচনা "গ্রহ নক্ষত্রাদির মানবের উপর প্রতিক্রিয়া" বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই প্রতিক্রিয়া একটি চুম্বকের দ্বারা রোগীর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার পর তাঁহার মনে ধারণা হইল যে মানুষের হাতের দ্বারাও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া অথবা শক্তি কার্য্যকর করা যাইতে পারে। তিনি ইহাকে 'জৈবিক শক্তি' আখ্যা দিয়াছিলেন। ভাগ্য তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন ছিল। এক অষ্ট্রিয় রাজ পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ ভদ্রমহিলার সম্ভবতঃ হিষ্টিরিয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে মেস্মার সুকৌশলে আরোগ্য করিবার পর তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য ক্রমশঃ দীপ্তিমান হইতে লাগিল। তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আমন্ত্রিত হইলেন এবং সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে তিনি দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাঁহার শক্তি রোগীর শরীরে সঞ্চালন করিত পারেন। তাহার পর তিনি এক বৈঠকে সমবেত সকলের উপর একসঙ্গে ঐ কাল্পনিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া মনোমত ফল লাভ করেন। তিনি ভোজবাজীকরদের মতন নানা সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কার করেন। একটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, তিনি একটি পাত্রের চতুষ্পার্শ্বে দর্পণ স্থাপন করেন ও লৌহশলাকা দ্বারা শক্তি সঞ্চালন করিতে পারেন এইরূপ পরিকল্পনা

করিয়া ঐ যন্ত্রটি একটি টেবিলে স্থাপন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে রোগীদের বসান ও তাহাদের একে অপরের হাত ধরিতে বলেন। ইহাকে 'মেসমারের ব্যাকেট' (Mesmer's Baquet) বলা হইত। মেস্মারের নাম দিক্-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন প্যারিসে সমস্ত চিকিৎসকমণ্ডলীতে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অবশেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসক সভা (Academy) তাঁহার সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। তাঁহাদের রিপোর্টে তাঁহারা জানাইলেন যে,—"জান্তব চৌম্বকশক্তির" কোন অস্তিত্ব নাই। যে অভাবনীয় শক্তির ক্রিয়া মেস্মার তাঁহার বৈঠকে প্রয়োগ করেন তাহা রোগীদের কল্পনার ক্রিয়া মাত্র। অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের সময় মেস্মার ফরাসী দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু তিনি পরে বহুবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ও শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ যাহাই বলুক না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মেস্মারের লোককে আকর্ষণ করিবার অসীম শক্তি ছিল এবং তিনি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানসিক-দুর্বল রোগীর উপর নিজের কল্পনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছামত, ঘুমন্ত অবস্থায় রোগীরা কাজ সম্পন্ন করিত। তাহার পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার জাকুইস ফ্রান্কইস বারট্রাণ্ড (১৭৯৫-১৮৩১) প্রথমে এই "হিপ্‌নটিক" অবস্থা দর্শন করেন এবং কল্পনার নিয়মসূত্রে ইহার সুচারু ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে নানা দেশে এই বশীভূত অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ হিষ্টিরিয়া রোগীদের রোগ উপশমে ইহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মেস্মেরিজম্ অবশেষে হিপনটিজম্ নামে পরিচিত হইল। বিখ্যাত চিকিৎসক সার্কো (Charcot) হিষ্টিরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে হিপনটিজ্‌ম্ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

তরুণ চন্দ্র সিংহ *

অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবার কথাটা কবে হইতে প্রচলিত আছে জানা নাই। কথাটা যে কত বড় সত্য তাহা আজিকার দিনের মানুষকে আর বুঝাইয়া বলিয়া দিতে হইবে না—আমাদের দেশের অভাব তো চারিদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বলিতে যাইতেছিলাম বর্ষার মেঘের মত আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখনই মনে হইল বর্ষার ঘনঘটা যতই হউক এক পসলা বর্ষণের পরে, ঝড়ের-ঝাপটায় কিছু তছনছ হইয়া আবার মেঘ পাতলা হইয়া যায়—আলো দেখা দেয়। আর তাহার মেয়াদ খুব বেশী হইলেও দুই-তিন দিনের বেশী নয়, এমন কি বর্ষাকালটাই দুই মাসে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু দেশের দুরবস্থার হিসাব করিতে হইলে তিরিশ দিনের বদলে কত বৎসরে মাস গণনা করিতে হইবে তাহা হিসাব করিতে পারা যাইতেছে না। সুতরাং বর্ষার মেঘের মত অভাব আমাদের জীবনের সর্বদিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে এ কথা আর বলিতে পারিলাম না। অভাব যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তালিকা রচনা করাও সম্ভব নহে। সকলেরই জানা আছে এই পরিস্থিতির সুবিধা সুযোগ লইয়া বেশ কিছু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের লোভের পরিপূরণ করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনের জল-নুন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সহিত স্বার্থান্বেষী লোভাতুর বিদেশী শক্তিরও অদৃশ্য বা অলক্ষ্য কারসাজির কথাও শোনা যায়। ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই! স্বার্থ যখন প্রবল রূপ ধারণ করে তখন তাহা দেশী-বিদেশী যাহাই হউক, কোনও ন্যায়-নীতিকে আদর্শকে পদদলিত করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। দশ হাতে দশ দিক হইতে তাহারা নিজেদের স্বার্থে তাণ্ডব সুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশের অবস্থার দিকে তাকাইলে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ আর তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না।

এই পরিণতির মূলে অন্যান্য যে কোনও কারণই দেখানো হউক না কেন, আমাদের জীবনের আদর্শভ্রষ্ট হওয়াতেই এই দ্বিধাহীন উলঙ্গ ব্যক্তি-স্বার্থের এমন উৎকট বিকৃত রূপ সমাজ-জীবনের চারিদিকে, তথা দেশের সর্বত্র ফাটিয়া পড়া সম্ভব হইয়াছে।

---

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

এই আদর্শহীনতার কথা আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র যে শক্তিহীন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে বহুবার। প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করিতেও এই সত্য সকলেই অনুভব করিতেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। রাজ্য পরিচালক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেদের দলের স্বার্থে—নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি ও রাজ্যাসন অধিকার করিবার লোভে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-সুবিধার কথা প্রায় অস্বীকার করিয়া, তাহাদের আদিম আক্রম-বৃত্তিকে উস্কাইয়া দিয়া দেশের শান্তি ও নিরাপত্তাকে লইয়া যথেচ্ছ ছিনিমিনি খেলিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করে না। পরিবারের দুঃসময়ে ভাই-ভাইয়ে মিলিয়া-মিশিয়া দুর্দশা দূর করিবার বা তাহা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়াইয়া তুলিয়া ভাঙ্গনের পথ, ক্ষতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আমাদের রাজনীতিকদের সেই স্বার্থের দ্বন্দ্বে পড়িয়া সাধারণ মানুষের জীবন অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই ভাঙ্গনের স্রোত, সর্বনাশা বিপর্যয়ের গতিরোধ করিবে কে? তেমন কোনও শক্তিমান দৃশ্যপটে আজও দেখা যাই-তেছে না। দুর্বল যখন শক্তিমানের খেলা দেখাইতে যায় তখন তাহার বিকৃতি আরও প্রকট হইয়া দেখা দেয়। দেশের সমাজ-জীবনের সর্ব দিকেই এই বিকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোগ্যের হাতে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িলে তাহা অবস্থার দুঃসহতাকেই বাড়াইয়া তোলে। এই তো গেল তথাকথিত উপরওয়ালাদের অবস্থার কথা।

আমাদের মত দেশের সাধারণ মানুষ, যাহারা সাতে-পাঁচে ঘা খাইয়া, মোটামুটি সুখে-শান্তিতে, থাকিয়া দুই বেলা খাইয়া, সাধারণ পরিধেয় ও আশ্রয়ের নিরাপত্তাটুকু পাইয়া জীবন কাটাইতে চাই, যাহার যতটুকু সাধ্য সেই অনুসারে সমাজকে, দশজনকে কিছু দিয়া জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, তাহাদের জীবনে যখন সবদিক হইতে নানা সমস্যা আসিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে—জীবনের সাধারণ সামান্য আশা-ভরসাগুলিও লোপ করিয়া দিতে থাকে তখন সাধারণ মানুষ, আদর্শহীন সমাজ-অবস্থায়, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তির দিকে সহজেই চালিত হয়। 'এই অবস্থায় নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে হয় সমস্যায় জর্জরিত হইয়া, উদ্ধারের পথ না পাইয়া, দলিত-পীড়িত হইয়া ক্লিষ্ট জীবনের দিকে ঢলিয়া পড়ে, না হয় সমস্যার সহিত তাল রাখিয়া অবস্থা বুঝিয়া অদূর ভবিষ্যতে দুর্দিন কাটিয়া যাইবার আশায় জীবন-যাপন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। আর এক শ্রেণীর মানুষ সমস্যায় অধীর হইয়া নিজেদের আদিম আক্রমবৃত্তিকে মূলধন করিয়া ভাঙ্গনের পথে তাণ্ডব সুরু করিয়া দেয় :—এই তৃতীয় শ্রেণীর জনসাধারণকেই বিশেষ রাজনীতিবাদীরা দামামা বাজাইয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তোলেন। তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেশে অশান্ত ও অনিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের দলগত স্বার্থ-পুরণের

জন্য অরাজকতার সাহায্য করিতে থাকেন। মুখে যতই বড় বড় জনহিতকর বুলি আওড়াইয়া, আদর্শের নামাবলি গায়ে জড়াইয়া, কীর্তন করুন না কেন, একবার সিংহাসনে বসিতে পারিলে আবার ইহারাই যে তাণ্ডবীদের মাথা হাতে কাটিতে এতটুকুও দ্বিধা করিবেন না। এজন্য শক্তি চাই—ভাঙনের স্রোতের সহিত যদি গঠনের, সৃজনের পলিমাটি না থাকে তবে সে অন্ধ আক্রমবৃত্তি নিজেকেই ধ্বংস করিয়া বিনষ্ট হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত চরিত্রের মানুষদের লইয়া সমস্যা জর্জরিত সমাজে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের করাল ছায়া ক্রমে ঘনতর কঠিন রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বহু যুগের বহু চেষ্টায় যে আদিম আক্রমবৃত্তিকে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া বশ মানাইয়া জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিস্থাপন করিবার, সভ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার, অনলস চেষ্টা করিয়া আসিতেছে সেই চেষ্টা বারে বারে বিঘ্নিত হইয়াছে;—অন্ততঃ খণ্ডিতভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। মহাভারতের মহাকাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণের মত মহাশক্তিমানকেও মহাকালের স্রোতের নিকট হার মানিতে হইয়াছে। কালের গতি অপ্রতিরোধ্য এই কথা যদি মানিয়া লইতেও হয় তবু এই কথাও তো অস্বীকার করা যাইবে না যে মহাকাল যত প্রবলই হউন, রুদ্র যতই প্রখর হউন না কেন তবুও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিশেষ করিয়া মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে এই তিনটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, শক্তিই আমাদের প্রত্যেকের মনেই আছে। কাহারও মধ্যে কোনওটার প্রভাব বা ক্রিয়া অন্য দুইটি অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। এই তিন শক্তির সমন্বয় নষ্ট হইলে ব্যক্তি-মানসে যেমন বিকার দেখা দেয় সমাজ-জীবনেও যদি এই ত্রি-শক্তির সুস্থ সমন্বয় ব্যাহত হয় তবে সমাজ-জীবনও বিঘ্নিত হয়। মানুষের আক্রম-বৃত্তির এক বিকাশ হয় ধ্বংসে। মানুষ যখন আক্রোশের বশে ধ্বংসে মাতে তখন তাহাকে বিকার বলা চলে। আমাদের সমাজ-জীবনে সেই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা এই বিকারের স্রোতে গা-ভাসাইয়া দেন নাই, তাঁহারা ইহাকে রোগ-লক্ষণ জানিয়া নিজেদের সুস্থতা বজায় রাখিতে ও বিচার-বিবেচনা করিয়া অবস্থানুসারে বিকারগ্রস্তদের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট না হইলে এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লব সমাজকে গ্রাস করিবে। এই পরিণাম হইতে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে ও দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের উপরেই ন্যস্ত আছে। আমরা কে কতটা সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া সেই অনুসারে নিজ নিজ জীবন চালিত করিব তাহার উপরই আমাদের জনসাধারণের তথা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। সমস্যা যখন ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও আমরা সেই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কি ভাবে তাহার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইব তাহা আজও যেন ভাবিয়া ঠিক করিয়া

চলিবার মত সজাগ হইয়া উঠিতে পারি নাই। এই খণ্ড প্রলয়ের কালগ্রাসে পড়িয়া অহেতুক ধ্বংস হইবার পূর্বে আমরা কি জাগিয়া উঠিব না! আমরা কি পঙ্গুর মতই স্বার্থপরদের লোভের মৃতকল্প ক্রীড়ণক হইয়া মরিব! ধ্বংসের শক্তিকে সৃজনের শুভ-শক্তিদ্বারা বশীভূত করিবার, জীবনের মর্যাদাকে ধ্বংসের উর্দ্ধে স্থাপন করিবার আবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জ্ঞানী-গুণী, কর্মী ও বিশেষ করিয়া যুব-সমাজকে আরও গভীরভাবে ভাবিয়া জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় বর্তমান সমস্তাগুলিকে তুলিয়া ধরিয়া বিচার করিয়া নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করিতে ও সেই নির্দ্ধারিত কর্মে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাই। আর দেরী করিবার সময় নাই। যোগ্য শুভ কর্ম চাই। মানুষের বিধ্বংসী দানব-প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না! ইহা জীবনের, ইতিহাসের পরাজয়। বিনাশের উপরে জীবনের আসন স্থাপন করিতে হইবে, ধ্বংসের উপরে সৃজনের।

জীবনাদর্শ বিহীন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানে দ্বন্দ্ব বৈপরিত্যপূর্ণ সমস্তা-জর্জরিত জীবনযাত্রা আর সুষ্টুভাবে নির্বাহ করিতে পারিতেছে না। আমাদের মধ্যে যাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা কিছু যদিও বা থাকিয়া থাকে তথাপি ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। অনেকেই তাই গতানুগতিক ধারার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলি। অসুবিধায় পড়িলে বিরক্ত হই, রাগ করি, সরকার হইতে সুরু করিয়া আশে-পাশে যাহাকে পাই তাহার উপর দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজের আবেগ কিছু পরিমাণে শান্ত করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে কথা অনেক হইতে পারে, তর্ক চলিতে পারে, সময়ও বহিয়া যায়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। ফলে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া এত উষ্মা প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল সেগুলি তেমনই থাকিয়া যায় প্রতিকারের জন্য চেষ্টা টুকুও করা হয় না। অপরের উপর দোষ চাপাইয়া নিজের মনের ভার লাঘব করা যদিও বা কিছুটুকু সম্ভব হয় অবস্থার পরিবর্তন কিছুই তাহাতে হয় না। নিজের আয়ত্বের মধ্যে যতটুকু ভাল করিবার থাকে সেটুকুর জন্যও আমরা চেষ্টা করি না। অসুবিধা তাই কাঁটার মত সর্বদাই মনে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে। সময় যত যায়—ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অসঙ্গত অবাধ আক্রোশে বা বিবাদে। কেহ কেহ ভাগ্যের উপর দোষ চাপাইয়া তিক্ত মনে দিন কাটাইতে থাকেন। ইহাদেরও মেজাজ ভাল থাকে না। সব মিলিয়া মনে সকল সময় এমন একটা অশান্তিকর অবস্থা চলিতে থাকে যাহার ফলে সামান্য কারণে এমন কি অন্যান্য কাল্পনিক কারণে-অকারণে যখন-তখন বিবাদ বাধিয়া যায়। ট্রাম বাস বা পথে, দোকানে, হাটে রোজই ইহার অতি সহজ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাতেই, কিছু কথা কাটাকাটিতেই, যদি গোলমাল মিটিয়া যাইত, তবেও না হয় বোঝা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সেই ঝাঁঝালো মনের জের প্রাত্যহিক জীবনে নানা পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে তাহা পাড়াগত, দলগত,

এমন কি তথাকথিত রাজনীতির পাকে-চক্রে পড়িয়া সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। অনেক সময় ইহা মারামারি, খুন-জখমে পরিণত হয়। এই আক্রম-বৃত্তির হিংসাত্মক পথে একবার চলা সুরু হইলে তাহার গতি রোধ করা কঠিন হয়। এক দুইকে টানে, দুই চারকে জড়ায়। এই করিয়া সমস্যা ক্রমে ঘোরালো হইয়া প্রতিশোধের মারামারি খুনোখুনি চলিতে থাকে। ইহার কুটিল কবল হইতে দলের লোকেরাই আর তখন সহজে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে না। এই কালচক্র সমাজ-জীবনকে নষ্ট করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। ইহার কালোছায়ার কবল হইতে সাধারণ মানুষ নিজেকে বাঁচাইয়া সহজ শান্ত সৃজনশীল জীবন-যাপন করিতে পারে না। সমাজের পক্ষে ইহা দুর্দিন। আমাদের সমাজ-জীবনে এই দুর্দিনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। ইহাকে রোধ করিতে না পারিলে যে বিধ্বংসী বিপ্লবের নামে বাধাহীন অরাজকতা দেখা দিবে তাহা ভয়াবহ রূপ অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন না। আমরা উট পাখীর মত বালুতে বা নিজের পালকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পারিপার্শ্বিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম মনে করিতে পারি সত্য, কিন্তু তাহাতে যেমন স্বার্থ রক্ষা হয় না তেমনই আত্মরক্ষাও হয় না। নিজেদের চোখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিপদকে আরও কাছে ডাকিয়া আনা হয়। ইহার ফল যে কখনই শুভ হইতে পারে না তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। তবুও আমরা সাধারণ-ভাবে এই পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। আমাদের মানসিক জড়তা এত বেশী যে সময় মত সক্রিয় হইয়া সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সমস্যাকে যেন আমন্ত্রণ করিয়া নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে দিয়া তাহার চাপে পীড়িত হই, নিষ্পেষিত হই। অনেকের এ সম্বন্ধে অন্ধতার ওপরেও অহংকারের বোঝা আসিয়া যোগ দেয়। কিছু না করিয়াও যেন কত কিছু করিতেছি এমন একটা আত্মপ্রবঞ্চনার পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পথ চলেন। এই করিয়াই আমরা ডুবিতেছি। প্রতিকারহীন সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়া নাভিশ্বাস টানিতেছি।

সমস্যার কোনও প্রতিকার কিছুই নাই, এমন কোনও সমস্যাই নাই। মানুষের নিজের সৃষ্ট সমস্যার পরিমানই বেশী। তাহার প্রতিকারের পথও মানুষের হাতেই আছে। তাহা ছাড়া আর যেসব প্রাকৃতিক সমস্যা সময় সময় দেখা দেয় তাহারও অনেকগুলির সমাধান আমরা কম-বেশী করিতে পারি। মানুষ চেষ্টা করিয়াই ক্রমে প্রকৃতির অনেক তথ্য জানিয়া তাহাকে অন্ততঃ আংশিকভাবে জয় করিতে পারিয়াছে। চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে আরও বেশী করিয়া এই প্রাকৃতিক সমস্যাগুলিকে আয়ত্বে আনা যায়।

ইহা তো হইল বড় বিষয়ের বড় কথা যাহা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চেষ্টার কিছুটা বাহিরে। কিন্তু আমরা নিজেদের ছোট-খাটো বিষয়ের যে সব সমস্যা প্রত্যহ ভোগ

করিতেছি, আমরা নিজেরা তৎপর হইলে, তাহার অনেকখানি আমরা নিজেরাই সমাধান করিতে পারি। এ'জন্য সরকারকে প্রথমেই টানিয়া আনার দরকার হয়না। আমরা কয়েকজন একত্র হইয়া একটু বিচার-বিবেচনা করিয়া আমাদের বহু সমস্যার সমাধানের পন্থা ঠিক করিতে পারি। কিন্তু আমরা তাহা করি না। নিজেরা মনে মনে বিরক্ত বোধ করি। কাহারও সহিত দেখা হইলে দুই কথায় তাহা প্রকাশ করি। তারপরে আর কিছু করি না। ভাবখানা এই যে আমরা কিছু করিব না কিন্তু আমাদের সব সমস্যা দুর হইয়া যাক। তাহা না হইলেই ইহাকে-তাহাকে হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই ভাগ্য হইতে ভগবান পর্যন্ত সকলকে দোষ দিয়া থাকি। এই দূষিত পাকচক্রে আমরা ঘুরিয়া মরিতেছি। ইহা হইতে উদ্ধারের পথ পাই না একথা বলা চলে না। প্রকৃত কথা এই যে আমরা সেই উদ্ধারের পথের সন্ধানই করি না। সকল সময় পরনির্ভরশীল হইয়া চলিবার শৈশব মানস-বৃত্তি আজও আমাদের কাটে নাই। আমরা আজও অনেকাংশে শিশুই রহিয়া গিয়াছি। আমাদের বড় বড় কথার বোলচালও শিশুর রাজা-উজির মারা বা অনায়াসে চাঁদ লইয়া খেলা করিবার মতই মানসিকতার পরিচায়ক।

বড় হইতে হইলে কেবল দেহের আয়তন বাড়িলেই চলে না। সেই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিক বোধেরও প্রবর্তন হওয়া দরকার। এই জন্য প্রথম হইতেই আমাদের সম্মুখে কোনও আদর্শ স্থির থাকা দরকার। এই আদর্শ ঠিক না থাকিলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা ও তাহাতে নির্দিষ্ট গতির নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। হালভাঙ্গা নৌকার মত যেমন-তেমন স্রোতে বা ঝড-ঝাপটায় বিধ্বস্ত হইতেছি। আদর্শ স্থির না থাকিলে চলিবার দিক ও পথ কোথা হইতে কি দিয়া ঠিক করা হইবে?

ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে এমন কি রাষ্ট্র-জীবনেও আজও আমরা কোনও আদর্শ স্থির করিতে পারি নাই। আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা এইখানেই। ফলে যাহার যেমন ইচ্ছা চলিতেছে। আজ এই নীতি, কাল অন্য নীতি। এখানে এই নীতি, অন্যখানে অন্য নীতি। অর্থাৎ যেখানে যেমন যাহার সুবিধা সেই অনুসারে সে অবাধে চলিতেছে। কোথাও যদি সামান্য নিন্দার কথা ওঠে তাহা এতই ক্ষীণ যে নিজেদের বাহবার ডামাডোলে তাহা কানে পৌঁছাইতে পারে না। তা ছাড়া সমাজ শক্তি বলিয়া কিছু আর নাই বলিলেই চলে। যদিই বা কিছু থাকিয়া থাকে তাহার ক্রিয়াশক্তি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল। ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র চালনায় সেও পঙ্গু। সুতরাং দেশের নানা স্তরের মানুষের আদিম-বৃত্তির প্রকাশ সর্বক্ষেত্রে প্রকট হইয়া তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়াছে। এই ক্লিষ্ট, রুগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য কেবলমাত্র সেই দুর্বল রুগ্ন রাষ্ট্রশক্তির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ছোট হউক বড় হউক কয়েকজন মিলিত

হইয়া নিজেদের মধ্যে বিষয় আলোচনা করিয়া সমস্তার বাস্তব সমাধানের সাধ্যমত উপায় স্থির করিয়া কাজে নামিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর পথ নাই। নিজের বাড়ীর সংগঠন ও পরিচ্ছন্নতা, পাড়ার রাস্তা পরিষ্কার রাখা, দোকানের বাজারের অন্যান্য দ্রব্যমূল্য রোধ করা ইত্যাদি বহু কাজ আমরা নিজেরাই করিতে পারি। আমাদের সময়ের অভাব—এই কথা আদৌ সত্য নহে। এই যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। বলা উচিত আমরা মনের দিক হইতে অপরিণত শিশুর মত, অথবা নিজের জড়তায় পঙ্গু। প্রত্যেক পাড়ায় অন্ততঃ দুই চারিজন এখনও আছেন যাঁহারা সচেষ্ট হইয়া কিছু করিবার মানসিক শক্তি রাখেন। সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই প্রতি পাড়ায় সক্রিয় হইয়া কাজে নামিতে হইবে। অহংকারের বশে নহে, নিজের ও অপর দশজনের শুভ কামনায় এই কাজে ব্রতী হইতে হইবে। আর্থিক বা সম্মান লাভ বা প্রশংসার জন্য নহে, নেহাতই একটু ভালভাবে বাঁচিবার আশায়। একদিনই কিছু গড়িয়া উঠে না। তাই এই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। যখন যতটুকু সুফল পাওয়া যায় তাহাই লাভ। একবার কাজ চলিতে সুরু হইলে তাহা বরফের বলের মত ক্রমেই আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এই শক্তিকে ক্ষুদ্র মনে করা ভুল। মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও শক্তি কম নহে, উপেক্ষণীয় তো একেবারেই নহে। আর সময় নষ্ট না করিয়া যে যেখানে আছেন, দুই চারিজন হইলেও, মিলিত হইয়া কাজে নামিয়া পড়ুন। ইহাকে সমাজ-সেবা বলিয়া বড় নাম দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বাঁচিবার প্রয়োজনেই ইহা দরকার বুঝিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ুন; বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট আমাদের এই আবেদন রাখিলাম।

ছাপাখানার কাজে দেরী হওয়ায় এই সংখ্যা প্রকাশনে বিলম্ব হইয়াছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।
- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।
- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন।
- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।
- লেখকদের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, লেখকের অনুরোধ-সাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্ প্রিণ্টও দেওয়া হয়।
- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
১৪, পাসিবাগান লেন
কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

ষোড়শ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন * ১৩৮১

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক, বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। নির্বিশেষে তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি অনুসৃত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হইবে না।

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Maharaja Printing Works, 6/1, Cornfield Road, Calcutta-19.

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

স্থাপিত—১৯২২

'চিত্তের' সম্পাদক-পর্ষদ

বিদ্যালয়ে জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী ও মনোবিজ্ঞান

অমরেন্দ্র নাথ বসু *

বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যতালিকায় বিভিন্ন নতুন বিষয়ের সংযোজন হয়েছে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যাতে ছেলে-মেয়েরা একটি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, এই পাঠ্যতালিকায় এই প্রয়াসই প্রতীয়মান। এই সকল উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই জীবন-বিজ্ঞান (Life Science) নামক বিষয়টিকে এই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জীবন-বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচীতে মানুষ এবং তার পরিবারের প্রাণী জগতের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এদের শারীরিক গঠন, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণ, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায় পাঠ্যসূচীতে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই পাঠ্যসূচী বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রাণী জগতকে যেন একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হয়েছে। প্রাণী দেহ যেন একটা ভাবহীন যন্ত্রবিশেষ। একটা যে কোন জটিল ইঞ্জিনের সাথে যেন তার বিশেষ তফাৎ নেই। প্রাণীর যে একটা চিত্তবৃত্তির দিক রয়েছে, একটা মনের জগৎ রয়েছে, এই সত্যটি যেন অগোচর রয়ে গেছে। দেহযন্ত্র ও মনের মিলিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রাণের স্পন্দন অনুভূত—এ সত্যটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিষয়গত (objective) ভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রাণী জগতের বিভিন্ন স্তরে যেমন দেহ-যন্ত্রের বিকাশের তারতম্য রয়েছে, তেমনি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারতম্য রয়েছে মানসিকতার বিকাশের।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য তালিকা পুস্তকে (Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary

---

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

Education [Classes VI—X], From 1974, Vol. 1) জীবন বিজ্ঞান পঠনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, "To give pupils an intelligent and appreciative insight into the working of the life force in nature's kingdom." (P. 65) কিন্তু এই জীবনবেগ তো কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মনের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও এই জীবনশক্তির অভিব্যক্তি বিদ্যমান। কাজেই এই নতুন পাঠ্যতালিকায় জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার কোনও উল্লেখ না থাকা ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচীর পরিচায়ক। এই ত্রুটি অপনয়নের জন্যই জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় অতি সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত পুস্তকে প্রাণীর সংবেদনশীলতার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিষয়টি এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে মনে হয় যে সংবেদনশীলতা কেবলমাত্র উদ্দীপনা (stimulus) এবং প্রতিবেদন বা সাড়া (response) প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ stimulus→response বা S→R formula) ; এই সংবেদনশীলতায় প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের যেন কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রাণী সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান আহরণ করতে হলে, অর্থাৎ সমগ্র প্রাণীটিকে জানতে গেলে, তার মানসিক প্রক্রিয়াসমূহকে বাদ দিয়ে তাকে জানা সম্ভব নয়। মানুষ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের দৈহিক প্রক্রিয়া, তার আচার-আচরণ, তার প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে গেলে তার মনন ক্রিয়া এবং মানস প্রক্রিয়াসমূহকে বাদ দেওয়া চলে না। মানুষের আচর-আচরণ কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিবেদন সূত্র (S→R) দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক উদ্দীপনার অনুপস্থিতিতেও মানুষের দেহ-যন্ত্র নানাভাবে আচরণ করে থাকে। বাহ্যিক উদ্দীপনার অভাবে দেহযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না। তার অভ্যন্তরে মনন বা চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, অন্তর্নিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াসমূহ চলতেই থাকে। এছাড়াও চলতে থাকে নানা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উত্থান-পতন এবং ভালবাসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ (emotion) সমূহের বৈচিত্র্যময় লীলা। এমন কি যে কোন দৈহিক প্রক্রিয়াও উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সূত্র ধরে প্রায়শঃই দেখা দেয় না। যেমন দৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ ধরা যাক। বহুদিন পরে কোন একজনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন দৃষ্টিপথে আবির্ভূত। কিন্তু সেই মুহূর্তে হাজার উদ্দীপক তার দেহযন্ত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রতিবেদনের জন্য আবেদন পাঠাচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেহযন্ত্রটি তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তার প্রতিবেদনকে কেবলমাত্র

একটি পথেই ধাবিত করে। সে তখন নয়ন ভরে তার প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাগত' কবিতায় নায়িকা দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর যখন তার কুঞ্জগৃহদ্বারে তার প্রিয়জনকে উপস্থিত দেখতে পেল, তখন সে কি কেবল তার দর্শন ইন্দ্রিয় দিয়ে একটি মানুষকে দেখেছিল? তার আচরণ কি কেবল দৃষ্টি-উদ্দীপনা ও প্রতিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তা মোটেই নয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অঙ্কিত এই কবিতার চিত্ররূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে ঐ মুহূর্তে নায়িকার আচরণের মধ্যে কত রাগ-অনুরাগের, কত বেদনার কত সংযত প্রতিক্ষার স্মৃতি বিধৃত। এই মুহূর্তটি কত আবেগের রঙে রঙীন। তাইতো নায়িকা বলছে,—

> "হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা,—মোর মনে নাই ক্ষোভ-লেশ,
> নাই অভিমান-তাপ। করিব না ভৎ'সনা তোমায়,
> গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
> আমি আজি নবতর বধূ; আজি শুভদৃষ্টি তব
> বিরহ গুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
> অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
> প্রভাতে নক্ষত্রময় শুভ্রতায় লভে অবসান।" ইত্যাদি।

এ কি কেবলই দৃষ্টি উদ্দীপনার প্রতিবেদন? কত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনুভূতি কত, ভাব, কত আবেগ, কত স্মৃতি সংগঠিত হয়ে এই প্রতিবেদনের সৃষ্টি। ঐ মুহূর্তে নায়িকার সকল সত্ত্বা, সমগ্র শরীর-যন্ত্র এই প্রতিবেদনের অভিব্যক্তিতে নিয়োজিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের (এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরও) সংবেদনশীলতা কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিবেদন (S→R) সূত্রের উপর নির্ভর করে না। প্রতিবেদনের জন্য উদ্দীপকগুলিকে প্রয়োজন মত সংগঠিত (organise) করার ব্যবস্থাও তার মধ্যে রয়েছে। এই সংগঠন ব্যবস্থা ছাড়া প্রাণীর পক্ষে কোন প্রতিবেদন সম্ভব নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই সংগঠন ব্যবস্থা অধিকতর জটিল। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের আচার-আচরণের ব্যাখ্যায় পূর্বেকার উদ্দীপনা→প্রতিবেদন সূত্র (S→R formula) অচল। অধুনা এই ব্যাখ্যার কাজে উদ্দীপনা→সংগঠন→প্রতিবেদন সূত্র (Stimulation→Response formula; S→O→R) সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। উদ্দীপনা সংগঠিত হয়ে প্রতিবেদনরূপে প্রকাশিত হয়ে প্রাণীকে তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে (প্রাণীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী)

সহায়তা করে। এইভাবে প্রাণীর ব্যবহারে ও পরিবেশে যে পরিবর্তন সাধিত হলো তা আবার নতুনভাবে উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করে। একে বলা চলে sensory feedback। প্রাণীর আচার-আচরণ এইভাবে তার সংগঠন ক্ষমতার সাহায্যে উদ্দীপনা→ সংগঠন→প্রতিবেদন→প্রতিবেদন সঞ্জাত উদ্দীপনা (sensory feedback), এই সূত্র ধরে চলতে থাকে (S→O→R→Sf)। যেমন, ধরা যাক একজন লোক কলকাতা শহরের কর্মব্যস্ত রাস্তা পার হচ্ছেন। ফুটপাত থেকে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। ডান পাশ থেকে হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ডান দিকে তাকালেন এবং গাড়ীটি দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্টো দিকে ঘুরে ফুটপাতে পূর্ব্বের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন এবং গাড়ীটি চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই সংগঠন প্রক্রিয়াকে আমরা মানসিক প্রক্রিয়া বলি বা অন্য নাম দিই, তাতে কিছুই আসে যায় না। আসলে এর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। এই সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাণীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মনোযোগ, চিন্তন, প্রক্ষোভ ইত্যাদি। কাজেই মানসিক প্রক্রিয়ার এই দিকগুলির উল্লেখ না করলে প্রাণীর আচার-আচরণ সঠিক এবং সামগ্রিক ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সেদিক থেকে স্মৃতি (memory), মনোযোগ (attention), চিন্তন (thinking),প্রক্ষোভ (emotion) ইত্যাদি বিষয়সমূহের অতি প্রাথমিক (elementary) উল্লেখ অবশ্যই জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এ না হলে মানুষের আচার-আচরণ ও প্রকৃতি এবং তার উৎস সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন কতগুলি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে, যার পরিণতিতে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। জীব-বিজ্ঞানের বর্তমান পাঠ্যসূচী এবং তা অনুসরণ করে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে তাতে এরূপ ভুল ধারণা গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকার ভূমিকায় আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "Life science is to be studied in the school with the idea to have a correct perspective of human being in relation to the environment as exemplified by the plants and animals. The common, as well as different, phenomena of life in relation to the structural and behavioural peculiarities are to be integrated in such a manner as to depict a com-

posite and corroborated picture in which man himself forms the central figure." আবার বলা হয়েছে, "The syllabus of the Life Science has been drawn with a view to teaching the students the use of sense organs as well as to develop the proper perspective of man in relation to other organisms and also in reference to environment in which he lives." মানুষ সম্বন্ধে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, মানুষের সাথে অপরাপর প্রাণীর মিল ও পার্থক্য সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মান প্রভৃতিই এই পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য। এখানে মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব কি? মানুষের আচরণের জটিলতা নির্ভর করছে তার জটিল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর। এখানেই মানুষের সাথে অপরাপর প্রাণীর প্রধানতম তফাত। জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েচে তাতে অর্ধেক মানুষকেই উপস্থিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ মানুষকে নয়। এ যেন জীবনহীন জীবন-বিজ্ঞান। গোডাতেই যদি ছাত্র-ছাত্রীদের এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী গডে ওঠে তাহলে তার ফল অতি মারাত্মক। কারণ পরবর্তীকালে এই বদ্ধমূল ভুল ধারণা সংশোধন করা কষ্টকর হয়ে পডবে। মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের ভুল ধারণার মধ্যে। মন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা না থাকলে মানসিক রোগকে শারীরিক রোগ বলে ধারণা করা, মনের রোগকে অপার্থিব বা আধিদৈবিক ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা স্বাভাবিক। তাই আমাদের দেশের লোক এই রোগের চিকিৎসায় দৈব ওষুধ, ওঝা ইত্যাদির সাহায্য নেবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যই এই দু'রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; কেউ কেউ মানসিক ক্রিয়াকে শারীরিক পর্যায়ে নিয়ে ফেলেন, আবার কেউ কেউ মনকে রহস্যাবৃত অপার্থিব ব্যাপার করে ফেলেন। এরূপ আচরণের মুলে যে মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। তাই শরীর-বিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন শরীর সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে তারা মন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, এটাই কাম্য। মানসিক রোগ চিকিৎসার বিকাশের মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের যে নিবিড় যোগাযোগ দেখা গেছে, বিশেষ করে শরীর যন্ত্রের উপর প্রক্ষোভ সমূহের যে অসামান্য প্রভাবের দিগন্তটি উন্মোচিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা

দানের ব্যবস্থা আলোচ্য পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই থাকা দরকার। শরীর ও মনের পরস্পর নির্ভরশীলতার দিকটি মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু উক্ত পাঠ্যসূচীতে এই দিকটি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে ইন্দ্রিয়স্থান (sense organ), নার্ভতন্ত্র (nervous system) এবং হরমোন (hormone) সম্বন্ধে প্রাথমিক পাঠ দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলির কার্যকারিতার সাথে মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ (যেমন প্রক্ষোভ, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদি) মিলেমিশে আছে। মানসিক প্রক্রিয়াসমূহকে বাদ দিয়ে উপরোক্ত শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই শরীরযন্ত্রের ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান দানের সাথে সাথে মানস-যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধেও জ্ঞান দান প্রয়োজন।

জড় বিজ্ঞানের সীমাহীন জয়যাত্রা মানুষকে নতুন একটা সমস্যার মধ্যে এনে দিয়েছে। দুটো মহাযুদ্ধ এবং আধুনিকতম সমরাস্ত্রের আবিষ্কার এই সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। কিভাবে মানুষ আজ পরস্পরের সাথে মিলে-মিশে বাস করতে পারে, একে অন্যকে কিভাবে আরো বেশি বুঝতে পারে এটাই আজকের বিশেষ সমস্যা। এই কারণেই আজ সারা পৃথিবীতে সমাজ-বিজ্ঞানের নানা শাখা, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। মানুষ তার নিজের এবং অপরের আচার-আচরণ বুঝতে চায়, নিজেকে এবং অপরকে জানতে চায়। এই জানার মধ্যেই তার নিরাপত্তাবোধ নিহিত। তাই আদিম যুগ থেকেই মানুষ প্রশ্ন করেছে, 'আমি কে?'' এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে মানুষ ধর্ম, দর্শন, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারস্থ হয়েছে। মানুষ তার সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা, হিংসা-দ্বেষ, ভালবাসা, ঘৃণা, বুদ্ধি, চেতনা, স্বপ্ন ইত্যাদির নানা ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষ তার নিজের দিকে তাকাতে চেয়েছে। এই কাজে সে কখনও সাধারণ বুদ্ধি, কখনও কুসংস্কার, আবার কখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে। বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অপরিসীম বিকাশের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষ এখনও তার নিজেকে জানার ব্যাপারে নানা কুসংস্কারের ও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা সহজসাধ্য। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। স্বপ্ন সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারণা এখনও রহস্যাবৃত; অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে স্বপ্ন একটা দৈব ব্যাপার, ভগবান দেখান, বা ভৌতিক কিছু ইত্যাদি। কাজেই মনোবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনীন। সকলের মধ্যে এই জ্ঞানকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে প্রত্যেকেই তার নিজের দিকে তাকাতে শেখে। যেমন শরীর সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই থাকা দরকার,

তেমনি দরকার মন সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান। এতে আমাদের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকা সহজতর হবে, সুখকর হবে। বিষয়গত (objective) ভাবে নিজের দিকে তাকাতে শেখানো, এটাই মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ। আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি এই মনোবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণী এবং বিবর্তন (evolution) সম্বন্ধেও কিছু কিছু পাঠ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও একটা মনের জগত আছে সেখানেও যে নানা অনুভূতি ও ভাবের সন্ধান মেলে, সেদিকেও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। কিন্তু পাঠ্যসূচীতে এদিকটিও অবহেলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশেষ (specialised) জ্ঞানদানের প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র এই দিকে যেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, জীব জগতের প্রতি যেন একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, এই ব্যবস্থা থাকা দরকার। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, তিনি উদ্ভিদ রাজ্যে ভাবময় জগতের যে সন্ধান দিয়েছেন, পাঠ্যসূচীতে তার উল্লেখ না থাকা নিশ্চয়ই ত্রুটিসূচক। জগদীশচন্দ্রের এত বড় দৃষ্টিভঙ্গীকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে কিশোর বয়সই উপযুক্ত সময়। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাই এর উপযুক্ত স্থান। জীবজগতের প্রতি মানুষের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী,—বিশেষ করে উদ্ভিদের সাথে মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক ভারতীয় চিন্তাধারায় বিধৃত, তা ভারতীয় চিন্তাধারার নিজস্ব আবিষ্কার ; কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতায় যা প্রকাশিত, তা থেকে যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা বঞ্চিত না করি। এই দৃষ্টিভঙ্গীই বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর মধ্যেই সত্য নিহিত।

বিবর্তন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। শরীর যন্ত্রের বিবর্তন ও মানস-যন্ত্রের বিবর্তন একই তালে চলেছে। জটিল শরীর-যন্ত্রে জটিল মানস-যন্ত্রের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। আবার মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের একটা নতুন ধাপ পরিলক্ষিত হয়েছে, যাকে Hobhouse বলেছেন, "self conscious evolution" "Human evolution, ...is the work of man—the product of the being who evolves. Man does not stand outside his own growth and plan it. "(Mind in Evolution—Hobhouse ; 1901). কাজেই মানুষের প্রকৃতি ও আচরণের স্বরূপ বুঝতে গেলে বিবর্তনের এদিকটিও বিবেচনা করা দরকার।

এতক্ষণ যে সকল কথা বলা হলো তা কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো। তবে এই অনুযায়ী বিস্তারিত পাঠ্যসূচী গড়ে তুলতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি করতে পারেন। বিস্তারিত পাঠ্যসূচী তাঁদের সাহায্যেই রচনা করতে হবে।

সাঁওতালী বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন ও সমাজ-ব্যবস্থায় তার প্রভাব

ধনপতি বাগ *

সাঁওতালদের বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় 'বিচিত্র'। এর কারণগুলো এক এক করে বিবৃত করার চেষ্টা করব। তবে প্রথমেই একটু বলে রাখি—একদিকে বর্তমান জগতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশও মনে হয় এই ব্যাপারে এদের কাছে হার মানবে; আবার অন্য দিকে অতি সংরক্ষণশীল জাতিও এদের বিয়ের অনুষ্ঠানাদি দেখে তারিফ না করে পারবে না। এই দু'য়ের মাঝে আবার এমন কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো সত্যিই অভিনব। আরো আশ্চর্য লাগে, এই সবগুলি পদ্ধতিই সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। এর থেকেই মনে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা ওঠে যে, তাহলে এদের সেই সমাজ ব্যবস্থাটা কি প্রকারের? সেটাইতো আগে জানা দরকার। এই প্রশ্ন মনে রেখেই আমি পূর্ব-প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের † অবতারণা করছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেগুলি পড়লেই খানিকটা ধারণা করতে পারবেন। আশা করছি এদের বিবাহ-পদ্ধতিগুলি প্রকাশ পেলে আমি ঐসব প্রবন্ধে যা বোঝাতে চেয়েছি সেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে, ঐসব প্রবন্ধগুলিতে ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলনটাই ছিল মুখ্য। এবারে প্রধানতঃ বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন কোন দিকে কিভাবে এগোচ্ছে বা মোড় নিচ্ছে, তার মাধ্যমে সমাজের বুকে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেইটাই জ্ঞাতব্য।

বর্তমানে আট-দশ রকমের বিবাহ-পদ্ধতির চল রয়েছে দেখা যায়। এর মধ্যে যে পদ্ধতিটি সব চেয়ে বেশী মর্যাদা পেয়ে থাকে সেটার কথাই আগে বলব। হিন্দু বা মুসলমান যারা প্রাচীনপন্থী তাদের কাছে এই পদ্ধতিটিই বিশেষ গুরুত্ব পাবে। এই বিয়েতে সাধারণতঃ কথা-বার্তা শুরু হয় ঘটক বা ঘটকী মারফৎ। সাঁওতালদের মধ্যে পেশাদারী ঘটকের ব্যবসা এখন খুব মন্দা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওরা অনেক

---

* মনঃসমীক্ষক, বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

† "চিন্তা" তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮১, "চিন্তা" ১ম সংখ্যা ১৩৮২ ও "চিন্তা" ২য় সংখ্যা ১৩৮২।

কথাই বলবে। তার মধ্যে আমরা যাচ্ছিনা, ঘটকদার এসে খবর নেয় ছেলের বিয়ে দেবে কিনা। ওরা আগে ছেলের বাড়ীতেই খোঁজ করে দেখেছি। যদি ছেলের অভিভাবক রাজি থাকে তখন ঘটকদার তার ঝোলা থেকে একটি একটি করে মেয়ের ফর্দ বার করে। ঐসব শুনে ছেলের অভিভাবক যদি আগ্রহী হয়, তখন দেখা-দেখি, পছন্দ-অপছন্দের অধ্যায় শুরু হয়। এই অধ্যায়ের শেষে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট হয়। এটা ছেলের তরফ থেকেই প্রস্তাবিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'মনামনি'। নিয়ম অনুযায়ী এটি মেয়ের গ্রামের অনতিদূরে কোন বনে বা বাগানের মধ্যে, নির্জন পরিবেশে হবে। যেখানে উভয় পক্ষের কিছু কিছু লোক উপস্থিত থাকবে। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব বিষয়ে অগ্রণী। সঙ্গে যে দু'চার জন পুরুষ থাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। ভাবী বরই একমাত্র পুরুষ যার সমাদরের বহর দেখবার মত। অবশ্যই বর ও কনে উভয়কেই সমান সমাদর দেখানো হয়। বরের আদর সবচেয়ে বেশী কন্যাপক্ষের মেয়েদের কাছে, আর কনের আদর বর-পক্ষের কাছেই সর্বাধিক। উভয় পক্ষ থেকে যারা যারা আসে তাদের মধ্যে সাধারণতঃ থাকবে, কাকীমা, বৌদি, পিসিমা, বড়দিদি ইত্যাদি। এক এক পক্ষ থেকে আট-দশ করে আসবে।

প্রথমে বর-পক্ষ একটি পরিষ্কার জায়গায় বৃত্তাকারে বসবে। বৃত্তের একদিকে খানিকটা জায়গায় আনুষ্ঠানিক জিনিষ-পত্র রাখা থাকবে এবং ঐগুলির একদিকে খানিকটা জায়গায় আনুষ্ঠানিক জিনিষ পত্র রাখা থাকবে এবং ঐলির একদিকে বর ও একদিকে কনে, কিছু লোকের তত্ত্বাবধানে থাকবে। জিনিষ-পত্রের মধ্যে প্রধান মুড়ি এবং সরিষার তৈল বা 'সুনুম্'। একজন মহিলা বৃত্ত থেকে এগিয়ে এসে বসবে এবং এক হাঁটুর উপর ছেলেকে এবং অপর হাঁটুর উপর মেয়েকে বসিয়ে হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় তেল মাখিয়ে দেবে, এবং শেষে তাদের আঁচলে বা গামছায় কিছুটা মুড়ি ঢেলে দেবে। সবশেষে ঐ মহিলা বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে গলায় একগাছি করে মালা পরিয়ে দিয়ে। মালা ছাড়া নগদ টাকা-পয়সাও অনেকে আশীর্বাদী হিসাবে দিয়ে থাকে। এইভাবে উপস্থিত সকল মহিলাই বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে। এই অনুষ্ঠান শুরু হয় দ্বিপ্রহরে শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা লেগে যায়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে এতো সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও শোভন এবং রুচিসম্পন্ন অথচ অনাড়ম্বর; কিন্তু এতই হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে যে মুগ্ধ বিস্ময়ে

শুধু দেখেই মনটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবদম্পতির কল্যাণ-কামী হয়ে পড়ে।

এই অনুষ্ঠানটি যখন চলতে থাকে তখন উভয়পক্ষ গলা মিলিয়ে গানের লহর গেঁথে চলে। 'মনামনির'র পালা শেষ হলে উভয়পক্ষ মিলে বিয়ের তারিখ ঠিক করবে। এটা হোল প্রস্তুতি পর্ব। অবশ্য মনামনিতে রাজী হবার আগেই অভিভাবকরা লেন-দেনের ব্যাপারটা ঠিক করে নেয়। যেমন লেন-দেন সম্বন্ধে কথা বলার আগে ঠিক হয় জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি নির্ব্বাচন। এগুলিকে ধরলে 'মনামনি'কে তৃতীয় কি চতুর্থ পর্বও বলা চলে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, সাঁওতালদের বিয়েতে মেয়ের জন্য বরপক্ষ কন্যার পিতাকে কিছু অর্থ দেবে, এইটাই নিয়ম ; অর্থাৎ মেয়েকে কিনে নিতে হয়। এতে কন্যাকুল গৌরবান্বিত হয়। এই পদ্ধতিতে মোট বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা কন্যাপণ দিতে হয়। এই অর্থ থেকে পঞ্চাশ পয়সা কন্যার পিতা পঞ্চায়েতকে দেবে। এটা সম্মানী অর্থ। বাকিটা তার নিজের পাওনা। মেয়েকে কিনে নেওয়াতে কন্যাপক্ষ গর্বিত কিন্তু তাই বলে এই গর্ব্ব বা সম্মানের সঙ্গে ওরা টাকার অঙ্কটা বাড়ানো-কমানোর কথা চিন্তা করে না। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না ; তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এবং মেয়ে যে সমাজে সমাদৃত এই বোধটা ওদের খুব টনটনে। ওরা আমাদের বলে, "তোমাদের ছেলে তো তোমরা মেয়ের বাপের কাছে বিক্রি কর ; আর আমাদের মেয়ে ছেলের বাপকে কিনে নিতে হয়।

বিয়ের আগে 'লস্‌মিদা' (পাকা দেখা) বলে আর একটি অনুষ্ঠান ক্বচিৎ-কখনো হতে দেখা যায়। যথেষ্ট সম্পন্ন ঘর ছাড়া এই অনুষ্ঠান করে না, কারণ এতে খরচ অনেক।

এরপর প্রাক্‌-বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিয়ের আগের দিন, ছেলের বাড়ী এবং মেয়ের বাড়ী উভয় জায়গাতেই। এই অনুষ্ঠানকে ওদের ভাষায় বলে "সুনুম্‌-সাসান" আক্ষরিক বাংলা 'তেল-হলুদ', আমরা যাকে বলি 'গায়ে-হলুদ'। এদের এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য আছে। এটা শুরু হয় সন্ধ্যার পর। সারারাত ধরে এই পর্ব্ব চলতে থাকে। তিনজন কিশোরীকে নির্ব্বাচন করা হয় এই কাজের জন্য, এদেরকে বলে "তিত্‌রী-কুড়ী"। প্রথমে পঞ্চায়েতের সব সভ্যদের খবর দিয়ে কনের বাড়ীতে আনা হবে। তাদের মধ্যে নায়েকে কে সর্বপ্রথম নির্বাচন করা হবে—এই 'তিত্‌রী কুড়ীরা' নায়েকের

পায়ে সরিষার তেল ও হলুদ (কাঁচা হলুদ বেটে) মাখিয়ে দেবে। এরপর এক এক করে পঞ্চায়েতের সব সভাদের অনুরূপ ভাবে তেল হলুদ মাখাবে। তারপরে গ্রামে যতগুলি পরিবার আছে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী আসবে তাদের প্রত্যেককে যথারীতি "সুসুম-সাসান" মাখানো শেষ হলে এই অনুষ্ঠানের শেষ হবে। ওদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে দিনের আলো দেখা দেয়।

বিয়ের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কন্যাপক্ষের বাড়ীতে শুরু হয় দেরীতে। তার সবিশেষ বর্ণনা পরে দেব। বরপক্ষের প্রথম অনুষ্ঠান ছেলের স্নান করানো এবং তার আনুসঙ্গিক আচার-বিচার সকালে শুরু হয়। এই অংশের সবিশেষ পরিচয়ও ঐ মেয়ের বাড়ীর অনুরূপ, তাই এর পরিচয়ও কন্যাপক্ষের সঙ্গেই এক সঙ্গে জানা যাবে। বরপক্ষের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আমি এখন শুরু করছি।

ছেলের গ্রাম থেকে বরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকজন পুরুষ। এর সংখ্যা কত হবে সেটা মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া আগেই হয়ে থাকে। গ্রামের বাইরে থেকেও লোক থাকবে, যেমন ছেলের মামা, ভগ্নীপতি, পিসে, মেসো ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিরা। ছেলের দাদাও অবশ্যই থাকবে। আর থাকবে ঘটক এবং নিতবর, যাকে ওদের ভাষায় বলে "লামৃতা"। আর একটি চার-পাঁচ জনার দল বাজনদারের দল, এরা বরযাত্রীদের আগে আগে বাজনা বাজাতে বাজাতে রওনা হবে। সাঁওতালী ভাষায় বরযাত্রীদের বলা হয় "ভারীয়োৎ" *

এই বরযাত্রীর দল নিজগ্রাম থেকে এমন সময়ে রওনা হয় যাতে কনের গ্রামে বিকাল নাগাদ পৌঁছোতে পারে। কন্যাপক্ষের গ্রামে পৌঁছে বরযাত্রীর দল গ্রামের খানিকটা দূরে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবে। ঢোল কাঁসর বাজিয়ে অবশ্য তাদের উপস্থিতির কথা কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেবে। ঐ গাছতলাটি হবে ভারীয়োৎদের সাময়িক ছাউনী।

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কিছু লোকের ধারণা আছে "ভারীয়োৎ" এ স্ত্রী পুরুষ উভয়ই থাকে। আমি এরূপ উল্লেখ একজন গবেষকের ছাপানো পুস্তকেও দেখেছি। কিন্তু আমি নিজে অনেক খোঁজ করেছি, বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন, শান্তি-নিকেতনের চারিধারের অন্ততঃ পনের ষোলটি সাঁওতাল গ্রামের কোথাও ঐ মতের সমর্থন পাইনি।

এদিকে বাজনার শব্দ পেয়ে কনের বাড়ীতে প্রস্তুত হবার জন্য ব্যস্ততা দেখা যাবে। একদিকে কনেকে প্রস্তুত করা, অন্যদিকে বরযাত্রীদের আহ্বান করা, স্ত্রী-পুরুষ দুই দল দুই দিকে যাবে। বরযাত্রীদের সমস্ত দলটায় পুরোভাগে থাকবে নিতবর সহ বর ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। তারপর নৃত্যরত বাজনদারদের দল চার-পাঁচজন। সবশেষে বাকিরা। দলটি গাঁয়ের মুখে এসে গেলে গাঁ থেকে কন্যা-পক্ষের লোক এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে; তাদের সকলকে গুড় ও জল খেতে দেবে। [এইখানে বলে রাখি, কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের একটা নকল যুদ্ধ (লাঠালাঠি) হতে দেখেছি।] এই সময়ে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ভারীয়োৎকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করবে। এর মধ্যে মেয়ের বাবা বর ও নিতবরকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে যাবে এবং বারান্দায় বা উঠানে পাতা পাটির উপরে বসাবে। এই সময়ে বেশ খানিকটা মজার ব্যাপার ঘটে।

কনের দিদিরা এই সময়ে বরের কাছে আসবে। তাকে তেল মাখাবে; তার মাথার উকুন বাছবে, তার মাথার চুল বেঁধে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে বরকে এবং বরযাত্রীকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবে। বাজনদাররা তাদের বাজনা ও নাচ চালিয়ে যাবে। তেল মাখানোর পালা শেষ হলে বরকে উঠানে এনে দাঁড় করাবে। তার মাথায় জল ঢেলে চান করাবে, কিন্তু চানের পর গা মোছাবে না, চুল আঁচড়াবে না। তবে তাকে হলুদ ছোপান একখানা মার্কিন পরতে দেবে এবং তার মাথায় একটা টোপর পরাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শোলার টোপর দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বরের বাড়ী থেকে আনা বিশেষ ধরণের কাপড় দিয়ে কোণাকৃতি করে টোপর গড়ে মাথায় পরাবে। এই টোপরকে ওদের ভাষায় বলে "শাড়াদড়হী"। বর কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে। এখন বরের পাশে কনের ছোট ভাইকে এনে দাঁড় করাবে। এরপর কনের ঘর থেকে একটা থালায় করে কিছু আতপ চাল আনবে। থালাটা বরের সামনে ধরবে। ঐ থালা থেকে বর ও কনের ভাই একমুঠো করে আতপচাল নিয়ে মুখে পুরবে এবং চিবোবে। এই সময়ে বরের ভগ্নিপতি বা পিসে বরকে কাঁধে নেবে এবং কনের ভাইটাকে কাঁধে তুলবে তার জামাইদাদা বা ভগিনীপতি। এরি ফাঁকে বর চিবানো চাল মুখ থেকে থু-থু করে কনের ভাইয়ের দুই গালে লাগিয়ে দেবে। কনের ভাইও তার মুখের চিবানো চাল বরের গালে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে কিন্তু সেইসময়ে তাকে তার জামাইদাদা সরিয়ে নেবে। বর রেহাই পাবে।

ইত্যবসরে একটি ঘরে কন্যাপক্ষের কিছু লোক এবং বরপক্ষের কিছু লোক ঢুকেছে। সেখানে তারা মদ খাচ্ছে, গল্প-গুজব করছে। ঐ ঘরে বরপক্ষ থেকে আনা

একটি ঝুড়ি এনে রাখা হবে। সেই ঝুড়িতে থাকে কনের জন্য একখণ্ড বস্ত্র। ঐ বস্ত্রখানি কন্যাপক্ষের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তাদের মন্তব্য সকলকে শোনাবে। বলাই বাহুল্য ঐ মন্তব্যগুলি বরপক্ষকে শোনাবার জন্যই বলা হয়। সবই সমালোচনামূলক মন্তব্য। ঠাট্টা তামাসার সুরটিই প্রধান।

ঐ বস্ত্রটি মেয়ে বিশেষ এক ধরণ করে পরবে। আঁচলটি কোমরে এমনভাবে গুঁজবে যাতে সেখানে একটি ঝুলন্ত ঝোলা মনে হবে। ঐ আঁচলে মেয়ের মা কিছুটা ধান ঢেলে দেবে। ঐ ঘরের মধ্যে (সাঁওতালদের সব মূল ঘরের মধ্যেই থাকে) এক প্রান্তে নিচু দেওয়াল ঘেরা একটু জায়গা থাকে, যাকে ওরা বলে "ভিতর" —সেই 'ভিতর'কে সামনে রেখে কনে দাঁড়াবে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসবে কিছুক্ষণ তারপর নিবেদন করার মত করে আঁচলের ধানগুলো মেঝেয় ঢেলে দেবে, উঠে দাঁড়িয়ে 'ভিতরে'র বোঙা-কে প্রণাম করবে। ঘুরে এসে উপস্থিত নিজের গুরুজনদের সকলকে জোহার করবে। সবশেষে যে ঝুড়িটা করে কাপড় আনা হয়েছিল সেই ঝুড়িটাকে জোহার করবে। তারপর ওটাকে ডান পা দিয়ে স্পর্শ করবে এবং সর্বশেষ ঐ ঝুড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে এবং পা মুড়ে ঐ ঝুড়ির ভিতরে বসবে। এই অবস্থায় গায়ের কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেবে। কেবল দু'টি হাতের আঙুলগুলি দেখা যাবে। ডান হাতে একটি কাজল-লতা বা "কাজরাটি" ধরবে এবং বাঁ হাতে ঝুড়ির কানাটা ধরে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবে। ঐ কাজল-লতাটি এতক্ষণ হয় মেয়ের কোমরে গোঁজা ছিল, নয়তো মালার মধ্যে ঝোলানো ছিল। এতক্ষণে ঘরের মধ্যেকার কাজ শেষ হোল।

এরপর মেয়ের ভগিনীপতি কনেশুদ্ধ ঝুড়িটি তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবে ; আজকের দিনটাতেই ছোটভায়ের স্ত্রীকে ছুঁতে দোষ নেই। ওদিকে বরের জনৈক ভগিনীপতি বা 'জামাইদাদা' বরকে কাঁধে চাপিয়ে নেবে। বর ও কনেকে এই অবস্থায় পাশাপাশি রাখবে। আগে থেকেই একটি ঘটিতে জল রেখে তার মুখে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। ঐ ঘটির মুখে আমপাতার বোঁটা ধরে কনে অন্যদের সাহায্যে (কেন না তখনো তার চোখ মুখ ঢাকা) বরের কাঁধে ছিটোবে। বর-ও ঐ পাতা দিয়ে ঘটির জল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এই সময়ে মুখের কাপড়টা কিছুটা শিথিল করা হয়। এরপর পাঁচটি শালপাতায় মোড়া সিঁদুরের একটি মোড়ক বরের বাবা ছেলের হাতে দেবে। বর ঐ মোড়কটি বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে ঐ হাতটি কনের মাথার উপরে রাখবে এবং ডান হাত দিয়ে মোড়কটি

খুলবে এবং বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুলের সাহায্যে একটু সিঁদুর নিয়ে প্রথমে একটু মাটিতে ফেলবে। দ্বিতীয়বার ঐ একইভাবে সিঁদুর তুলে কনের সিঁথির নীচের দিক থেকে শুরু করে টিকির কাছাকাছি টেনে দেবে। এইভাবে তিনবার সিঁথিতে সিঁদুর দেবে। বাকি যে সিঁদুরটুকু পাতায় থাকবে সেটুকু পাতাশুদ্ধ সিঁথিতে মাখিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাথায় "টুটুরি" অর্থাৎ ঘোমটা টেনে দেবে। ঐ পাতাটা বর হাতে ধরে থাকবে। অন্যরা ওটা ফেলে দেবার জন্য প্ররোচিত করবে কিন্তু সে ফেলবে না, পরন্তু বর ঐ পাতাটা তার বাবার হাতে দিয়ে দেবে।

এই পর্যন্ত যখন শেষ হোল তখন বরপক্ষের কুটুম্বদের এবং কন্যাপক্ষের গোষ্ঠিবর্গের ও কুটুম্বদের খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আজকের বিয়ে শেষ হতে এখনো একটি পর্ব বাকি আছে। সেটা এবারে বলছি।

ওদিকে যখন খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে-বাড়ী ব্যস্ত সেই সময়ে দেখা যাবে বর, কনে ও লামৃতা অন্য কয়েকজন সঙ্গী সহ গ্রামের 'কুলি'-তে' দাঁড়িয়ে আছে। এই পথে অপেক্ষমান আজকের সম্মানিত অতিথিদের কাছে মেয়ের মা জলের পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে। ঐ পাত্র থেকে জল নিয়ে প্রথমে জামাইয়ের পা ধুইয়ে দেবে; তারপরে ধোয়াবে নিজের নবপরিণীতা মেয়ের পা এবং সবশেষে তাদের ছোট্ট সঙ্গী নিতবরের পা। এর পর জলটা বদলে নিয়ে এসে ঐ তিনজনার মুখগুলিও পরিপাটি করে ধুইয়ে দেবে কনের মা।

তারপর আসবে দুটি ঠোলাতে গুড়। একটি ঠোলা (পাতার ঠোঙা) থেকে গুড় নিয়ে মা মেয়ে ও জামাইকে খাওয়াবে এবং অন্য ঠোলাটির গুড়টুকু খাওয়াবে লামতাকে। গুড় খাওয়ানোর পর জল অবশ্যই পান করানো হবে। এইখানেই শেষ নয়। এবারে তিনজনার পায়ে পরিপাটি করে তেল মাখিয়ে দেবে ঐ মা। তেল মাখানো শেষ হলে পাতায় মোড়া সিঁদুর নিয়ে তিনজনকে তিন ভাবে সিঁদুর পরাবে। তারপর একটা কাঁচা শালপাতার থালায় করে আগুন আসবে এবং ঐ সঙ্গে একটা মোটা কাঠের খেঁটে বা ডাণ্ডা। এই মোটা ডাণ্ডাটির একপ্রান্ত একহাতে ধরে আগুনের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রান্তভাগটা আগুনে তপ্ত করবে, অন্য হাতের চেটোটা "আদাব" করার মতো করে নিজের কপালের সামনে তুলবে। পরের বারে অন্য হাতে ডাণ্ডাটি ধরবে এবং আগুনের চারধারে ঘোরাবে ও গরম করবে ও অপর হাতটা দিয়ে "আদাব" এর অনুরূপ আচরণ করবে। এমনি করে পাঁচবার কনের সামনে এবং পাঁচবার

লামতার সামনে অনুষ্ঠান করবে। শেষবারে ডাণ্ডাটি আগুনে ঠেকিয়ে পাশে রেখে দেবে। এই ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়েছে এটি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাবিশেষের আশীর্ব্বাদ করার একটি পদ্ধতি। সকলের এতে অধিকার নেই। যাদের আছে এবং যাদের ইচ্ছা আছে তারাই এইসময়ে এখানে উপস্থিত থাকে। এরা সারাদিন ধরে এখনো উপবাসী। এই অনুষ্ঠান শেষ করে তবে এদের ছুটি। কনের মা ছাড়া বড়দিদি, কাকীমা-পিসিমা প্রভৃতিরা অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের অধিকারী।

এই অনুষ্ঠান শেষে বর কনের দিদির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ধরবে, দিদি তখন তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবে। কনে ও লামৃতা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকবে। ঘরে ঢুকে দিদি একটি জলভর্তি ঘটি হাতে তুলে নেবে এবং ঘরের মধ্যে গোল হয়ে তিনপাক ঘুরবে। ঘোরার সময় মাঝে মাঝে একটু একটু করে জল ঘটি থেকে ফেলবে মেঝেয়। তারপর মেঝেয় পাতা তালাই বা চাটাইয়ে সকলে বসবে এবং সকলকে মদ বা হাঁড়িয়া পরিবেশন করা হবে। এই আনুষ্ঠানিক মদ খাওয়ানোর পর ওদের ভাত-তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। খাওয়া শেষে বর ও নিতবর বাইরে বেরিয়ে যাবে। কনে থাকবে ঘরের ভিতরে।

এই সময়ে বাইরে শুরু হবে নাচ, গান, বাজনা। উপস্থিত কিশোরী ও যুবতীরাই বিশেষ করে এই নাচ গানে মাতে। যুবকরা বাজায় বাজনা। অনেক সময় তারা কনেকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে দেয়।

এই নৃত্য পর্ব শেষ হলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। সূর্যোদয়ের আগে বর-কনের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

বিয়ের প্রথম দিনের শুরু; প্রথমেই জানিয়ে রাখি বিয়ের প্রারম্ভে বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতে একই রকমের আচার-অনুষ্ঠান হয়, বিশেষ কোন ভেদাভেদ নেই। কনের বাড়ীতে তার আত্মীয়-স্বজনরা কুশীলব, ছেলের বাড়ীতে বরের আত্মীয়-স্বজনরা, এই যা তফাৎ। অনুষ্ঠানের উপকরণাদি সবই এক। উদ্দেশ্য তো বটেই। এজন্য আমি কেবল একটা বাড়ীর অনুষ্ঠানই—ধরুন মেয়ের ঘরের—কিভাবে ঘটছে সেইটাই বলব। পাঠক অন্য বাড়ীর অর্থাৎ ছেলের ঘরের ঘটনাগুলো কল্পনা করে নেবেন। একান্ত দরকার যেখানে হবে সেখানে অবশ্যই বিশেষ করে উল্লেখ করব।

মেয়ের বাড়ী অনুষ্ঠান শুরু হয় দেরীতে। বরযাত্রী গ্রামপ্রান্তে পৌঁছবার সাড়া পেলে তখন কনেকে প্রস্তুত করার জন্য সাড়া পড়ে যায়। বিয়েতে পুরোহিতের করণীয় কিছু নেই। অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানে আমরা পুরোহিতের যে ভূমিকা দেখেছি

এখানে সেই অনুপাতে বিয়ের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যৎসামান্য। দরকারী ভূমিকা যে টুকু আছে তা হোল জগ্-মাঝির। জগ্-মাঝি একজন পঞ্চায়েৎ সভ্য, মাঝি বা সর্দারের ডান হাত। বিয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শ নিয়ে ঠিক হয়েছে, সকলেই জানে। আগের দিনে তেল-হলুদ অনুষ্ঠানে তো সেটি সর্বতোভাবে পাকা হয়ে গেছে। তবু বিয়ের দ্বিন কোন অনুষ্ঠান শুরু করার আগে জগ্-মাঝির কাছে আর্জি পেশ করতে হবে : অনুমতি করুন আমরা মেয়েকে চান করাব।

এই চান করানো অনুষ্ঠান হবে "বাগড়ী-"তে, অর্থাৎ কনের বাপের বাড়ীর বাস্তু-সংলগ্ন বাগানে। অনুমতি পেলে উপস্থিত সকলে একরকা মদ বা হাঁড়িয়া খেয়ে নেবে এবং বাগ্ড়ীতে গিয়ে পুরুষরা একটা খাল কাটবে। মেয়েরা নাচতে শুরু করবে। মেয়ের বাবা, মা এবং ঐ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বাগ্ড়ীতে যাবে। স্ত্রীলোকদের দলে মোট পাঁচ জন (বেশীও হতে পারে, তবে সংখ্যা বিজোড় হতে হবে) ঐ খালটিকে প্রদক্ষিণ করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ গর্তের মধ্যে জল ঢালবে তাদের হাতের ঘটি থেকে। ঐখানে একটি তীর, একটি লম্বাটে ধারাল অস্ত্র—ওদের ভাষায় এর নাম—"তাড়োয়াড়ী"—আমাদের ছোট আকারের খাঁড়ার অনুরূপ, এবং একটি ঘটি এক জায়গায় রাখা থাকবে। প্রত্যেক এক একটি জিনিষ নিয়ে প্রথমে আকাশের দিকে দেখাবে পরে নীচে ঐ খালটির দিকে দেখাবে, তারপর যথাস্থানে রেখে দেবে।

এদিকে জগ্মাঝি খালটা ঘিরে তিনটি আমের ডাল পুঁতবে এবং ঐ আমের খুঁটি ঘিরে খানিকটা সাদা সুতো জড়াবে। খালের পাড়ে মাটিতে এক জায়গায় সিঁদুর লাগাবে। একটা বড় কাঁসার বাটিতে এক বাটি মদ ও কয়েকটা শালপাতার তৈরী পাত্র (ঠোলা) আনবে। একটি ঠোলাতে মদ ঢেলে ঐখানে বোঙার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে। বাকি মদটুকু উপস্থিত পুরুষরা ভাগ করে খাবে। মদ খাওয়া শেষ হলে খুঁটি থেকে ঐ সুতোটা খুলে নেবে।

এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত "তিত্রি-কুড়ীরা" দু'টি মাটির কলসি নিয়ে আসবে। ঐ কলসির মধ্যে কিছুটা মুড়ি ও কয়েকটা করে পয়সা থাকে। জগ্মাঝি ঐ কলসি দুটি ওদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে এবং কলসি মধ্যস্থ মুড়ি ও পয়সা ওদের দিয়ে দেবে। কলসি দুটিতে জল ভর্তি করে জগ্মাঝি মাটিতে বসিয়ে দেবে। তিন জন "তিতরি-কুড়ী"র মধ্যে দু'জন কলসি দু'টি সামনে নিয়ে মাটিতে বসবে। তারপর প্রথমে হাঁটুর উপরে কলসি দুটি তুলবে,

সেখান থেকে তুলবে মাথায় এবং আবার মাটিতে নামাবে। আবার আগের মত করে মাথায় তুলবে এবং উঠে দাঁড়াবে।

এই অনুষ্ঠানে জগমাঝি পায় একখণ্ড পাঁচগজের মার্কিন কাপড়। এই কাপড়টি ভাঁজ করে সে কিশোরীদের মাথায় উপরে জলভর্তি কলসি দুটির মুখ ঢেকে দেবে। তখন কিশোরীরা ঐ কলসী নিয়ে কনের বাড়ীর উঠোনের দিকে যাবে; যেখানে গতকাল শালের ডাল দিয়ে ছোট্ট একটা ঘেরা জায়গা করা আছে যেটাকে সাঁওতালী ভাষায় বলে "মাণ্ডোয়া", সেখানে কলসি দুটো নামিয়ে দেবে। দুজন মাত্র এই কাজটা করলেও থাকবে কিন্তু ওরা তিনজন। ওদের আরো কাজ আছে।

এই "ভিত্‌রি-কুড়ী" রা এবার কনেকে তেল মাখাবে। ওদের তেল মাখানো শেষ হলে কনের মা আবার মাখাতে বসবে। ইতিমধ্যে পুরুষরা একটি গরুর জোয়াল ঐ বাগড়ীতে খালের উপর আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে আসবে। তেল মাখানো শেষ হলে কনেকে বাগড়ীতে নিয়ে যাবে। কনের মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরাও বাগড়িতে যাবে। ঐ খালটির একদিকে কনে, তার মা ও তার বাবা এক লাইনে দাঁড়াবে। বাঁ-দিক থেকে প্রথমে বাবা, মধ্যে কনে এবং দক্ষিনে মা। মা ও মেয়ে বসবে, বাবা দাঁড়িয়েই থাকবে। এবারে বাবা পূর্বোল্লিখিত খাঁড়া বা বগি বা "তাড়োয়াড়ী" খানা তার মাথার উপরে তুলে ধরে থাকবে, মা ও মেয়ে জোড় হাত করে বসে থাকবে। জগমাঝি খঁড়ার উপর জল ঢালতে থাকবে, ঐ জল কনের মা ও কনে আঁজলা ভরে খাবে এবং হাত দুটো মাথায় মুছবে। এরূপ একবারই করবে, এরপর বাবা ও মা স্থান ত্যাগ করবে। তাদের জায়গায়, তাদের স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন স্বামী-স্ত্রী অনুরূপ-ভাবে আচরণ করবে। এইভাবে মা-বাবার ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একের পর এক অনুরূপভাবে কাজ করে যাবে। এই পর্ব শেষ হলে কনে ও তার দিদিরা ও "ভিতরি-কুড়ীরা" ছাড়া আর সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করবে। দিদিরা পূর্বোল্লিখিত দুই কলসি জলের একটি কলসি আনবে। কনেকে খালের উপরে পাতা জোয়ালের উপর দাঁড় করাবে এবং ঐ কলসির জল দিয়ে কনেকে চান করাবে। দরকার হলে পরে অন্য পাত্রের জলও নিতে পারে। এরপর কনেকে তার বাড়ীর দেওয়া পাড়ওয়ালা একখানা নতুন শাড়ী পরাবে। এরপর "ভিতরি-কুড়ী"দের প্রস্থান। কনে থাকবে দাঁড়িয়ে। আসবে জগ্‌মাঝি। ঐযে আগে খানিকটা সাদা সুতো তিনটে খুঁটি ঘিরে লাগিয়েছিল সেই সুতোটাই দণ্ডায়মানা

কনের বাঁ-পায়ের (আঙুলের) থেকে শুরু করে কান বেড়িয়ে তিন-চার বার ঘুরিয়ে বাঁধবে —লম্বভাবে সুতোর খি-গুলো থাকবে।

"তিতরি-কুড়ী"দের পুনঃপ্রবেশ, হাতে কিছু আতপ ধান ও আমপাতা। ওরা তিন-জনই জগ্-মাঝির নির্দেশমত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙুলের নখের সাহায্যে খুঁটে-খুঁটে আতপ চাল বার করে আম পাতাতে রাখবে। জগ্-মাঝি ঐ চালের সঙ্গে ছোট এক টুকরো কাঁচা হলুদ যোগ করে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে মুড়বে এবং কনের পা থেকে কানের সঙ্গে যুক্ত ঐ সুতোটা খুলে নিয়ে এই আমপাতার মোড়কটা পরিপাটি করে বাঁধবে। সব শেষে ঐ মোড়কটি কনের ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে দেবে। এইটা মেয়ের হাতে সাধারণতঃ চার-পাঁচ দিন থাকে। সময় হলে শ্বশুর বাড়ীর জগ্মাঝি আবার খুলে দেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বরের হাতে অনুরূপভাবে ঐরূপ একটি মোড়ক বাঁধা হয়েছে। সেই অবস্থায় বর বিয়ে করতে এসেছে। সেটিও সময়মত ঐ একই দিনে খোলা হবে।

এতদূর হলে মেয়ে বিয়ের কনে হিসাবে প্রস্তুত হোল!

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

এখন মেয়ের বাড়ীতে দ্বিতীয় দিনে কি ঘটছে দেখা যাক্। এখানে বলে রাখি দ্বিতীয় দিনে ছেলের বাড়ী তো প্রায় ফাঁকাই থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। বর-কনের ফিরতে সেই বিকাল। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর যেটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায় সে কথা যথা সময়ে বলব।

দ্বিতীয় দিনে কনের বাড়ীতে বিদায়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাই বলে কোন করুণ দুঃখের অবতারণা করতে দেখা যায় না; অন্ততঃ ঘরের বাইরে তো নয়ই। বাইরে বরং উল্টোটাই ঘটে। সেই কথাই এখন বলব।

অতিথিরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে মাণ্ডোয়ার ধারে কাছে এসে জমতে থাকবে। সকলে এসে পৌঁছোলে প্রথমেই তাদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। একদিকে যখন মদ বা হাঁড়িয়া পান চলে অন্যদিকে তখন বিচিত্র ধরনের প্রসাধন দ্রব্যাদি এসে জমা হয়। এই দ্রব্যগুলি হোল: ছোট একটি আয়না, চিরুণী, সিঁদুর ও হাঁড়ির ভুষো কালি দিয়ে তৈরী কাজল ইত্যাদি। সাজবে কনের মা বাদে স্ত্রী-কুলবতীরা। মদ্যপানান্তে

অপেক্ষমান অতিথিদের সামনে বটপাতা (শালপাতা নয়) থেকে তাদের হাঁড়িয়ার গাদ (যা গরু-বাছুরের খাদ্য) খানিকটা করে পরিবেশন করা হবে। পান করার জন্য জল দেবে এমন ফুটো পাত্রে যাতে জলটা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে অতিথির গায়ে পড়ে। এরপর বিচিত্র সাজে চিত্রিতা কুলবতীরা এক এক জন করে কুটুমদের সামনে আবির্ভূতা হবে। প্রথমে যে সক্রিয় হবে তার বাঁ কাঁধে থাকবে একটি ভেড়ার শিশু। এই শিশুটি বিচিত্র পরিবেশে ধৃত অবস্থায় প্রবল আপত্তি জানাবে, অর্থাৎ কাঁদবে। কুলবতী অতিথিদের সামনে গিয়ে যথারীতি জোহার করবে, জনে জনে। চলে আসবার আগে হঠাৎ ঘুরে কোন এক অতিথির সামনে এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে—বাচ্চাটা কাঁদছে একটু কোলে নিতে পার না? এই বলে তার দিকে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দেবার ভান করবে। অট্টহাসিতে চারদিক ফেটে পড়বে। অথ প্রথমার নির্গমন!

এরপর ঢুকবে দ্বিতীয়া। সারিবদ্ধ অতিথিদের এক এক জনকে সে জোহার করে যাবে। প্রত্যেক অতিথি প্রতি-জোহার করবে তাদের মাথাটা সামনে একটু নত করে। ঐসব কুটুমদের মাথায়, প্রায় সকলের, ধবধবে সাদা কাপড়ের পাগড়ী (?) বাঁধা থাকে। কুলবতীর তাক থাকে ঐসব পাগড়ীর দিকে। উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্য জানে সেজন্য তারা সজাগ থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন কোন কুটুম তার কুটুম্বিনীর কাছে ধরা পড়ে যায় তখন তার সাদা উষ্ণীষের দুরবস্থা দেখে আর একবার হাসির হোটে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। কুটুম্বিনীর মুখের যত কালিমা, কুটুমের ফুলের মত সাদা কাপড়ের গুণে পরিষ্কার হয়ে যায়। এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে একের পর এক ঠাট্টা-তামাসা—হাসি মস্করার অভিনয়।

কিছুক্ষণ পর আবার দৃশ্য বদলাবে। এবারে অভিনেত্রীরাই উপস্থিত সকলকে (বর ও কনে বাদে) হাঁড়িয়া বা হণ্ডি পরিবেশন করবে, নিজেরাও পান করবে। পানপর্ব শেষ হলে আবার পরবর্তী কাজের জন্য এগিয়ে যাবে। অতএব, এই সময়টুকুকে বিশ্রাম বলা চলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল কনের বাবা একটা কুলোতে করে কিছু আতপচাল, সিঁদুর ও একঘটি জল মাণ্ডোয়ার পাশে এনে রাখতে। আজকের জন্য যে খাসিটা মেয়ের বাবা নির্দিষ্ট করে রেখেছে সেইটা আনবার জন্য একজনকে আদেশ করবে। ওটা আনলে খাসিটাকে কিছু আতপচাল খাওয়াবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি সাঁওতালরা

হিন্দুদের মত হাঁড়িকাঠ পেতে ছাগল কাটে না, এমনি জমিতেই কাটে। যে জায়গায় কাটবে সেখানে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দেবে; খাসির কপালেও সিঁদুরের টিপ দেবে। মাণ্ডোয়ার পাশে বসা দুজন লোকের মধ্যে একজন বরযাত্রী। ঐ বরযাত্রী পাশে রাখা খাঁড়া বা বগিটা নিয়ে খাসিটা কাটবার জন্য উঠে দাঁড়াবে। খাঁড়া মাথার উপরে তুলবে কিন্তু খাসির স্কন্ধে সে খাঁড়া নামবে না। সে বলি দেওয়ার অভিনয় করবে মাত্র। আসলে খাসিটা কাটবে পূর্ব নির্ব্বাচিত কনের ঘরের একজন। বলি শেষে কনের বাবা বলিস্থানে টাটকা রক্তের উপর একটু মদ ঢেলে দেবে। পাত্রের বাকি মদটুকু উপবিষ্ট দুই ব্যক্তিকে পান করতে দেবে। তারা মদ খেয়ে খড়ের নুটি দিয়ে, ঘষে-ঘষে বলির রক্তটা তুলে ফেলবে। তোলা হলে ঐ নুটি দুটি যে যার বগলে চেপে রেখে পরস্পরকে জোহার করবে।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যাবে কন্যাপক্ষের জনৈকা কিছু আতপচালের গুঁড়ি দিয়ে মাণ্ডোয়ার এক পাশে একটা লাইন আঁকল। সেখানে একটা তালাই বা চ্যাটাই পাতল। সেই চ্যাটাইয়ের মধ্যিখানে বর-কনে ও লামৃতাকে বসাল। একপ্রান্তে বসল ছেলের ভগিনীপতি ও অপর প্রান্তে বসল মেয়ের দিদি। এটা হোল আশীর্বাদ করার জন্য প্রস্তুতি।

এখন বরপক্ষ থেকে আগের দিন যে ঝুড়িটা এসেছিল সেইটাতে করে আতপচাল ও দূর্বা আসবে। ঐ ঝুড়িটি একপাশে থাকবে। ওদিকে আশীর্বাদ করার যোগ্য ব্যক্তিরা ও দর্শকবৃন্দ এই দুই দল অপেক্ষমান। আশীর্বাদকদের মধ্যে থেকে এক একজন উঠে আসবে এবং ঐ ঝুড়িটা দুহাতে তুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা আতপচাল ও দূর্বা বর-কনে ও লামৃতার মাথায় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে। প্রত্যেকে আশীর্ব্বাদ শেষে সামনে রাখা থালাতে কিছু অর্থ উপহার রাখবে। তারপর পাশে রাখা একটি বাতিতে (কেরোসিনের ডিবা) নিজের তালু দুটি উত্তপ্ত করে সেই তাপ বর-কনে ও লামৃতার দুই গালে স্পর্শ করাবে। একইভাবে উভয়পক্ষের যত জন আশীর্ব্বাদক আছে তারা সকলেই অনুরূপভাবে আশীর্বাদ করবে। এই পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগে।

এর পর শুরু হয় ভোজন পর্ব। এদের চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে গ্রামের সমস্ত লোককে কুটুমদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়ে মদ ও ভোজ খাওয়ানো। কি ছেলের বিয়েতে, কি মেয়ের বিয়েতে এই নিয়মই বহু দিন ধরে চলে আসছে। এদের গ্রামগুলি সাধারণতঃ ছোট-ছোট। খাদ্যতালিকাতেও আড়ম্বর থাকে না। সেজন্য বিশেষ অসুবিধা

দেখা যায়নি। কিন্তু আজকাল কিছু-কিছু অসুবিধা দেখা গিয়েছে। সেকথা পরে বলছি।

এই ভোজে থাকে ভাত আর "ইতু" অর্থাৎ তরকারি। আর ঐ যে খাসিটা কাটা হোল, সেই মাংস। গ্রামের লোকসংখ্যা যাই হোক, ভাগে যতটুকু পড়ে তাতেই সকলে খুশী। পেট ভরার থেকে সম্মানটাই বড। পেট ভরবার মত ভাত-তরকারির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে। বর-কনেকে কিন্তু খাসির মাংস খাওয়াবে না। তাদের আলাদা করে বসিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াবে আজ।

একটু আগে উল্লেখমাত্র করেছি যে, ভোজ খাওয়ানোর ব্যাপারে আজকাল কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেইটাই এখানে একটু বিশেষ করে বলে রাখি। বিয়েতে সামাজিক নিয়ম যেমন বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ গ্রামবাসীদের খাওয়াবে, তেমনি এও নিয়ম যে গ্রামস্থ প্রত্যেক পরিবার বিয়ে-বাড়ীতে এক কলসী মদ উপহার হিসাবে কনের বা বরের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে এরূপ লেন-দেন নিয়ম হিসাবে বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু আজকাল অনেক বিয়েতে কন্যা বা বরপক্ষ থেকে ভোজ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও সবটাই যে তাই-ই তা হলপ করে বলা যায় না। কারণ যাই হোক, এই লেন-দেন প্রচলিত থাকাকালীন বিয়ের ব্যাপারে যে সহযোগিতা, বিশেষ করে যে একাত্মতাবোধ ছিল সেইখানে ঘাটতি দেখা দিতে বাধ্য।

কোন কোন গ্রামে নাকি শোনা গেছে, যদি ভোজটাই বাদ যায় তবে মদটাই বা আমরা দিই কেন? আমরা ঘরে ঘরে মদ রাখব এবং আমাদের ঘরে বসেই মদ খাব। গত বছরে আমি নিজে এরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে শুনেছি। এরূপ মনোভাব বিস্তৃতি পেলে সাঁওতালী সমাজ-ব্যবস্থা রসাতলে যেতে বেশীদিন সময় লাগবে না। এই ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানীদের অবহিত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক দিকটার কথা আমি পরে বলছি।

ভোজ শেষে কন্যা বিদায়ের পালা। বরপক্ষ বাড়ী ফিরবার জন্য প্রস্তুত। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি বরযাত্রীদের অনেকেই যারা নিছক বরযাত্রী হিসাবে এসেছিল, অন্য কোন অনুষ্ঠানে যাদের করণীয় কিছু ছিল না, তারা কেউ কেউ রাত্রেই এবং অনেকে পরের দিন সকালেই চলে গিয়েছে। কাজেই বরযাত্রীর দল এখন ছোট হয়ে গেছে। তারা বাড়ী ফেরার তাড়া লাগাবে যাতে সন্ধ্যা হবার আগেই গাঁয়ে ফিরতে

পারে। কন্যাপক্ষও তাড়াতাড়ি বিদায়ের পালা শেষ করতে সচেষ্ট। এই পালা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি ঘটনাতে বেশ অভিনবত্ব আছে, সেইটাই এখন বলছি।

নবপরিণীতা কন্যা, স্বামী ও তার নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে তার নতুন গৃহে যাবে। চারিদিকে একটা করুণ আনন্দের হিল্লোল চলছে। এরি মধ্যে দেখা গেল কনের মা ও মাতৃস্থানীয়রা যাদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তারা একান্তে যেন কিসের জন্য অপেক্ষমানা। ইত্যবসরে বাপের দিক থেকে কন্যা এল, গেল প্রথমে মায়ের কাছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার মুখে যেন একটা কি রয়েছে। মেয়ে কি মার বুকে মুখ রেখে কাঁদছে? না। আসল ঘটনাটা হোল: মেয়ের মুখে থাকে একটি টাকা। একে ওদের ভাষায় বলে "নুনু-টাকা"। মেয়ে মায়ের স্তনটি ঠোঁট দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরবে যাতে তার মুখ থেকে টাকাটা মাটিতে পড়ে যায়। এইভাবে মেয়ে মাতৃস্থানীয়া সকলের কাছে যাবে এবং অনুরূপ আচরণ করবে। অতীতে মাতৃস্তন্য পান করার মূল্য দিয়ে গেল কি মেয়ে? জানি না। আরো একটু পরে বলছি।

অনুরূপ দৃশ্য দেখা যাবে ছেলে যখন বিয়ে করতে আসবে। রওনা হবার আগে পুত্র একটি টাকা মুখে পুরে মায়ের স্তন যখন ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরবে তখন মুখের টাকাটা মাটিতে পড়ে যাবে। এই সময় মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে: ওকাতেম চালা কানা বাবু? (কোথায় যাচ্ছ বাবা?) ছেলে উত্তর দেবে; কাসি বাগি কাতে কডমি আগু। (তোমার কাজ করতে কষ্ট হয়, তাই বৌ আনতে যাচ্ছি)।

মায়ের কাছ থেকে ছেলে তখন অপেক্ষমানা মাতৃস্থানীয়া অন্যদের কাছে যাবে এবং মুখে "নুনু-টাকা" নিয়ে তাদের প্রত্যেকের স্তন স্পর্শ করবে এবং অনুরূপ কথোপকথন হবে।*

সাঁওতালী মা কিন্তু ফুটফুটে মেয়েকে প্রশ্ন করে না। তবে ঐ সময়ে ছোট-বড় উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যে গানটি গায় সেইটিতেই মায়ের মনের কথার অনেকখানিই বলা হয়ে যায়। সেই গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি:

সাঁওতালীতে—"তিনে ঝোলচুকু ইদিমিএ্যা দুলোড়ে
আম চালা আদম লেএ্য টুইমে
দেন গো তোয়াদারি নিমুতোয়াইএ্য।

---

* হিন্দু মা পুত্রকে বলে, বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ? পুত্রের উত্তর: তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি। কনের বেলায় কনকাঞ্জলির কথা স্মরণীয়।

ভাবার্থ বাংলায়—মা কত দূরের পথ যেতে হবে তোকে
জানি না ; আমারে তুই বলে যা
মা, তোরে কি আর দিব পাথেয়
একটু বুকের দুধ খেয়ে যা।

সাঁওতাল মেয়ের মা মেয়েকে বিদায় দেবার আগে তার আঁচলে কিছু মুড়ি দেয়, মেয়ে কিন্তু সেই মুড়ি তার "করমডার" বা বন্ধুর আঁচলে ফিরিয়ে দেবে। এইভাবে তিনবার দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেলে বন্ধুর আঁচলেই সে মুড়ি থেকে যাবে। কিন্তু এই আচারকে বাক্যবন্দী করার কোন খবর আমি আজো পাইনি।

বর-কনে নিয়ে উভয়পক্ষের লোক মেয়ের গ্রাম ছেড়ে এবারে বেরোবে। মেয়ের গ্রাম থেকে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও যায়। সঙ্গে কম বয়সের ছেলে-মেয়েও দু-চার জন থাকে, কোন বাধা বা বাধ্যকতা নেই এতে। সাধারণতঃ বিশ-তিরিশ জন লোক যায়। ছেলের গ্রামে পৌঁছে গেলে সর্বপ্রথমে কুটুমের দলকে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মদ খাবে। বরপক্ষের কিশোরীরা উপস্থিত কন্যাপক্ষের সকলের পা ধুইয়ে, তেল মাখিয়ে তাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। তারপর তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোয়ালের মধ্যে চ্যাটাই পেতে বসাবে। এবারে বরের মা-বাবা আসবে। তারা কন্যাপক্ষের ছোট-বড় সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। তারপর আসবে বর স্বয়ং। সেও উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। এটা হোল প্রাথমিক অভ্যর্থনা। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি।

এরপরে শুরু হবে বরের আশীর্বাদী সভা। বর ধুতি-জামা পরে হাতে শালপাতা দিয়ে তৈরী একটি থালার উপরে এক ঘটি জল বসিয়ে নিয়ে উপবিষ্ট সকলের সামনে রেখে আবার সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান এগিয়ে এসে ছেলেকে নিজের উরুর উপরে বসাবে। একটা মার্কিন তার মাথায় বেঁধে দেবে। বর উরুতে বসার আগে এক পাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে এবং উঠে আসবার পরে আবার একপাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে। একইভাবে উপস্থিত আশীর্বাদকরা কাজ করবে এবং বরও অনুরূপ ব্যবহার করবে। তবে উপস্থিত সকলে কাপড় দিতে পারে না, তাই তারা আশীর্বাদের সময় হাতে একটি টাকা দেয়। আবার যারা টাকার থেকেও কম দেবে তারা তাদের দেয় অর্থ ঘটির জলের মধ্যে ফেলে দেবে। বর প্রত্যেককেই "ভব" বা "জোহার" করবে এবং বসতে-উঠতে একপাত্র করে মদ দেবে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হতে-হতেই রাতের খাবার সময় হয়ে যায়। কন্যাপক্ষকে পাঁঠার বা খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ানোই নিয়ম। খাওয়া শেষে আবার মদ। এরপর বিশ্রাম।

পরের দিন সকালেই আবার মদ দিয়ে আপ্যায়ন শুরু। কন্যাপক্ষের দলকে দু'বার ভাত খাওয়ানো নিয়ম। কাজেই আগের দিন যদি একবারই ভাত খাওয়ানো হয়ে থাকে তাহলে পরের দিন দুপুরে তাদের ভাত খাইয়ে, মদ খাইয়ে তবে রওয়ানা করাবে। রওয়ানা করানোর আগে অতিথিদের সকলের পায়ে ও মাথায় সরিষার তেল ও হলুদ মাখিয়ে দেবে। এর পর বর-কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষের সকলে নিজেদের গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। এই দলের সঙ্গে ঘটকি বা ঘটক অবশ্যই থাকবে।

নিয়ম অনুযায়ী বর কনে এবারে তিন দিন মেয়ের বাড়ী থাকবে। তিন দিন পরে ঐ ঘটকের সঙ্গে বর কনে ঘরে ফিরে যাবে। পাঁচ-সাত দিন পরে মেয়ের দাদা-বৌদি যাবে আনতে, মেয়ে ওদের সঙ্গে চলে আসবে বাপের বাড়ী এবারে সাত-আট দিন মায়ের কাছে মেয়ে থাকবে। এই সময়ে নিয়ম অনুযায়ী জামাই বৌকে নিতে আসবে। এবারে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে। এর পর থেকে যাওয়া-আসা নির্ভর করবে প্রয়োজন এবং পরিবারের কর্তার অনুমতিসাপেক্ষে।

এই হোল সংক্ষেপে পুরানো প্রথায় বিবাহ-ব্যবস্থা। আজও এই প্রথা মর্যাদায় অদ্বিতীয়। যে মেয়ের এই প্রথায় বিয়ে হয়েছে সে আজও আত্মগর্বে গরবিনী।*

এই বিয়ের অর্থনৈতিক দিক—

সাঁওতালদের এই বিবাহ-পদ্ধতি ঐতিহ্যগত। আজকাল এইরূপভাবে বিয়ে হওয়াটা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। বলা যায় এইভাবে ছেলেদের বিয়ে দেওয়াটা বড়লোকী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তার একটু আঁচ নিয়ে দিলাম।

প্রথমেই ধরা যাক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। উভয়পক্ষের প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাদের সকলকে খাওয়াতে হলে—শুধু বরযাত্রী এবং কন্যার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনই হবে শতাধিক। তার উপর আছে যে যার গ্রামের লোক। তাদের অন্ততঃ একটি ভোজ দিতেই হবে। এই ভোজ দিতে হলে একটি পাঁঠা বা খাসি লাগবেই।

---

* এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে মেয়ের মনে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে তার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে লেখক প্রনীত "আলেখ্য" পুস্তকে বর্নিত 'সুর্নী" চরিত্রে।

মদের অঢেল ব্যবস্থা রাখতে হয়। সে খরচও কম নয়। তারপর আছে ধুতি, শাড়ী-মার্কিন ইত্যাদি বস্ত্র। একপক্ষে শাড়ী লাগবে কমপক্ষে সাতখানি, ধুতি দু'খানি, মার্কিন পনের-ষোল গজ। আর একটি মোটা খরচ বাজনদারদের জন্য। এই দলে চার-পাঁচ জন লোক থাকবে। এদের উপস্থিতি অপরিহার্য। এদের দিতে হবে একখানা পাঁচ হাত মার্কিন, দুই থেকে তিন শলি † চাল, একটা পাঁঠা বা শুয়োর, নগদ চল্লিশটা টাকা। এগুলি বাজনদার বাড়ী নিয়ে যাবে। এছাড়া তার চার-পাঁচ জনের দলটির চারদিন খোরাকি দিতে হবে। হিসাব : মাথাপিছু এক সের চাল ; দু'বেলায় দুসের অর্থাৎ দিনে আট-দশ সের চাল। রোজ দুটি করে মুরগি এবং দু'বেলায় দুই কলসী করে হাঁড়িয়া প্রতিদিন। কনের বাড়ীর বাজনদার থাকবে দু'দিন থেকে তিনদিন। সেই অনুপাতে খরচটি কিছু কমবে অবশ্য। এছাড়াও নিকটস্থ ভাটিখানার মালিককে ছেলের বিয়েতে দিতে হবে একটি পাঁঠা, এবং মেয়ের বিয়েতে একটি মুরগি, যেহেতু সে আবগারী বিভাগের কাছে সাঁওতালদের বিয়ের জন্য ঘরে-ঘরে হাঁড়িয়া তৈরী করার জন্য ছাড়পত্র পেতে সুপারিশ করে। সাঁওতালরা এই বিশ্বাসেই শুঁড়িখানার মালিককে এই নজরানা দিয়ে আসছে।

ওদের জিজ্ঞাসা করে যা উত্তর পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে খুব টেনে-টুনে খরচ করলেও লেগে যায় হাজার খানেক টাকা। বছর খানেক আগে একজন সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলের বিয়েতে খরচ করেছে প্রায় চার হাজার টাকা। কাজেই বিবাহ যখন অবশ্য-ঘটনীয় ঘটনা এবং সাঁওতালরা প্রায় সবাই ভূমিহীন চাষী বা দিনমজুর অর্থাৎ গরীব, তখন বিবাহের বিকল্প ব্যবস্থাগুলিই যে দিন-দিন বহু প্রচলিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

এই বিকল্প ব্যবস্থা গুলির কথাই এবারে বলব।

** এক শলিতে কুড়ি সের।

* এই প্রবন্ধ রচনায় যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে বল্লভপুর ডাঙার 'মুন্নী মেঝেন'-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মানস অভীক্ষা (৪)

ঃ বুদ্ধি-পরিমাপ ঃ

দিপালী বসু *

পূর্বের প্রবন্ধগুলিতে যে সমস্ত বুদ্ধি-অভীক্ষার কথা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়সের ছেলে-মেয়ে বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষাটি (Binet-Standford Revision) অবশ্য দুই বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেও উপযোগী। তবে চার সপ্তাহ বা একমাস বয়স থেকে আরম্ভ করে খুব ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়ন করারও নানান প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক মানক (representative scale) তৈরী করা হয়েছে। তবে এর বেশীর ভাগ অংশকেই প্রচলিত অর্থে অভীক্ষা (Test) বলা সঙ্গত নয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি বা পরিবেশে শিশুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্বাভাবিক শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করে, (longitudinal study) মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচার-আচরণে কি-কি পরিবর্তন লক্ষনীয়, এগুলিকে তার একটি তালিকা (schedule) ও স্বমিতি (nozm) নির্ধারণের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

যে সব শিশুদের ছয় বছর পর্যন্ত বয়স তাদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অভীক্ষা তৈরী হয়েছে তার প্রায় সবগুলিরই প্রয়োগ একক ভাবে হওয়া দরকার। এত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষার দলগত প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সব শিশুদের সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, (১) জন্মের থেকে মোটামুটিভাবে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত। একে শৈশবকাল (infant period) বলা যেতে পারে। (২) ১৮ মাস বয়স থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত। একে প্রাক-বিদ্যালয় কাল (pre-school period) বলা যায়। এই ভাগের সঙ্গে সমতা রেখে জন্মের থেকে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের উপযোগী অভীক্ষাগুলিও সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। কতগুলি অভীক্ষা শৈশবকালের শিশুদের উপযোগী; কতগুলি আবার প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের উপযোগী। শৈশব-কালের শিশুরা সাধারণতঃ কথা বলতে পারে না। কাজেই তাদের পরীক্ষা করার সময়

* ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রী।

ভাষার ব্যবহার সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কোথাও শুইয়ে বা কারুর কোলে বসিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুরা হাঁটতে পারে, টেবিল-চেয়ারে বসতে পারে, অভীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া করতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কাজেই এদের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিষয়গত (objective)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল (Yale) শহরে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের মানসিক বিকাশের উপর নানা গবেষণার পর গেসেল ও তাঁর সহযোগীরা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম গেসেল ডেভালপমেণ্টাল সিডিউলস্ (Gesell Developmental Schedules) প্রকাশ করেন। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ৪ থেকে ৫৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য (Infant Schedule)। দ্বিতীয়টি ১৫ মাস থেকে ৭২ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। এই দুটি অভীক্ষাতেই আবার চারটি দিক থেকে শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। (১) ক্রিয়াজ আচার-আচরণ (motor behaviour) (২) প্রতিযোজক আচার -আচরণ (adaptive behaviour) (৩) মনের ভাব প্রকাশকারী আচার-আচরণ (language behaviour); (৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচার-আচরণ (Individual—Social behaviour)।

(১) ক্রিয়াজ আচার-আচরণের মধ্যে সাধারণ দেহজ নিয়ন্ত্রণ থেকে সূক্ষ্ম ক্রিয়াজ সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা, মাথার ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা, কোন জিনিষ ধরার চেষ্টা বা কোন কিছুকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখা, জিনিষ-পত্র নিয়ে নাড়া-চাডা করা ইত্যাদি আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(২) প্রতিযোজক-আচরণের মধ্যে কোন বস্তুকে ধরার উদ্দেশ্যে শিশু চোখ ও হাতের মধ্যে কতটা সমন্বয় সাধন করতে পারে তা লক্ষ্য করা। শিশুর সামনে নানা প্রকার খেলনা যেমন রং-বেরঙের কাঠের টুক্‌রা, ঝুমঝুমি ইত্যাদি নাড়া-চাডা করে শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়ে থাকে।

(৩) তৃতীয় প্রকার মূল্যায়নে মনের ভাব প্রকাশের জন্য দেখা যায় ও শোনা যায় এইরূপ সমস্ত রকম প্রচেষ্টাকেই এই ধরণের আচরণের মধ্যে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের মুখভাব (facial expression) অঙ্গভঙ্গী করা, নানা প্রকার শব্দ করা, কথা বলার ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্তই পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিশুকে অন্য কেউ কিছু বললে সে কতটা বুঝতে পারে তাও লক্ষ্যনীয় বিষয়।

(৪) চতুর্থ প্রকার মূল্যায়নে যে সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে শিশু বসবাস করে তার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। এই ধরণের আচরণের মধ্যে আছে শিশুর খাওয়া, মলমূত্র-ত্যাগ, খেলা, আয়নায় নিজেকে দেখে শিশুর প্রতিক্রিয়া, কোন লোককে দেখলে শিশুর হাসা বা অন্য কোন রকম ভাবে সাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

গেসেল (Gesell) তার তালিকায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সের শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুংখানুপুংখ বিবরণ দিয়েছেন (বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে ছবি এঁকে)। এই তালিকার সঙ্গে কোন বিশেষ শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে পরীক্ষক শিশুটির মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। অনেক সময় এ ব্যাপারে পরীক্ষককে শিশুর মায়েরও সাহায্য নিতে হয়।

প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের তালিকায় ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪, ৬০ ও ৭২ মাস বয়সের শিশুদের জন্য স্বমিতি দেওয়া আছে। তালিকাগুলি কি ধরণের তা বুঝবার জন্য নিচে ১৫ ও ৭২ মাস বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট তালিকা দুইটির উদাহরণ দেওয়া হল।

১৫ মাস বয়স

(১) ক্রিয়াজ আচরণ :—হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে শিশু কয়েক পা হাঁটতে শিখেছে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। দুটো কাঠের টুকরা সামনে দিলে একটার উপর আরেকটা সাজাতে পারে। কোন বই সামনে দিলে পাতা উল্টাতে পারে।

(২) প্রতিযোজক আচরণ :—দুটি কাঠের টুকরাকে একটার উপর আরেকটা এইভাবে সাজাতে পারে। ফর্মবোর্ডে গোল কাঠের টুকরা সহজেই বসাতে পারে।

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ :—৪ থেকে ৬টা শব্দ বা নাম বলতে পারে। অর্থহীন শব্দ (Jargon) করতে পারে। কোন ছবি দেখালে তাতে হাত চাপড়ায়। কুকুর বা নিজের জুতো ইত্যাদি দেখালে পারে।

(৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচরণ :—বোতলে খাওয়া বন্ধ করেছে। মলত্যাগের উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। নিজে প্রস্রাব করে প্যাণ্ট ভেজালে তা দেখাতে পারে। কেউ যাওয়ার সময় 'টা-টা' ইত্যাদি বলতে পারে। নিজের চাহিদার

অনেকাংশ বোঝাতে সক্ষম। নিজের খেলার জিনিষ মাকে বা অন্য কাউকে সময়-সময় দিতে চায়।

৭২ মাস বয়স

(১) ক্রিয়াজ আচরণ :—বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে ১২ ইঞ্চি উঁচু থেকে লাফ দিতে পারে। দূরে ঢিল ছুঁড়তে পারে। চোখ বন্ধ করে এক পায়ে দাঁড়ায়। দেখে দেখে ডায়মণ্ড আঁকতে পারে।

(২) প্রতিযোজক আচরণ :—কাঠের টুকরা দিয়ে তিনটা পর্যন্ত সিঁড়ি বানাতে পারে। হাত, পা, গলা, ঘাড় ইত্যাদিসহ জামা-কাপড় পরা মানুষ আঁকতে পারে। নয়টা টুকরা জোড়া দিয়ে অসম্পূর্ণ মানুষ সম্পূর্ণ করে। পাঁচরকম ওজনের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। ছবির হারানো অংশগুলি নির্দেশ করতে পারে। চারটা সংখ্যা বললে তা পুনরাবৃত্তি করতে পারে। ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতে পারে।

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ :—এই অংশটি বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার অনুরূপ।

(৪) ব্যক্তিগত—সামাজিক আচরণ :—জুতার ফিতে বাঁধতে পারে। সকাল-বিকাল, ডানদিক-বাঁদিক ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যার গণনা করতে পারে।

পরবর্তীকালে নানা গবেষণার পর গেসেলের তালিকাগুলিকে মনোবিদগণ পুরোপুরি সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। শিশু চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, নিয়মমাফিক শিশুকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন গেসেলের তালিকাগুলিকে তারই বিস্তারিত ও পরিমার্জিত রূপ বলা যেতে পারে। একেবারে শৈশব অবস্থায় শিশুদের যেসব স্নায়ু-সংক্রান্ত ত্রুটি বা দেহগত কারণে তাদের আচরণে যে সব অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায় তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষার (medical examination) প্রতিকল্প হিসাবে গেসেলের তালিকাগুলি ব্যবহৃত হয়।

ক্যাটেল (Cattell) কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-বুদ্ধি মানককে (Cattell Infant Intelligence Scale) মনোবিদগণ ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি

সন্তোষজনক হাতিয়ার হিসাবে গন্য করে থাকেন। এটিকে ১৯৩৭ সালের ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড-বিনে সংশোধিত অভীক্ষাটির (Standford-Binet Revision) L রূপের (L form) নিম্নমুখী সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে। এই মানকটি ২ থেকে ৩০ মাস বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি তৈরী করার সময় ক্যাটেল ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড-বিনের সংশোধিত অভীক্ষাটি ছাড়া গেসেলের অভীক্ষা এবং ছোট শিশুদের মানসিক-বিকাশ মুল্যায়ণের উদ্দেশ্যে—প্রচলিত অন্যান্য অভীক্ষার সাহায্য নেন। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলের অভীক্ষাটির অন্তর্গত পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট আছে। ১ বছর বয়স পর্যন্ত ১ মাস অন্তর-অন্তর, ২ বছর বয়স পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর-অন্তর এবং তার পরের বয়সের জন্য ৩ মাস অন্তর-অন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা নিদিষ্ট করা আছে। প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৫টি করে পরীক্ষা এবং ২/৩টি করে বিকল্প পরীক্ষা নিদিষ্ট করা আছে। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলির কোনটিতেই সময়-সীমা ধার্য করা নেই। ছোট শিশুরা কোন কাজ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। কাজেই সময়-সীমা নিদিষ্ট করা থাকলে অনেক বুদ্ধিমান শিশুরও মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন ঠিক মত হবে না। তবে বেশীর ভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষাগুলি দিতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে।

গেসেলের অভীক্ষা ও বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার জন্য সাধারণতঃ যে সব জিনিষ-পত্রের প্রয়োজন, ক্যাটেলের অভীক্ষাটির প্রয়োগের জন্য মোটামুটিভাবে সেইসব জিনিষ-পত্রেরই প্রয়োজন। একেবারে ছোটবয়সের শিশুদের জন্য বেশীর ভাগ পরীক্ষাগুলিই প্রত্যক্ষজ (perceptual)। যেমন, কোন ঘন্টার ধ্বনি বা কোন লোকের গলার স্বর শিশু নজর করে শোনে কিনা, সামনে কোন রিং বা ঝুমঝুমি দোলালে বা কেউ শিশুর সামনে দিয়ে চলে গেলে চোখ ঘুরিয়ে তা সে অনুসরণ করে কিনা, চামচ বা কাঠের টুকরা সামনে দিলে শিশু তা লক্ষ্য করে কিনা, নিজের হাতের আঙ্গুল দেখে কিনা ইত্যাদি। শিশু তার নিজের মাথা তুলতে পারে কিনা, নিজের হাতের আঙ্গুল নড়া-চড়া করতে পারে কিনা, এক হাত থেকে আরেক হাতে জিনিষ-পত্র নিতে পারে কিনা ইত্যাদি কয়েকটি ক্রিয়াজ (motor) পরীক্ষাও এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগুলিও ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে এবং ভাষার ব্যবহারও বাড়তে থাকে। এই স্তরে কাঠের টুকরা, বিভিন্ন প্রকারের ফর্মবোর্ড, নানা ধরণের চামচ, পুতুল ও নানা প্রকারের খেলনা পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। একটু বেশী বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এইসব খেলনা ব্যবহারের জন্য মৌখিক নির্দেশও দেওয়া হয়ে থাকে। কোন বস্তু দেখে বা কোন জিনিষের ছবি দেখালে তার নাম বলা, পরীক্ষক কোন জিনিষের নাম বললে তা ছবিতে খুঁজে বার করা ইত্যাদি পরীক্ষাগুলিও একটু বেশী বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

এই অভীক্ষাটির মূল্য-স্থিতি পদ্ধতি (Scoring method) অনেকটা বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার অনুরূপ। প্রত্যেকটি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সাফল্যাঙ্ক দেওয়া আছে। বিনে-ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলও মূল বয়সের (basal age) ব্যবহার করেছেন। মূল বয়সের সাথে শিশু অন্য যে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল তার সাফল্যাঙ্ক যোগ করে মনোবয়স (mental age) নির্ণয় করা হয়। তারপর একে বুদ্ধ্যাঙ্কে পরিণত করা হয়।

১৯৫০ সালের পর থেকে ছোট ও প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের মানসিক বিকাশের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নানারূপ অভীক্ষা প্রণয়নের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এর প্রধান কারণ মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুদের বিশেষ শিক্ষার উপর এই সময় থেকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কাজেই এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য পুরানো অভীক্ষাগুলির নতুন করে সংশোধন করা হয় এবং আরও নতুন অভীক্ষার প্রচলন হয়।

প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের জন্য মেরিল-পামার মানস অভীক্ষাটি (Merrill Palmer Scale of Mental Test) ১৯৩১ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্ত্তমানে এটির বিস্তৃত সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভীক্ষাটি ১০ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী। এতে ৯৩টি পরীক্ষা সহজ থেকে কঠিন এই ভাবে সাজানো আছে। এই পরীক্ষাগুলি নির্ধারণ করবার সময় শিশুদের আগ্রহের উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারণ পরীক্ষার ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ বজায় রাখা একটা মস্ত বড় সমস্যা। তবে মেরিল পামারের মূল অভীক্ষাটির একটা মস্ত বড় ত্রুটি হ'ল যে এতে সময়-সীমার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে যেটা শিশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।

একেবারে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষা-প্রয়োগে এবং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয়ের সময় নানা রকমের সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ শিশুদের অল্প সময়ের মধ্যেই কোন জিনিষকে একঘেয়ে লাগে। অনেক সময় ঘুম পায়। কেউ-কেউ আবার নানারকম ভয় পায়। কেউ আবার খুব লাজুক, পরিচিত লোকের সামনেই যেতে চায় না, একটা জিনিসের উপর তারা বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারে না। কাজেই এই সব শিশুদের পরীক্ষার জন্য পরীক্ষককে দক্ষ ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। পরীক্ষার পূর্বে শিশুর সঙ্গে পরীক্ষকের অন্তরঙ্গতা (rapport) স্থাপন করতে হবে। ঠিক মত অন্তরঙ্গতা স্থাপন

করতে না পারলে পরীক্ষার ফলও সঠিক হবে না। তা ছাড়া এই সময়ে পরীক্ষার সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা বিশেষ করে একেবারে ছোট শিশুদের বেলায় অনেক সময় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ছোট শিশু:দর পরীক্ষা করার সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্য থাকে (১) পরীক্ষার সময় শিশুর মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করা, এই মুল্যায়নের ভিত্তিতে তার ভবিষ্যতের মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে পুর্বসংকেত করা। তবে অধিকাংশ মনোবিদ্ই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের পরীক্ষা করে কোনরূপ সঠিক ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব নয়, যদি না ঐ বয়সের গড় শিশুর থেকে শিশুর আচরণ যে কোন দিকে (খারাপ বা ভালো) বেশী রকম পার্থক্য না থাকে। প্রাক্-বিষ্ঠালয় স্তরের শিশুদের পরীক্ষা করে তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন রূপ পুর্বসংকেত করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও মনোবিদ্গণ একমত ন'ন। তবে একেবারে ছোট শিশুদের তুলনায় এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিক সাফল্যের সঙ্গে বলা সম্ভব। সব ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক ভবিষ্যত পুর্ব-সংকেত করা সম্ভব না হলেও পরীক্ষার সময় শিশুর মানসিক বিকাশের একটা মোটামুটি ধারণা দিতে প্রচলিত অভীক্ষাগুলির মুল্য কম নয়।

শিশু-সম্পর্কিত প্রবাদ-প্রবচন

রমেশ দাশ *

বিভিন্ন দেশে বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। কে কবে প্রবাদগুলি রচনা করেছিল তা কেউ জানে না। Encyclopaedia Britannica (Vol. 18) এবং Encyclopaedia of the Social Sciences (Vols. 9 &10) গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে প্রবাদগুলির উৎস সন্ধান করা নানা কারণেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রবাদগুলির প্রাচীনত্ব, তাদের ক্রমান্বয় পরিবর্তন, পুরাতন প্রবাদকে কেন্দ্র করে নূতন প্রবাদের উদ্ভব—গবেষণার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদগুলি ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত নয়, সেগুলি গণ-মনের ফসল, বহু মানুষের যুগ্ম-চিন্তার (Collective Thinking) ফলশ্রুতি; তাদের ভিত্তি জনসাধারণের যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা। যুগ-যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করে, পরখ করে, মানুষ যে সত্য উপলব্ধি করেছে তাই সে প্রকাশ করেছে প্রবাদ-প্রবচনের আকারে, ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে-মুখে প্রবাদগুলি চলে এসেছে, কেউ-কেউ তাদের রূপ বদলেছে, নতুন-নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তারপর মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর তারা লিপিবদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যে স্থায়ী আসর লাভ করেছে। আজও নূতন-নূতন প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বড-বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি ধীরে-ধীরে প্রবাদের মর্যাদা অর্জন করছে, কত অখ্যাত মননশীল মানুষের উক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের নিজস্ব আবেষ্টনীর সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে-ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়ে চলেছে কেউ তার খোঁজ রাখছে না।

The Oxford Dictionary of English Proverbs এবং The Oxford Dictionary of Quotations প্রবাদ-প্রবচনের দুটি মহামূল্য সংকলন গ্রন্থ। বিচিত্র বিষয়ের উপর অজস্র প্রবাদ ও প্রবচনের এই সংগ্রহ ও সমন্বয়চেষ্টা শুধু প্রশংসার্হ নয়, রীতিমত বিস্ময়কর। বর্তমান নিবন্ধে শিশুসম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ ও প্রবচন এই দুটি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য

---

* অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ)

সুস্পষ্ট। মনোবিদ্‌গণ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে যে সত্য আবিষ্কার করেছেন প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে তারই প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের প্রধান কারণ প্রবাদ-প্রবচনগুলি হঠাৎ গড়ে ওঠেনি;—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই, অর্থাৎ সুদীর্ঘ সযত্ন পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পুনঃ-পুনঃ পরখ (Verification)-এর ভিত্তিতেই তাদের সৃষ্টি।

সত্যিকারের ভালবাসার অনুভূতি আপন সন্তানকে কেন্দ্র করেই মানুষ লাভ করতে পারে। পশু-পাখী মানুষের ভালবাসা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যতটুকু বোঝে তাও প্রকাশ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া ভালবাসার সার্থক বিনিময় সমগোত্রের মধ্যেই সম্ভব। বড়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তাই দুজন বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ হওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শিশুর কমনীয় নির্ভরতা, বিশেষ করে আপন সন্তানটির ক্ষেত্রে, তার প্রতি বড়দের ভালবাসাকে উৎসারিত করে। মাতাপিতার ভালবাসা শিশু স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অজস্র ভালবাসা দিয়ে তাঁদের নন্দিত করে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত ভালবাসা যে কী তা আমরা বুঝতে পারি। তাই বলা হয়েছে—He that has no children knows not what is love. এই কথাটিই আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নীচের প্রবচনটিতে—

So for the mother's sake the child was dear,
And dearer was the mother for the child.

মাতাপিতার ভালবাসা শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এই ভালবাসা যদি অন্ধ হয়, যদি অসংযত হয়, তাহলে তা শিশুর চরিত্রে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাকে বিপথগামী করবে, এমন কি কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হতে পারে। A child may have too much of his mother's blessing (Mothers are oftentimes too tender and fond of their children who are ruined and spoiled by their cockering and indulgence) ; Love is a boy, by poets styl'd, then spare the rod, and spoil the child এবং Go practise if you please with men and women : leave a child alone for Christ's particular love's sake ! So I say—এই ধরণের প্রবাদ-প্রবচনগুলির এটাই মূল বক্তব্য।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বর্তমানের মধ্যেই নিহিত থাকে। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতে সে কেমন হবে তার আভাস পাওয়া যায়।

শিশুকে ঠিক ঠিক মতো পরিচালনা করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। The child is father of the man; the childhood shows the man, as morning shows the day, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু পরিচালনার গুরুত্বের ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করছে।

শৈশবকালই অভ্যাস গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকুল সময়। এ সময় মনটি থাকে কোমল, সংবেদনশীল, এবং গ্রহণক্ষম। তার বিচারশক্তি অপরিপক্ব থাকে বলে শিশু যে সব বয়স্কদের ভালবাসে তাদের নির্দেশ নির্বিবাদে মেনে চলবার চেষ্টা করে। তাই বড়দের উচিত এই সময়ই শিশুদের মধ্যে উপযুক্ত অভ্যাস এবং মনোভঙ্গির সৃষ্টি করা শৈশবে মানুষ যে রকম শিক্ষালাভ করে সারা জীবনে তার প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। এই জন্যই মনঃ-সমীক্ষকগণ জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পণ্ডিত-প্রবর চাণক্যের "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"—উপদেশটির তাৎপর্যও তা-ই। Give me a child for the first seven years, and you may do what you like with him afterwards এবং Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it—এ দুটি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমরা সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

Children pick up words as pigeons peas, and utter them again as God shall please—এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর বিস্ময়কর অনুকরণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। শিশু বড়দের অনুকরণ করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শুধু ভাষাই শিক্ষা করেনা; আচার-আচরণ, হাব-ভাব, চিন্তার ধরণ-ধারণ প্রায় সব কিছুই আয়ত্ত করে থাকে। সুতরাং শিশুর সঙ্গে বড়দের আচরণ যথেষ্ট সংযত ও সুন্দর হওয়া দরকার। এই প্রবাদটির অন্যতম তাৎপর্যটি হলো শিশুর সরলতা। সে যা শোনে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করবার ক্ষমতা তার থাকে না বলে সহজেই তা প্রকাশ করে ফেলে। সুতরাং শিশুদের সম্মুখে গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা করা সঙ্গত নয়। What children hear at home soon flies abroad এবং Children and fools cannot lie—এই দুটি প্রবাদ বাক্যের বক্তব্যটিও অনুরূপ।

শিশু সদানন্দময়। সামান্য জিনিসেই সে তৃপ্ত। Children and fools have merry lives; Behold the child, by nature's kind law, pleased with a rattle, tickled with a straw, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু-চরিত্রের এই সহজ সন্তুষ্টির দিকটি তুলে ধরেছে।

When children stand quiet, they must have done some ill—এই প্রবাদ-

টির মধ্যে শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অবিরল চঞ্চলতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শিশু এক মুহূর্তও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। তার মধ্যে বিকচমান অজস্র 'প্রেরণা' তাকে সর্বদা চঞ্চল করে রাখে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখলেই বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই কোন একটা নিষিদ্ধ কর্ম করে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

Around the child bend all three sweet graces ; Faith, Hope, Charity.

Around the man bend other faces, Pride, Envy, Malice, are his graces—শিশু সহজে বিশ্বাস করে ; আশা পোষণ করে ; তার আসক্তি কম, তাই এ মুহূর্তে যে বস্তুটার জন্য সে ব্যাকুল, পর মুহূর্তেই সেটার প্রতি তার মোহ আর থাকেনা। সে যতই বড হতে থাকে ততই তার মধ্যে অহমিকা, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। বড হবার সঙ্গে-সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিস্তার ঘটে, কিন্তু সরলতা হ্রাস পায়। তাই বলা হয়—In wit a man ; simplicity a child.

বডদের আবেগ-জীবনে শিশুদের স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সান্নিধ্য আমাদের মনের গুরুভার লাঘব করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে। Home they brought their warrior dead কবিতায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে কীর্তিত হয়েছে। মৃত যোদ্ধাকে দেখে শোকাকুলা পত্নী যখন বেদনায় নিস্পন্দ, নির্বাক তখন একমাত্র আপন সন্তানকে দেখেই অজস্র অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর মনের স্বাভাবিক অবস্থা। তাই একটি প্রবচনে বলা হয়েছে—In sorrow thou shalt bring forth children.

"ভাবি যা হারিয়ে গেছে হারায়নি তা"—যে শৈশব আমরা দূর অতীতে ফেলে এসেছি তার প্রভাব, তার সুখ-স্মৃতি আজও আমাদের মধ্যে অক্ষুন্ন। তাই কবি বলেছেন—

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky ;
So it was when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old,
Or let me die !

শৈশব-স্মৃতি, শৈশবের রুচি, শৈশবের সুখ সারা জীবনের অমূল্য সম্পদ ; আমাদের

অবকাশ মুহূর্তগুলিকে, আমাদের একান্ত নিজস্ব দুনিয়াটিকে তারা মধুময় করে রাখে। তাই শৈশবকে আমরা ভুলতে চাইনা, ভুলতে পারি না।

আজকের সদা চঞ্চল আনন্দময় শিশুটি কালক্রমে বড় হয়ে জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হবে একথা চিন্তা করে কবির আক্ষেপের অন্ত নেই। ব্যথিত চিত্তে তাই তিনি খেদোক্তি করেছেন—

Child of a day, thou knowest not
The tears that overflow thy urn.

কিন্তু সব কিছুরই ভালোমন্দ দুটো দিক আছে। শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে মাতা-পিতার আনন্দ বিস্তার লাভ করে যেমন, তেমনি স্নেহান্ধ মাতা-পিতার প্রশ্রয় লাভ করে শিশু যখন বড হয়ে বদ মেজাজী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন মাতা-পিতার দুর্ভোগের আর লেখা-জোখা থাকে না। এই রকম অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একটি প্রবাদের—Children when they are young make parents fools, when they are great they make them mad. অতএব সন্তান-লালনে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন।

ফ্রয়েড—শিক্ষক ও বন্ধু

হ্যানস্ স্যাক্স

অনুবাদিকা :—

পুষ্পা মিশ্র *

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ফ্রয়েডের কোন গোপন কুকর্ম অথবা এ যাবৎ অজানা কোনো দোষকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করার সৌভাগ্য আমার হবে না। অবশ্য অনেকেই এ আশা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন নি যে, যে মানুষটির চিন্তাধারা ও তত্ত্ব রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছে, যাঁর নামটাই তাঁদের সুকুমার নৈতিক-চেতনাকে অপমানিত করার পক্ষে যথেষ্ট—তাঁকে নিশ্চয়ই কোন একদিন অত্যন্ত উত্তেজক যৌনতামূলক কার্য-কলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যাবে। এতদিন ধরে তাঁরা প্রায় নিষ্ঠুর রূপেই নিরাশ হয়েছেন এবং বর্তমান গ্রন্থ বা অন্য কোন সত্যভিত্তিক গ্রন্থ তাঁদের এই দুঃখ প্রশমিত করতে সাহায্য করবে না। আমি আপনাদের সম্মুখে শুধু কতকগুলি চারিত্রিক প্রলক্ষণ তুলে ধরব—এমন প্রলক্ষণ যেগুলো তাদের অসাধারণ্ মানবিকতার জন্য কোন গল্প-বইয়ের বিষয়-বস্তু হতে পারে না ; এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেগুলির সাহায্যে একটি নির্জীব ছবি আর একটি প্রকৃত মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য হবে। বস্ওয়েলও তো তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এমন কোনো তথ্য প্রকাশিত করেন নি, যার দ্বারা আমরা ভাবতে পারি যে জনসন কখনও খুন করেছিলেন, অথবা যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমি ফ্রয়েডকে কখনও study করি নি এবং তাঁর মনকে কোন সুসম্বদ্ধ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু রূপে চিন্তা করি নি। তাঁর জীবিতকালে এটা আমার নিজের কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছে এবং এখন তাঁর মৃত্যুর পরেও আমার তাই মনে হয়। যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, "আপনি তাঁর সম্বন্ধে কি জানেন?" অথবা, "যে অন্তর্দৃষ্টি আপনি অর্জন করেছেন, তার মূল্য কি?" —তাহলে আমি তাঁদের বলব, "আমি বিশ্বাস করি যে, যে অসাধারণ অনুকূল সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি। আমাদের সম্পর্কের কালগত পরিধি প্রায় তিরিশ

---

* মনঃসমীক্ষিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়া।

বছর, এবং এই সময়ের মধ্যে আমি প্রথমে তাঁর ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলাম, পরে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছি, তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির একজন রূপে পরিগণিত হয়েছি, তাঁর গৃহের একজন নিয়মিত অতিথি হয়েছি এবং সর্বশেষে তাঁর collaborator এবং সঙ্গী হয়েছি এবং এই সমস্ত সময়টুকু ধরে, তিনি আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন। এটা কি যথেষ্ট নয় ?"

আমার তো যথেষ্ট বলেই মনে হয়—অবশ্য যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়। পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ এবং সেগুলিকে সদ্ব্যবহার করার পূর্ণতম ইচ্ছাও কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণ উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু একটি সৃষ্টিশীল মন, যেখানে অস্বাভাবিক শক্তিগুলি বিস্ময়কার ফলোৎপাদনে নিরত—তার গ্রন্থিমোচনে মনোবিজ্ঞানীরাও সাধারণ মানুষের মতই অসহায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় সহজাত ক্ষমতার গোপন প্রবৃত্তিগত দক্ষতার। এই দক্ষতা ফ্রয়েডের বহুল পরিমাণে ছিল। মনঃসমীক্ষণের পথে অগ্রসর হওয়ার বহু পূর্বেই, তাঁকে নিশ্চিত রূপে সহজাত মনোবিজ্ঞানীরূপে গণ্য করা যায়। তাঁর case history গুলি, 'প্রবৃত্তি' 'গূঢ়ৈষা' বা 'অবদমনে'র সমষ্টিমাত্র নয়। তাদের বিষয়ীরা সত্যকার, প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ-রূপেই আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। মহৎ কোন শিল্পীর রচিত চরিত্রের মত, আমরা যেন পৃথকরূপে তাদের চেহারা এবং অনুভূতির প্রকাশ মানসচক্ষে দেখতে পাই ; তাদের অভ্যাস এবং ধরণ-ধারণ, তাদের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা ও ঘৃণা, আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল দাবী করে। শিল্পী এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে এই নিকট সাদৃশ্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক অথবা বিস্ময়জনক নয়। লেখকের দ্বারা কোন নতুন চরিত্র সৃষ্টি এবং মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা সেই চরিত্রগুলিকে প্রকৃত মানুষের ছাঁচে ফেলে পুনরায় সৃষ্টি করা —দুটিরই উৎস মূলতঃ একই। সুতরাং বলা যায় যে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী অথবা জীবনীকারকে বিজ্ঞানী যেমন হতে হবে, তেমনি শিল্পীও হতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পী হলেও চলবে না—তাহলে ক্ষুদ্র লেখক—যাঁরা মনস্তত্বের শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন—তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য থাকবে না।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ছবি আঁকতে গিয়ে ফ্রয়েড-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা—তাঁর শিষ্যের প্রতি কঠিন আদেশ। যাই হোক, আমি আমার ক্ষমতা অনুসারে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রলক্ষণগুলি সংগ্রহ করার এবং বিধিবদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহারের স্মৃতি আমি অনায়াসে মনে আনতে পারি ; তিনি কখন কি বলেছিলেন, বা কোন্ পরিস্থিতিতে কি করেছিলেন, শিক্ষক-

রূপে, লেখক রূপে, আবিষ্কারক ও কথোপকথনকারী রূপে, পিতা এবং স্বামী রূপে—তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে অথবা অপরিচিতদের সঙ্গে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন, তা আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এইভাবে তাঁর একটি স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করে, ঈশ্বর যদি সদয় হন, তাকে প্রাণময় করে, লোকসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ চিত্র আবর্জ্জনা স্তূপে পড়ে-পড়ে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের খনন-কার্য্যের প্রতীক্ষায় থাকবে। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, যে-উপাদানের চাবিকাঠি আমার হস্তগত, তা সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য এবং ভবিষ্যতে কোন না কোনরূপে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত।

বর্ত্তমানে, তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, আমি কি তাঁর জীবিতাবস্থার তুলনায় অধিকতর স্বাধীন, বা তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়েছি? আমি তা মনে করি না এবং কামনাও করি না—যদিও তা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হত—অবশ্য এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। বিশেষ এবং ব্যক্তিগত অর্থে নিজেকে তাঁর শিষ্য মনে করার কিছুকাল পরেই, আমি তাঁর প্রতি আমার ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নিশ্চিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এইগুলিই আমার স্বাধীনতার সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে এবং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কালে আমি কখনও সে সীমার উল্লঙ্ঘন বা বিস্তার ঘটাই নি। আমি ঠিক করেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আমি বৈজ্ঞানিক মনোভাব বজায় রাখব এবং শুধুমাত্র ফ্রয়েড বলেছেন বলেই কোন কিছু স্বীকার করব না—কিন্তু আমি আমার মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখব এবং তাঁর মতামতগুলি প্রথম দৃষ্টিতে যতই বিস্ময়জনক ও আকস্মিক বলে মনে হোক না কেন—সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করব। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর মতামতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপেই নিশ্চিত হয়েছিলাম—এবং আমি মনে করি না যে এই নিশ্চয়তা আমার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার অভাব সূচিত করে। মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান এবং এমন একটি তত্ত্বও নেই যেখানে আমি তাঁর মতের প্রত্যক্ষ বিরোধী। অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি তাঁর অনুসরণ করি নি, তার কারণ আমাদের মানসিকতার (temperament) পার্থক্য। তিনি প্রায়ই আমার আশাবাদিতা (optimism) নিয়ে ঠাট্টা করতেন এবং একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তিনি তাঁর জামাতা এবং আমার সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় আহার করেছিলেন, তখন মন্তব্য করেছিলেন, "আজ আমি ভিয়েনার সবচেয়ে বড় আশাবাদী এবং সবচেয়ে বড় নৈরাশ্যবাদীর সঙ্গে আহার করেছি।" কিন্তু যদি তাঁকে নিজেকেই নৈরাশ্যবাদী বলতে হয়, তাহলে বলব, তাঁর নৈরাশ্যের সঙ্গে কখনও কোন অভিযোগ যুক্ত হয়ে ছিল না।

কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে (practical matters) আমার মনোভাব সম্পূর্ণ আলদা ছিল। আমি মনে করতাম, তর্কাতর্কির বিরক্তির হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া বেশী প্রয়োজনীয়। যদি আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের বিরোধিতা ঘটত—আমি নিঃসঙ্কোচে তা ব্যক্ত করতাম। তিনি সব সময়ই আমায় মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ আমায় দিতেন এবং আমার যুক্তি-তর্কগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই সেগুলির দ্বারা বিচলিত হতেন না। তারপরে আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে, সমস্ত যুক্তি-তর্ক ত্যাগ করে, তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করতাম। কোন-কোন ক্ষেত্রে, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী বলে যে-মতবাদ আমি ত্যাগ করেছি. পরে সেটাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু অকারণ যুক্তি-তর্কের ফলে যে সময়টুকুর সাশ্রয় হল—তার জন্য আমি এই ভুলগুলি স্বীকার করে নিতাম। আমি জানতাম যে, তিনি যে-দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য পন্থায় নিজের মতবাদে উপনীত হয়েছেন, সে জটিলতার সঙ্গে অন্যের মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটানো তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। আমার মনে হয়, মহৎ আবিষ্কারকদের ধরণই বোধ হয় এইরূপ।

আমি ভণ্ড বা বিনয়ী না সেজে, যথার্থ সত্য তুলে ধরতে চাই। কিন্তু যেহেতু আমি সুখকর ও অসুখকর—সব রকম তথ্যই প্রকাশিত করতে চাই—আমায় পূর্বাহ্ণে একটি স্বীকারোক্তি করতে হবে। এই স্বীকারোক্তি অপেক্ষা স্বকৃত কোন কুকর্মের স্বীকারোক্তি, আমার অহংবোধ ও স্বকাম (self-love) এর পক্ষে কম পীড়াদায়ক হত। কিন্তু যদি এই তথ্যটি প্রকাশিত না করি, তাহলে আমি যা বলতে চলেছি তার সমস্তটুকুই অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন এবং অজুহাতের কালিমাযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হলে, আমার কাজ আমি ইচ্ছানুকুল ভাবে করতে সক্ষম হব না।

আমার স্বীকারোক্তিটি এই : আমি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিশ্বাস করি যে, ফ্রয়েড যে-সকল গুণগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতেন, তার কয়েকটি তিনি আমার মধ্যে পান নি। আমাদের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তার মধ্যে একটা কিছুর অভাব ছিল—এমন একটা কিছু যা একই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তরঙ্গতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমি এখানে আমাদের বৌদ্ধিক স্তরের পার্থক্যের কথা বলছি না; অথবা যে-বিশাল ব্যবধান সাধারণ-মন থেকে প্রতিভাবান-মনকে পৃথক করে, তার কথাও বলছি না। এই ব্যবধান সম্পর্কে আমি সর্ব্বদা সচেতন ছিলাম, এবং এই ব্যবধানকে আমি শিক্ষক এবং চিরন্তন শিষ্যের সম্পর্কের অপরিহার্য্য

অংশরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই বিশিষ্ট গুণাবলী—যা আমার ছিল না—তিনি অন্যের মধ্যে পেয়েছিলেন এবং তাঁরাও আমারই মত তাঁর শিষ্যের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন : ফেরেঞ্জী (Ferenczi) ও এ্যাব্রাহাম (Abraham) এবং নিশ্চিতরূপে র‍্যাঙ্ক (Rank) (যতক্ষণ পর্য্যন্ত না র‍্যাঙ্কের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে)। পরবর্ত্তীকালে, হয়ত অধিকতর মাত্রায়, তিনি এইগুলি তাঁর কন্যা অ্যানার মধ্যে পেয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে কখনও কোন কথা বলেন নি, কোন সুদূরতম ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন নি ; যাঁরা তাঁর নিকটতম, তিনি কখনও তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ন করতেন না অথবা কোন পক্ষপাত প্রদর্শন করতেন না, কিন্তু আমাকে তিনি যে-স্থান দিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ প্রণিধানযোগ্য নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও নিজেকে তাঁর অন্তরঙ্গদের পর্য্যায়ে ফেলাটা বিস্ময়জনক মনে হবে। তবু নিঃসন্দেহে আমি তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলাম। তিনি ছাপার অক্ষরে এবং তাঁর লেখায়, সর্ব্বসমক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাঁর বন্ধু বলে স্বীকার ও সম্বোধন করেছেন, এবং বহু ব্যাপারে আমার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা প্রদর্শিত করেছেন। এর কারণ প্রদর্শনের পক্ষে সম্ভবতঃ আমি যোগ্য ব্যক্তি নই, তবে কয়েকটি বোধ হয় আমি তুলে ধরতে পারি। মনঃসমীক্ষণ যখন সকলের আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল, এবং যখন মনঃসমীক্ষণকে মানসিক বা যৌন অথবা দু'রকম বিকৃতিরূপে গণ্য করা হত—তখন যাঁরা মনঃসমীক্ষণের রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতি ফ্রয়েডের অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল—প্রায় বলা যায়, তাঁদের প্রতি তাঁর মনে. এক 'নরম স্থান' ছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন মন:সমীক্ষণ লাভজনক ও ফ্যাশানেবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের প্রথমে নিজেদের যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল—"inner circle"টি সম্পূর্ণরূপে পূর্বেকার বন্ধুদের নিয়েই গঠিত ছিল।

যখন ভাঙ্গন ও গোপন দলাদলিশুরু হয় তখন আমার পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা তাঁর নিকটে অত্যধিক মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছিল। "বিজ্ঞানের স্বাধীনতা" বা অনুরূপ বিরাট-বিরাট শব্দে আবরিত ক্ষুদ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির তুলনায়, আমি নিজেকে তাঁর শিষ্যরূপে পরিগণিত করা শ্রেয়স্কর মনে করেছি বলে তিনি যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, বৌদ্ধিক সততায় উপনীত হবার আমার প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং এই আস্থার ফলেই তিনি আমার প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তৎসহ যুক্ত কিছু শিশুসুলভ আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখতে পেরেছিলেন। আমার পড়া-শুনার পরিধি তাঁর মত এত বিশাল না হলেও, আমাদের গোষ্ঠির সাধারণ সভ্যদের তুলনায় অধিক প্রসারিত ছিল এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর ও আমার আগ্রহ ও কৌতূহল একই ধরণের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গে তিনি শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসের কিছু-কিছু প্রায় অজানা পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। আমার জ্ঞানের সুসম্বদ্ধতা ও বিধিবদ্ধতার অভাবজনিত ত্রুটি আমি আমার প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গমের দ্রুত ক্ষমতা দিয়ে অনেকাংশেই

পূরণ করে দিতে পারতাম। আর প্রথম দিককার সেই অবহেলা ও একাকীত্বের দিনগুলির কথা যদি বলতে হয়—তাহলে বলব যে অন্ধদের মধ্যে কানা-ই রাজা হয়ে বসেছিল।

আশাকরি, আমি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছি, যে আমার কোন কথা বা কাজ তাঁর আর আমার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। হয়ত আমি কখনও-কখনও তাঁর রাগ বা বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়েছি—কিন্তু তিনি জানতেন যে আমি কখনও সচেতন-ভাবে তাঁকে আঘাত দেবার জন্য কিছু করি নি। অতএব, তিনি সর্বান্তঃকরণে আমাকে ক্ষমা করেছেন। কেবলমাত্র একবার আমি ইচ্ছে করে, ক্রমাগত এমন একটি কাজ করেছিলাম যা তাঁর মনঃপূত ছিল না। কাজটি প্রায় শেষ হয়ে যাবার সময়, তিনি তাঁর মনোভাব আমায় জানিয়েছিলেন—মাত্র তিন-চারটি শব্দে অত্যন্ত মৃদুস্বরে, প্রায় স্বগতোক্তির মত। এই শব্দগুলি গভীর ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে—একমাত্র কঠোর শব্দ, একমাত্র তিরস্কারপূর্ণ ভাষা যা আমার প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি শেষ হয়ে যাবার পরে, তিনি আমায় ক্ষমা করতে না পারলেও ঘটনাটি ভুলে যেতে পেরেছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁর মনোভাবে এর ফলে কোন স্থায়ী পরিবর্তন আসে নি। আজও আমি এই ঘটনাটির কথা লজ্জিত না হয়ে ভাবতে পারি না—কিন্তু আমার একটি সান্ত্বনা আছে—যে সারা জীবনে একবার—পঁয়ত্রিশ বছরে মাত্র একবার আমি তাঁর তিরস্কারের পাত্র হয়েছি, তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছি—খুব খারাপ রেকর্ড নয়।

সমস্ত বন্ধুত্ব, উৎসাহ এবং আস্থার মধ্যেও আমি আমার যে অভাবটির অস্তিত্ব অনুভব করতাম, তা প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক—আমি যা পারি নি, বা আরও সহজভাবে বলতে গেলে, আমি যা ছিলাম না—তার উপরে ভিত্তি করেই এই অভাববোধটি গড়ে উঠেছিল। আমার চরিত্রে কতকগুলি গুণের অভাবের প্রতি ফ্রয়েডের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল—তার দ্বারা অন্যান্যদের তুলনায় আমাকে অনেকটা পৃথকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এঁরা অন্যের মধ্যে সে গুণের যথোচিত মর্যাদা দিতেন। অবশ্য, এই গুণগুলি কি—তা ব্যাখ্যা করতে আমি বাধ্য নই। অনুতাপ ও আত্ম-অবমাননার জলন্ত উদাহরণ-রূপে এখানে নিজেকে উপস্থাপিত করতে আমি কণামাত্র ইচ্ছুক নই। "The disciple who leaned on the Lord's breast" রূপে নিজেকে তুলে ধরতে আমি চাই না।

(ক্রমশঃ)

ধৈষণা

তরুণচন্দ্র সিংহ *

কালোবাজারী, চোরাই, মুনাফা বাদ ও কর ফাঁকিদারদের বিরুদ্ধে সরকার যে বেশ তোড়জোড় করিয়া কাজে নামিয়াছেন এই খবর প্রায় প্রতিদিনের সংবাদ পত্রেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। নানা স্থানে নাকি বহু ঐ শ্রেণীর লোকেদের গ্রেপ্তার করা ও তাহাদের মজুত অবৈধ তৈজসপত্র ও সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করিবার খবরও পাওয়া যাইতেছে। দেশের জনসাধারণ ইহাতে আনন্দিতই হইবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য-হ্রাস ও ঐ সকল সমাজদ্রোহীদের ছদ্মবেশে পুনরাবির্ভাব যাহাতে না ঘটে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি সরকারের থাকা দরকার। কেবল তাহাতেই সুফল ফলিবে না। যতদিন জনসাধারণ জাগ্রত হইয়া এই সকল অহিতকর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইবে, ততদিন কেবল আইনের সাহায্যে এই অপদেবতার বিলোপ সাধন সম্ভব হইবে না। এই জাতীয় অকল্যাণ সমাজ হইতে দূর করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণের মিলিত চেষ্টা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সরকারের ব্যবস্থায় কিছুদিনের জন্য হয়ত এই দোষ চাপা থাকিতে পারে কিন্তু কিছু দিন পরেই আবার বিভিন্ন আকারে তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইবে। এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, দেশে সরকার আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত সরকার। সুতরাং মূলতঃ আমরাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। অবশ্য একথাও সত্য যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই যাহা খুশি তাহাই করিতে পারি না। অন্য বহু বিষয়ের বিচার-বিবেচনা ইহার সহিত যুক্ত থাকে। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নহে।

আমরাই যদি বহুলাংশে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হই তবে সমাজ জীবনে এই সব অকল্যাণ আসে কোথা হইতে? আমরা নিজেরাই কি তবে এই সমাজ বিরোধী অকল্যাণ চাই? এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, হাঁ। এই সহজ উত্তরটা স্বীকার করিতে আমাদের গর্বিত উন্নত সভ্যতাভিমানী মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক। তবু সত্যকে অস্বীকার করিলেই তাহা অসত্য হইয়া যায় না।

বিষয়টা আরেকটু খুলিয়া বলিলে বুঝিতে সহজ হইবে এবং হয়ত তখন আঘাতটাও এত প্রবল বোধ হইবে না। নানা বিষয় আলোচনা করিবার সময় বহুবার আমরা

---

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

বলিয়াছি যে, মানুষের মনের একদিকে যেমন উন্নতি করিবার, সৎ হইবার, সভ্য হইবার তাগিদ আছে, অন্যদিকে আবার আমাদের মনেই এমন কতকগুলি আদিম বৃত্তি আছে যেগুলি অনিবার কেবল তাহাদের পুরণের সুখের জন্য ছটফট করিতে থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের মনের বাস্তব বোধ, আমাদের নৈতিক বোধ, আমাদের স্বাদর্শ লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি আমাদেরই অপর নানা বোধগুলি ঐ আদিম বৃত্তিগুলির পুরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই দুই মানস-শক্তির প্রভাবে এক নূতন গ্রহণযোগ্য পন্থা নির্দ্ধারণের চেষ্টা আমাদের মনে চলিতে থাকে। বৃত্তিগুলিকে হত্যা করা সম্ভব হয় না। সব বৃত্তি যদি সম্পূর্ণ অবদমিত হইয়া যায় (যাহা কথনই হয়না) তবে আমাদের জীবন অচল হইয়া যাইবে, বাঁচিয়া থাকাই তথন সম্ভব হইবে না। সুতরাং বৃত্তিগুলির নিধন কাম্য হইতে পারে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ দেওয়াও যাইতে পারে না। এই বিরোধের মীমাংসার উপর ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। একটা উদাহরণ দিয়া বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আক্রমবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিকে যথেচ্ছ কাজ করিতে দিলে ব্যক্তির জীবন তথা সমাজ বিপন্ন হয়। ইচ্ছা মত রাগ হইলেই অপর পক্ষকে হত্যা করা যায় না। তেমন আচরণ সমাজের দৃষ্টিতে অন্যায় ও তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধানও সমাজের আইনে ব্যবস্থা করা আছে। এমন কি একজনের প্রাণ বিনাশ করিলে হত্যাকারীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এত করিয়াও আমাদের এই আক্রমবৃত্তিকে যুগ যুগের চেষ্টাতেও এখন পর্যন্ত বিনাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা হাতে না মারিতে পারিলে ভাতে মারি, না পারিলে কথায় মারি, তাহাও না পারিলে নিজের মনে হাজার কল্পনা রচনা করিয়া হত্যা ইত্যাদির মধ্যে নানা প্রকারে আক্রমবৃত্তির যথাসম্ভব আশ মিটাই। ইহাতেও অনেক সময় বৃত্তি নিবৃত্ত হয় না। ক্রমে জমিতে জমিতে এক সময় সাধারণ কোনও সুযোগ পাইয়া ব্যক্তির জীবনে অথবা সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। আবার কোনও সময় সমাজ বা রাষ্ট্রও বিশেষ অবস্থায়, এই আক্রমবৃত্তির প্রয়োগে উৎসাহ দান করে। ফলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নানা বিধ্বংসী অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই আক্রমবৃত্তি অমর। সমাজের কল্যাণে যদি ইহাকে প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তবে এই বৃত্তি একদিন না একদিন ফাটিয়া পড়িবেই এবং সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেই। আমরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তুজগতের উপর আমাদের অধিকার বিস্তার করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঐ আক্রম-বৃত্তি সমাজ-কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিতেছি। রোগের বীজাণু ধ্বংস করিয়াও একই বৃত্তি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিয়া চলিতেছি। লেখাপড়া, খেলা ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতার মধ্যে

ঐ একই বৃত্তির তাগিদ সমাজ-গ্রাহ্য উপায়ে মিটাইতেছি। কাঠ কাটা, মাটি কাটা, পাথর, ইট ভাঙ্গা ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যেই আমাদের আক্রমবৃত্তি কিছু পরিমাণে আমরা মিটাইয়া চলি।

এক আক্রমবৃত্তি সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছি সেই কথা আমাদের অন্য সকল বৃত্তি সম্বন্ধেই সত্য। আমাদের কাম, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিগুলিও সর্বদা আমাদের নির্জ্ঞান মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই আলোড়ন আমরা কে কি ভাবে শান্ত করিতে পারিতেছি তাহার উপরই আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে। এই কথা ঠিক যে প্রথম অবস্থায় বাধা নিষেধ যদি প্রবল না থাকে তবে বৃত্তিগুলি যেন বাগ মানিতে চাহে না। শিশুকে অনেক সময় জোর করিয়াই তাহার ঈপ্সিত বিশেষ আচরণে বাধা দিতে হয়। ক্রমে তাহার বাস্তবজ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকে। তখন নিজে হইতেই শিশু অসুখকর বা কষ্টকর কাজে অগ্রসর হইতে চায় না। পরে আরও বড় হইলে সে বুঝিতে পারে যে, যে-কাজ আপাত কষ্টকর বা অতৃপ্তকর তাহা আখেরে কল্যাণকর হইতে পারে, এমনকি বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে কষ্টকর কাজও করিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রেই তাহার আদিম বৃত্তির সহজ পূরণ বাধা পায়। সমাজ ও সভ্যতা এই সকল নানা রকমের বাধা-নিষেধ ও অবশ্য পালনীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, দাঁড়াইয়া আছে, বাঁচিয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, জীবন ও জগত দুইই গতিশীল। প্রয়োজনও তাই সকল সময় এক থাকে না। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। এই গতিকে রুদ্ধ করিলে জীবনকেই হত্যা করা হইবে। অবশ্য যে কোনও পরিবর্তনই কল্যাণকর এ কথা বলা চলে না। এই খানে বিচারের প্রয়োজন। বিচার করিতে হইলেই অভিজ্ঞতা, অর্জিত জ্ঞান ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়। সেই সব আলোচনার জটিলতার মধ্যে না যাইয়াও আমাদের মূল বক্তব্য সহজে বলিতে চেষ্টা করি। কালোবাজারী প্রভৃতি অসামাজিক চরিত্রের লোকদের আমরাই প্রশ্রয় দিয়া থাকি, আমাদের নিজেদের স্বার্থে, একথা গতবারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই অর্থে কেবল কালোবাজারী, মুনাফাবাজদের দোষ দিলেই চলিবে না। দোষ মূলতঃ আমাদের চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে। কোন কোন মানুষ আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতেছে মাত্র। আমরা নিজেদের লোভ, ভোগ, স্বার্থকে বড় করিয়া তুলিয়া নীতি ও সমাজের বাস্তব কল্যাণকে উপেক্ষা করিতেছি, সমাজ-বিরোধী কার্যে অংশগ্রহণ করিতেছি। সমাজের শত্রু বলিয়া নাম দিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইতে যাইতেছি তাহারাও একই দোষে দুষ্ট।

একজনকে সাধু নাম দিয়া আর একজনকে চোর নাম দেওয়া যায় না। মানসিক অবস্থা বিচার করিলে ইহা একদিকের সত্য। ইহার আরও অনেক দিক আছে, এখানে সেগুলি টানিয়া আনিয়া জটিলতা বাড়াইব না।

আসল কথা দাঁড়ায় আমাদের নীতিজ্ঞান, সমাজ-জ্ঞান এবং বাস্তব কল্যাণ-জ্ঞান প্রভৃতির মান বিশেষ উন্নত নয়, একথাও পূর্বের সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আমাদের সুখের প্রতি লোভ সময়-সময় অন্য সব বিচার-বিবেচনার বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভোগ মিটাইবার তাগিদেই ছুটিয়া চলে। বলিতে হয়, আমাদের বৃত্তিগুলির নিরোধের শিক্ষা আমাদের ভাল হয় নাই। বৃহত্তর কল্যাণের চিন্তা আমাদের মনে তেমন ঠাঁই পাইতেছে না। আপাত ভাল লাগা বা লাভের কথাটাই বড হইয়া উঠে। ইহার মূলে আত্ম-সর্বস্বতার, আত্ম-প্রীতির (স্বকামের) প্রভাব প্রবল থাকে। এখানে আত্ম বলিতে নিজে ও নিজের এই দুইকেই বুঝায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজটাই প্রধান, নিজের অর্থাৎ নিজের আপন বলে ইত্যাদি, তাহার পরে স্থান পায়। শেষ অবস্থায় 'চাচা আপন বাঁচা' নীতিটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব নহে তাহা বলিতেছি না। যে-কারণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। মোট কথা, নিজের লোভের তাগিদে, স্বকামের তাগিদে যখন নিজের লাভ, নিজের ভোগটাই প্রাধান্য পায় তখন আমাদের নীতি-জ্ঞান চাপে পডিয়া আর মাথা তুলিতে পারে না। বাহিরের সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তখন যোগ্য শাসনের ব্যবস্থা করিতে না পারে তবে আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে—তাহা অনিবার্য হইয়া উঠে। বাহিরের শিক্ষা যতদিন নিজের মনে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে না ততদিন বাহিরের শাসনের ভার বা দায়েই আমাদের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু বাহিরের সেই শাসন শক্তি যদি দুর্বল হয় তবে আর বাঁচাইবে কে? নিজের মনের বৃত্তিগুলি তখন সুযোগ বুঝিয়া যেমন করিয়া পারে নিজ নিজ ভোগ মিটাইয়া লইতে তৎপর হয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় রোগের মূল বীজাণু এইখানেই রহিয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণের জীবনে যে নীতিবোধ, নিষ্ঠা প্রভৃতি একসময় ছিল তাহা ভাঙিয়া নষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানে আর কোনও নূতন গ্রহণযোগ্য নীতিবোধ বা নিষ্ঠা ইত্যাদির শিক্ষা আমাদের মনে স্থান পায় নাই। সুতরাং কোনও বৃত্তির চাপ আসিলে তাহাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করিয়া দেখিবার অথবা সমাজ জীবনের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। অপর দিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসনও দুর্বল হওয়ায় সমস্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় একদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি সুষ্ঠু ভাবে

প্রযোগ করা যেমন দরকার অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন একান্ত, দরকার। আমরা অ আ ক খ শিখিয়াছি, হয়ত বা বড় বড় পণ্ডিতী কথাও বলিতে শিখিয়াছি কিন্তু জীবন চালনার শিক্ষা আমাদের বড়ই কম। জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করি না, অধীত বিদ্যাকেও জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে শিখি না। ফলে অধীত বিদ্যা কেবল বাহিরের সাজ-পোষাকের মতই আমাদের বহির্বাস মাত্র হইয়া থাকে। জীবনকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের এই অপুষ্ট, দীন জীবনের গ্লানি তাই নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তি ও শিক্ষা এই দুইয়ের উপযুক্ত প্রয়াস ভিন্ন এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার আর পথ নাই।

আমাদের ভোগলিপ্সু মন ভোগ খুঁজিবেই, ভোগ মিটাইতে সর্বদা সচেষ্টও থাকিবে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমাদের বাস্তবজ্ঞান, নীতিবোধ ও আদর্শানুসরণ ইত্যাদি মানসিক দিকগুলিও সক্রিয়, সতেজ ও সুস্থ থাকে তবে ঐ ভোগলিপ্সা কখন, কিভাবে, কত পরিমাণে মিটাইতে পারা সম্ভব ও সঙ্গত এই বিচারও আমাদের মনই করিতে পারিবে। যাহাতে আমাদের মনের সেই শিক্ষা ও শক্তি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে তাহার উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া সেই অনুসারে শিক্ষা ইত্যাদি পরিচালিত করিতে হইবে। শিক্ষা বলিতে কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা বোঝায় না। শিশুর জন্ম হইতেই তাহার শিক্ষা শুরু হয়। সেই শিক্ষা যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে শুভ ফল লাভের আশা করা যায় না। দুঃখের বিষয় এইদিকে আমাদের দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেই চলে। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কমিটি গঠিত হইয়াছে, বিস্তৃত মতামতও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মূল্য কম নহে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাহাও মূল্যবান তথ্য। সেগুলির প্রয়োগ গত ৩০ বৎসরেও সম্ভব হইল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়া যে নকলনবিসদের ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে তাহা দুঃখকর। দেশের পক্ষে ইহার ক্ষতিকর রূপ অতি স্পষ্ট। কিন্তু শৈশব হইতে শিক্ষার সে ভিত্তি স্থাপিত না হইলে পরের শিক্ষাগুলি তেমন করিয়া দৃঢ়ভিত্তিক বলিষ্ঠতা পাইতে পারে না। সেই মূল শিক্ষার দিকে আজও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। ভারতের মত এত বড় দেশের পক্ষে এই শিক্ষাদান যে কত বড় ও জটিল বিষয় তাহা আমরা জানি। তবু যেমন করিয়াই হউক শুরু না করিলে, ক্ষেত্রে সময় মত বীজ বপন না করিলে, ফলের আশা করা যায় কি? এই সহজ তথ্যগুলি বারেবারে জনসাধারণের, বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্র পুরোধাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে। যদি একসময় একজনেরও মনে কিছু সাড়া জাগায় তাহাতেও কিছু কাজ হইবে। একদিন হয়ত একে একে অনেকের মনে এই চিন্তা স্থান পাইবে। আমরা সেই আশাতেই আমাদের সামান্য

শক্তি নিয়োগ করিতেছি। আমাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইলেও তাহা সত্য বলিয়াই প্রবল। একদিন এই সত্য নিজ বলে প্রতিষ্ঠিত হইবেই এই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। সেই শুভদিনকে আমরা বারে বারে আহ্বান জানাই।

উঠ, জাগো, নিজেকে জানো, অপরকে জানাও, কর্ম কর, অন্যকে কর্মে ডাকিয়া আন, ব্রতী হও, অপরকে বৃত করা।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্ণে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

- লেখকের দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, লেখকের অনুরোধ সাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্ প্রিণ্টও দেওয়া হয়।

- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্যালয়
১৪, পার্সিবাগান লেন
কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

প্রথম সংখ্যা

সাঁওতালী বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

(৩)

ধনপতি বাগ *

উপরোক্ত বিষয় বস্তুর উপর যে দু'টি অধ্যায় আগেই "চিত্ত"-র পূর্ববর্তী দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটিতে আমি সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত বিবাহ প্রথা ও দ্বিতীয়-টিতে সমাজ-স্বীকৃত হলেও মর্যাদার দিক থেকে সমাজে অধস্তন পর্যায়ের প্রথাগুলিকে মোটা-মুটি ভাবে ভাগ করে বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। এরি মধ্যে কিছু কিছু মন্তব্যও আমি করেছি বটে তবে বক্তব্য বিশেষ কিছু রাখিনি। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু নতুন উপাত্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব বক্তব্য কিছু পেশ করার ইচ্ছা আছে।

বর্তমান গ্রামীন সমাজ কর্তাদের প্রতি কিছু কটাক্ষও আমি করেছি। এরূপ করেছি সেখানে, যেখানে তাদের সমাজ দুর্নীতি ঘটেছে জেনেও তা দূর করতে বা বন্ধ করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ নিজেরা সরে দাঁড়াচ্ছে এবং সেই সুযোগে দুর্নীতি সমাজের বুকে আরো জেঁকে বসছে।

সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে, বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের স্বাধীনতা যে সাঁওতাল সমাজে আজো আছে তা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ; যা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যেও এককালে বিরল ছিল এবং এখনো মুষ্টিমেয় হিন্দু গোষ্ঠির মধ্যে কার্যতঃ যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার পিছনে যে পথ-নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি কাজ করতো সেদিকে লক্ষ্য না করে যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতাটাকেই বড় করে দেখি তাহলে যে মস্ত বড় ভুল হবে সে ধারণা মনে হয় সাঁওতাল সমাজের নিয়ামকরা জানতেন। সেইজন্যই নৈতিক ব্যাপারে একটু এদিক-ওদিক হলেই সমাজের রক্ত চক্ষু তাকে শাসিয়ে দিত; তাতে শায়েস্তা না হলে তখন পুরোদস্তুর শাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হতো। গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে পরগনা পর্যায় পর্যন্ত যে শাসন ব্যবস্থা সচল ছিল দরকার হলে তাকে কাজে লাগানো হোত। এই কাঠামোটা আজো আছে। আমার নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রের বাইরে সেটা হয়তো আগের মত কার্যকরীও থাকতে পারে,

---

* মনঃসমীক্ষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আমি তা সঠিক জানি না। তবে আমার কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে আগের দিনের নির্দেশনা বা নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার অবস্থা এতই শোচনীয় যে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি "এদের সমাজের কাঠামোটা আজ যেন ওদের ঐ বর্ষাবিধ্বস্ত হুমড়ি খেয়ে পড়া খড়ের চালটার মত ভেঙে পড়তে চাইছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্যাম ও রায়ের বিয়ের ক্ষেত্রে আমি সমাজের ক্ষীয়মান শাসন ব্যবস্থার কিছুটা আভাস দিয়েছি। আরো দেব।

শাসন ব্যবস্থার এরূপ দুর্দশার কারণ কি? কোন পথ দিয়ে সেই শক্তি এতো মজবুত স্বনির্ভরশীল শাসন যন্ত্রকে বিকল করছে, প্রায় অচল করে দিতে উদ্যত হয়েছে?

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পণ্ডিতরা ভিন্ন-ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বা করবেন। তাদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত একটি মত হচ্ছে, এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উপার্জন করার ক্ষমতা। একটি অপোগণ্ড শিশুও পেটের ভাতের জন্য তার মা-বাবার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর না করলেও পারে। কারো ঘরে 'বাগালি' করলে আট-দশ বছরের একটি ছেলে বা মেয়ের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই অর্থনৈতিক যুক্তিকে অস্বীকার করা ভুল হবে। এটা সাঁওতাল সমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। যে-সব সাঁওতাল কোন শহর বা কল-কারখানার কাছাকাছি রয়েছে সেই সব গ্রামগুলিতে এদের কায়িক পরিশ্রমের চাহিদা এতো বেশী যে, যদি কেউ কাজের ভাল-মন্দ বিচার না করে শুধু অর্থের পরিবর্তে যে কোন কাজ করতে রাজি থাকে তাহলে কাজের অভাব প্রায় হয় না। কচিৎ-কখনো অভাব হলে আজকাল সরকারি উদ্যোগে কাজের যোগান দেওয়া হয়ে থাকে। শহর বলতে মহকুমা থেকে ছোট শহরের কথাই বলছি। কল-কারখানা বলতে দুর্গাপুর, আসানসোলের কথা বলছি না, সেখনে তো কাজের সুযোগ আছেই। আমার দেখা এই বোলপুর সহরের ধারে-কাছেই কতো কল-ধানকল, তেল-কল, কোলা-কল ইত্যাদি বহু রকমের কাজের ক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়া বাবুদের বাড়ীতে বাড়ীর 'ঝি'-দের একটা অংশ দখল করে রেখেছে উঠ্‌তি বয়সের সাঁওতালী মেয়েরা। এদের সংখ্যা অনুপাতে দিন-দিন বাড়ছে। তপশিলী জাতির হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অনেকেই এই স্বল্পবাক্ সাঁওতাল মেয়েদের বেশী পছন্দ করছেন আজকাল। অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে কেউ যদি এই দিকটা নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক জোরালো যুক্তি হয়তো পেতে পারি। আমার বক্তব্যের পরিপূরক যুক্তি হিসাবে সাধারণভাবে এইটুকুই বলতে চাই যে, ছোট থেকেই ব্যক্তি স্বাধীনতার শিক্ষা অজ্ঞানে ছেলে-মেয়েরা পেয়ে থাকে কার্যকরীভাবে।

তারপর আসে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, পরস্পরের জুটি নির্বাচনের ব্যাপারে। এ সম্বন্ধে আমি এদের বিবাহ সম্বন্ধে যে দুটি প্রবন্ধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তা থেকে পাঠকের মনে হয়তো একটা মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আরো যেসব আনুসঙ্গিক বিষয়ে উল্লেখ করবো তা থেকে ঐ ব্যাপারে ভাল-মন্দ বিচারটি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি।

এমন অনেক জিনিষ সংসারে আছে যেগুলি সাধারণভাবে দেখলে আমরা যে চিত্রটা পাই সেইটাই আবার বিশেষভাবে অনুধাবন করলে অনেক সময় ভিন্ন চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বা মনে নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। এরূপ হওয়ার কারণ দেখাতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয়, সকলের চোখ সমান নয়, মন তো নয়ই। সেকথা মেনে নিলেও জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। কারণ ঐ যুক্তির দ্বারা একই লোক যখন একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বা পরিস্থিতিতে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন তার কারণ কি হতে পারে, তার উত্তর পাওয়া যায় না। অথচ এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। এই ভাব পরিবর্ত্তনের পিছনে থাকে পরিদৃষ্ট ব্যক্তির সচল মানসিকতা, ব্যক্তি-সংগঠিত পরিবেশের ভেদ্যতা এবং সবচেয়ে বেশী করে থাকে দ্রষ্টার নিজস্ব মানসিকতা যা বস্তুসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশী।

এ আলোচনা আপাততঃ থাক। আমার বক্তব্য যখন কেবল যুক্তির দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ও সমাজের আচরণের পরিবর্ত্তনের কারণ কি কি হতে পারে সেইগুলোকে দেখার চেষ্টা করা তখন শুধু যুক্তির দ্বারা তত্ত্ব আলোচনার কোন লাভ নেই।

সাঁওতালী বিবাহ সম্বন্ধে এই তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হোল স্ত্রী-পুরুষের অসামাজিক যৌন-সম্পর্ক ও তার গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে আমার লেখা "আলেখ্য"* পুস্তকের কথা উল্লেখ করছি। সেখানে আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে সংসারে বাস করে শহরে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে এরূপ একটি মাত্র ব্যক্তি, যাকে তার সমাজ প্রশ্রয় দিয়েছে। আজ সে মৃতা, কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সে সমাজের বুকে বসে ঐরূপ অসামাজিক কাজ করে গেছে। তখন এই তল্লাটের আর কোন গ্রামে এমনটি ছিল না। গোপনে ঐরূপ কাজ আর কেউ করতো না সেকথা বলব না। তবে প্রকাশ্যে "গোলাপ"ই একমাত্র ব্যক্তি যে

* "আলেখ্য"— শ্রীধনপতি নাগ। কম্পাস প্রকাশন, কলিকাতা।

একদিন ধরে নিজের পথেই চলে গেছে, তার সমাজ তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি বা তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করতেও পারেনি। এর ফল যে ভাল হয়নি তা আজকে এই গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের খবর নিলেই জানা যায়। গোলাপ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী বধূ। তার চরিত্রে এই পরিবর্তন এসেছিল স্বামী তাকে ত্যাগ করার পর। তখন থেকেই আমার দৃষ্টি ছিল "ছাড়ুই" সাঁওতালী মেয়েদের গতিবিধির দিকে। এরা যে একদিন তাদের সমাজে ভাঙনের ঢেউ তুলবে সে আশংকা আমার ছিল। "আলেখ্য" তে সে সম্বন্ধে আঁচ আমি দিয়েছিলাম। আজ তা সত্যি হয়েছে। তখন থেকে এই এক কুড়ি বছরের মধ্যেই দেখেছি সাঁওতালী মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি করতে দল বেঁধে সেজে-গুজে দিনের আলো মুছে যেতে না যেতেই শান্তিনিকেতনের বুকের উপর দিয়েই বোলপুর অভিমুখে চলেছে, আবার রাত্রিশেষে দিনের নতুন আলোয় সেই রাস্তা মাড়িয়ে তাদের দিনের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই ঘটনা চোখের সামনে ঘটেছে। আজ এ-ঘটনা লুকিয়ে ঘটে না; অথচ অনেকের কাছেই অজানা। এরা আমাদের সমাজে যে ঢেউ তুলেছে তার বিহিত না করতে পারলে সেখানেও ভাঙন ধরাতে পারে তা আমাদের সমাজ জেনেও জানেনি, দেখেও দেখেনি। জানি না আজও তারা দেখে কি না, জানে কিনা।

একটা সত্যি কথা মেনে রাখা দরকার, অসম্বৃত যৌন-শক্তি চাক্ষুষ আগুনের থেকেও শক্তিশালী। ঘরে আগুন ধরলে চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার একটা হয়; কিন্তু বেপরোয়া কাম-শক্তি আগুণ ধরায় মানুষের মনে, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ধীরে-ধীরে সমাজকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে। আজকে এইরূপ সাঁওতালী মেয়ের দল আমাদের সমাজে কোথায় কতটা আগুন জেলে চলেছে সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা এবং সে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা কি সমাজের কর্তব্য নয়? শুধু কি পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিলেই কর্তব্যের শেষ হোল?

এটা তো গেল আমাদের দিকের সমস্যা, এজন্য আসলে আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়। আমার দ্রষ্টব্য হচ্ছে সাঁওতাল সমাজটা এ নিয়ে কি ভাবছে, আদৌ কিছু ভাবছে কিনা; যদি ভাবে, শুধু ভাবছেই না কিছু করছেও, যাতে এর প্রতি-বিধান কিছু করা যায়? না আগের মতই সাময়িক উত্তেজনা দেখিয়ে তারপর একটু বেশী করে হাঁড়িয়া খেয়ে পরের দিন থেকে আবার যেমন চলছিল তেমনিই গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে; সেইটাই বিশেষ করে দেখা। দেখা যাক, এবারে সেখানে কি ঘটছে। "গোপাল" মরে বেঁচেছে, কিন্তু যে বিষ সে ছড়িয়ে গেছে

তা কি সাঁওতাল সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধোগতিকে ত্বরান্বিত করেনি? করেছে নিশ্চয়ই।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এজন্য শুধু গোলাপকেই দায়ী করছি কেন? আর সকলেই কি সতী-সাধ্বী ছিল?

ঠিক কথা, আরো অনেকেই তখনকার দিনেই পরপুরুষকে সঙ্গ দিতো। ঐ সময়ের দিকু-বাবুরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু স্ত্রীলোকদের দিক থেকে সাঁওতাল যুবতীদের দিকে নজর দিয়েছে। এবং যেখানেই তাদের নজর পড়েছে ছলে-বলে-কৌশলে তারা নিজেদের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার পথ করে নিয়েছে। কিন্তু আমি বিশেষ করে যে জন্য "গোলাপ" ও তার সমাজকে দায়ী করছি তা হোল, "গোলাপ" তার সমাজের বুকে বসে নিত্য-নৈমিত্তিক এই অ-নৈতিক কাজ প্রকাশ্যে করে গেছে তার শেষ জীবনটার শেষ পর্যন্ত। বলা যায় সমাজের অনুশাসনকে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অসামাজিক কাজ করে গেছে। এইখানেই আমি সমাজকে এবং গোলাপকে একসঙ্গেই দোষী মনে করেছি। আমার বিশ্বাস আমি ভুল করিনি। সমাজকে আমি দোষী করেছি এই জন্য যে, সে সাহস করেনি গোলাপের শাস্তিবিধান করতে। অর্থাৎ সমাজে মাতব্বরদের ঘরোয়া (গুপ্ত) দুর্বলতাগুলো গোলাপ ভাল করেই জানতো, তার কর্মের সমালোচনা করলে সে যে-জাতের মেয়ে তাতে সে চুপকরে, মুখ বুজে সহ্য করতো না, মাতব্বরদের ঘরোয়া কেচ্ছার পুঁটুলি এলিয়ে ধরতো সমাজের সকলের সামনে। অতএব তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রকল্প ছিল যে সাঁওতাল সমাজে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে, এর অবশ্যম্ভাবী কুফল হোল সমাজ-চরিত্রের অবনতি, এবং এর থেকেই আসবে এই আদিম জাতির নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন। ফলে আজকের সমাজ যেমন "গোলাপ"কে ভাসিয়ে দিয়েছে তার সাংসারিক নোঙর ভেঙ্গে, সাঁওতাল সমাজ-ও একদিন গোলাপের মত মেয়েদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে। তারপর কি হবে তা আমার ধারণায় তখন আসেনি। এখন চেষ্টা করলে হয়তো কিছুটা ধারণা করা যায়।

যে সব পাঠক আলেখ্য পড়েননি, তাঁদের সুবিধার জন্য খুব অল্প কথায় গোলাপের বিচিত্র চরিত্রের কাহিনীটি বলার চেষ্টা করছি:

"গোলাপ তার স্বামী ও তাদের তিন-চার বছরের এক পুত্র নিয়ে নিজেদের কুঁড়ে ঘরে কষ্টের ভাত সুখ করে খেয়ে দিনাতিপাত করতো। বড় ননদের সঙ্গে সে দিন মজুরি করতে

যেত। ননদের অবৈধ কাম-সম্পর্ক ছিল যেখানে ওরা দুজনেই কাজ করতো সেখানের জনৈক দিকু বাবুর সঙ্গে। গোলাপের বয়স ননদের বয়স থেকে অনেক কম এবং তুলনায় সে ননদের থেকে দেখতে সুশ্রী ছিল। দিকু বাবুদের নজর ননদকে ছেড়ে গোলাপের উপর পড়ল। ননদ দালালি শুরু করে, কিন্তু গোলাপ কিছুতেই 'খারাপ' কাজ করতে রাজি হয় না; ছিঃ ছিঃ বলে ননদকে ধিক্কার দেয়। এই থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। এর ফলে ওদের আলাদা কুঁড়ে বাঁধতে হয়। গোলাপ তার স্বামীকে অকপটে সব কথা বলে। স্বামী-ভাগ্য গোলাপের ভালই ছিল। কিন্তু ননদিনী কাল-নাগিনী হয়ে তার সংসারে বিষ ঢেলে দেয়। ননদিনী ছোট ভাইয়ের মনে সন্দেহের আগুন ধরিয়ে তাকে ভাজের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। গোলাপ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তার বাপ-মায়ের গাঁয়ে চলে যায়। সেখানে তাদের আশ্রয়ে থেকে সৎপথে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা অনেকদিন ধরেই সে করেছে। কিন্তু, কালক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে গোলাপের জীবন জর্জরিত হতে থাকে। অবশেষে তার অভিজ্ঞা ননদিনী তাকে অনেকদিন আগেই যে পথে চালিত করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত, খুব সম্ভবতঃ তার গর্ভধারিনীর পথ নির্দেশেই, সেই সহজ পথ গোলাপ বেছে নেয় তার পেট এবং মন ভরাবার উপায় হিসাবে। পেট তার ভরতো, কিন্তু মন তার কোন দিনই ভরেনি। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে সে তার সব জ্বালার হাত থেকে নিস্তার পেল।

এই হোল সংক্ষেপে গোলাপের কাহিনী।

গোলাপের শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম ছিল আমাদের খুব কাছেই। গোলাপের মায়ের ঘর তার স্বামীর ঘর থেকে কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে। যেখান থেকে আরো এক মাইল দূরের গ্রামের তদানিন্তন একটি ঘটনার কথা এবার বলি।

এই গ্রামের একটি যুবতী তার অক্ষমনীয় যৌনসম্পর্কের জন্য সমাজ তার পিতাকে জরিমানা করে। কিন্তু এতে ঐ মেয়েকে অসামাজিক কাজ করা থেকে নিরস্ত করা যায়নি। ঐ মেয়ে একদিন ধরা পড়ল। সমাজ তার বিচার করল। সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হোল যে ঐ মেয়েকে আর গ্রামে রাখা চলবে না। অর্থাৎ বাবা-মার প্রতি নির্দেশ হোল মেয়েকে ত্যাগ করার। তাই হোল। এইটাই সাঁওতালী শাসন-ব্যবস্থায় নিয়ম। কিন্তু মেয়ে যাবে কোথায়? দিকু-বাবু তো তাকে নিয়ে ঘরে তুলবে না, নতুন ঘরও বাঁধবে না। পড়ল সে তখন মুস্কিলে। কয়েকদিন কোনও রকমে কাজের সঙ্গে একটা আস্তানা যোগাড়ের চেষ্টায় খুব ঘোরাঘুরি করল। এই সময়ে আমার সঙ্গেও তার মোলাকাত হয়। তাকে পুনর্বাসিত করার চেষ্টায় তাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আমার। কোন পক্ষেই সহৃদয়তার পরিচয় দেয়নি তার সমস্যার সমাধানে।

সাঁওতালী মেয়ে অবস্থা বুঝে নিজের চেষ্টায় যা পারলো করলো। অসৎপথের সঙ্গী জুটতে তার দেরী হোল না। নতুন জুটির সঙ্গে এই এলাকা ত্যাগ করে সে নিরুদ্দেশ হোল। অন্য সূত্রে শুনলাম সে তখন গুস্‌কারাতে ঘর বেঁধেছে।

কয়েক মাস পরে শুধু মেয়েটিকে এই অঞ্চলে আবার দেখা গেল। এখানেই সে একটী উড়িয়া মিস্ত্রীর সঙ্গে জুটে বোলপুর সহরের উপকণ্ঠে দ্বিতীয়বার ঘর বাঁধল। অনেক দিন পরে আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য এবং সরেজমিনে চাক্ষুষ করার জন্য যেদিন তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেদিন দেখলাম তার কোলে একটি ছোট্ট শিশু। সে মা হয়েছে। লজ্জায় অধোবদনা মা-কে কথা বলাতে বেশী কষ্ট করতে হয়নি। সে এখন সুখী, সে কথা বলতে দ্বিধা করেনি। মিস্ত্রী বয়সে তার থেকে অনেক বড় হলেও লোকটা ভাল, সেকথা অকুণ্ঠে সে স্বীকার করেছে। তার মা-ও যাতায়াতের পথে তাদের খোঁজ নিয়ে যায়।

এই যে মাত্র এক মাইল দূরের দু'টি গ্রামের মধ্যে দু'টি ঘটনা, বিচার করলে দু'টি সমাজ চরিত্রের আলেখ্য স্পষ্ট করে বলে দেয় দুটোর মধ্যে কত তফাৎ। কিন্তু তফাৎটা মূলতঃ কোথায়? দূরের গ্রামটির পক্ষে একটি অশালীন মেয়েকে বলার সাহস ছিল যে, সে যে অন্যায় করেছে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের গ্রামে তার স্থান হবে না; কাছের গ্রামটির পক্ষে এরূপ কঠিন শাস্তির বিধান দেওয়ার সাহস ছিলনা, কারণ গোলাপ তার মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের প্রশ্রয় পেয়েছিল, এবং সমাজে অন্য সংসারেও যে অবৈধ কামের চোরাচালান চলতো সেকথা সে জানতো। প্রথমে সে তার মায়ের কাছে শুনেছে এবং পরে সে নিজের চক্ষে দেখেছে। তাই সে যখন বেশ্যাবৃত্তিকে তার পেশা করে নিয়েছিল তখন তাকে শাসন করতে গেলে অন্য সব বাড়ীর সমস্ত মেয়ের গোপন কাহিনী ফাঁস করে দেবে বলে শাসিয়েছে। শুধু মিথ্যা ভয় দেখানো নয়, দরকার হলে সে তা প্রকাশ করতে পারতো সে পরিচয় সে দিয়েছে।

তাহলে কি বলা চলে না যে, সমাজের শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতার পিছনে রয়েছে শাসক গোষ্ঠির কিছু লোকের পারিবারিক জীবনে অবৈধ কাম-জনিত ক্রিয়াকলাপের প্রশ্রয় যা নাকি গোপনতার পর্দা ভেদ করে গ্রামীন সমাজের কাছে জানাজানি হয়েছে, তবে সম্ভবতঃ গ্রামের বাইরে ধরা-ছোঁয়ার মত অবস্থায় পৌঁছোয়নি। গোলাপ সমাজকে শাসিয়েছিল; তখন গ্রামের শাসকগোষ্ঠি বাধ্য হয়ে গোলাপকে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু তাকে পাগল বানিয়ে, তার অবৈধ কাজকর্মকে ব্যতিক্রম বলে জাহির করেছে।

উপরোক্ত ঘটনা দুটি ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় বছর আঠারো আগে। এই কয়েক বছরে সাঁওতাল সমাজে অসামাজিক কাজ-কর্ম, বিশেষ করে অবৈধ কামের যে বন্যা বয়ে গেছে তার রোজনামচা দেবার ইচ্ছা আমার নেই, তবে হালফিল্ দু'এক বছরের মধ্যে ঘটেছে এমন দু'চারটি ঘটনা আপনাদের জানাবার ইচ্ছা আছে। যাতে নাকি বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে মধ্যেকার সময়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়ার পক্ষে সহজ হয়। এইসব ঘটনা বলার আগে সাঁওতালী চিন্তাধারার মধ্যে যৌন-বোধটা কিরূপ ভাবে ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে এবং সমাজের চক্ষে কাজ করে, সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। বিষয়টা আমাদের কাছে, হিন্দু সমাজের উপরের স্তরে (সর্বোচ্চ নয়), বলা যায় মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে যতটা স্পর্শপ্রবণ, সাঁওতালদের কাছে তা নয়। এই বিষয়ে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধে খানিকটা আভাস দিয়েছি ওদের রক্ষণশীল প্রথা ছাড়া অন্যান্য প্রথায় বিবাহ উপলক্ষ্যে জুটি নির্বাচনের ব্যাপারে।

এই ব্যাপারে একটি কথা বলে রাখি ওদের ছেলেদের ব্যাপারে সাঁওতাল মেয়ে ছাড়া অন্য জাতির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়; কিন্তু সাঁওতালী মেয়েদের বেলায় নিজ জাতি ছাড়া চতুর্পার্শ্বস্থ অন্যান্য সমাজে বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি সাঁওতাল সমাজ পছন্দ করে না, আপত্তি করে এবং এমন ঘটনা ঘটলে এক দু'বার জরিমানা করে এবং তাতে ও না সামলে নিলে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে। এইটাই নিয়ম। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে যদি তার উঠতি বয়স থেকে তার যৌন-জুটি ঠিক করে নেয় এবং সেটা যদি মেয়ের স্ব-ঘরের হয় অর্থাৎ সমাজ-চল হয় তাহলে যুবতির অভিভাবকরা তাকে বাধা দেয় না, জানতে পারলেও। এমনকি তাদের দৈহিক মিলন ঘটেছে সেকথা জানতে পারলে হয়তো মা মেয়েকে একটু সাবধান করে দেয় কিন্তু জোর করে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে না। এই মেয়ে যদি আইবুড়ো হয় তাহলে সে নিজেই সাবধানে চলে, অন্ততঃ আঠারো-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত এদের প্রেমের কাহিনী জানা গেলেও সঙ্গমের প্রকাশ্য খবর পাওয়া যায় না। যদি কচিৎ এরূপ মেয়ে অবৈধ কাম-ক্রিয়াজনিত অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে মুক্ত করার ব্যবস্থা সমাজে বসেই হয়ে থাকে, সাধারণতঃ সেকথা বাইরে কাউকে গ্রামের লোক জানায় না। কুড়ি থেকে তিরিশ এই বয়সের মেয়েরাই আইবুড়ো মেয়ের থেকে ছাডুই মেয়েদের অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। সাঁওতাল পুরুষরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করছে নিজ গ্রামে, আবার অন্য গ্রামে আর এক সংসারের মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস করে আসছে এমন ঘটনাও ওদের সমাজে চলে। তাদের এই উপরন্ত

মিলনে একই পুরুষের দু'জায়গায় দুটো সংসার চলছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। এই ভিন্ গাঁয়ের বৌ-কে নিজের সংসারে এনে সাময়িকভাবে রাখার ঘটনাও আমাদের জানা। এতে সমাজ একটি কথাও বলে না, কোন আপত্তি জানায় না। ওরা বলবে একটাকে তো পুরুষ বিয়ে করেছে, দ্বিতীয়াকে তো আর বিয়ে করেনি, তাকে 'রেখেছে'। এতে যদি ঐ মেয়ের সম্মতি থাকে আর তার অভিভাবক এবং সমাজ যদি আপত্তি না করে তবে আমাদের আপত্তি হবে কেন?

"ওকে রেখেছে' 'ওর সঙ্গে থাকছে' এই দুটি বাক্যাংশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনও এক যুবকের কোন একটি যুবতীকে পছন্দ হোল। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হোল, বোঝাপড়া হোল। বিচার-বিবেচনা করে যদি যুবতীটি ঐ যুবকের সঙ্গে থাকতে রাজি হয় তাহলে আর কারো অনুমতি নেবার দরকার করে না। এমনকি দুজনেই যদি আইবুড়ো হয় তাহলেও না। কোন অনুষ্ঠান না করেই তারা দুজনে ঘর বাঁধতে পারে। এরূপ ঘটনা আজকালকার নয়। এই নিয়ম এদের সমাজে বহুদিন থেকে চলে আসছে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগে এখানের একটি গাঁয়ে গিয়ে শুনলাম সেদিন এমন একজন লোকের বিয়ে হবে যার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আমি শুনে তো হতভম্ব! কারণ ঐ ব্যক্তির এক ছেলের বয়স কুড়ি-বাইশ হবে। ঐ ছেলেকে আমি চিনি এবং শীঘ্রই তার বিয়ে হবে, এমন আভাসও পেয়েছি। তবে কি ব্যাপার?

ব্যাপারটা হচ্ছে, সেদিনের ঐ বিবাহযোগ্য ছেলের বাবা তার মাকে 'রেখেছিল'। কোন বিবাহ-অনুষ্ঠান তখন তারা করেনি। এতো দিন সমাজে থেকেই তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে ঘর-সংসার করেছে। আজ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা যখন হতে চলেছে তখন ওদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী আগে বাপ-মার বিয়ে হতে হবে, নইলে ছেলের বিবাহানুষ্ঠান হতে পারবে না। তাই বাপ-মার বিয়ের ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাঁওতাল-সমাজ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলামেশায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিলেও সাঁওতাল-সমাজের বাইরে অন্য পুরুষের সঙ্গে তাদের মেয়েদের মেলামেশার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাদের সমাজের মেয়েরা কি হিন্দু কি মুসলমান, কোন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে তা বরদাস্ত করে না; যৌন সম্পর্ক হলে তো নয়ই। কিন্তু এত

কড়াকড়ি সত্ত্বেও ভিনজাতির পুরুষের সঙ্গে মেশামেশি করা থেকে নিজেদের মেয়েদের আয়ত্বে রাখতে পারছে না। ইদানীং আইবুড়ো মেয়েরাও এই পথে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। গোপনে এইসব মেয়েরা বিশেষ করে ছাড়ুই মেয়েরা ভিন্‌জাতির পুরুষদের দেহ দান করে উপরি রোজগারের পথে দিন-দিন এগিয়েই চলেছে। মাঝে-মাঝে কোন-কোন গ্রামীন-সমাজ এদের বিচারের ডাক দিচ্ছে বটে কিন্তু খুব বেশী সুফল ফলছে না। লোকসানটা দুদিকেই ঘটছে।

যেমন বিচারে মেয়েটি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কারের আদেশ সমাজ দিচ্ছে, অভিভাবক মেয়েকে হারাচ্ছে। সেই মেয়ে গিয়ে ভিড়ছে শহরে বা শহরের উপকণ্ঠের পেশাদারী দেহ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এই নিয়ে একটা গ্রাম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতেও দেখেছি। এক দল এরূপ মেয়েদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। এতে এদের নগদ লাভ কিছু টাকা মাঝে-মাঝে মেয়ের দৌলতে ঘরে আসছে। অন্য দল নিজেদের সমাজের নৈতিক দিকটা বজায় রাখার জন্য অন্য দলের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছে। আমাদের ধারে-কাছে এমন গ্রাম আজ হয়েছে যেখানের মেয়েরা যথেষ্ট বড় হয়েছে, বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু তাদের বর জুটছে না। কেননা, এই গ্রামের এমন দুর্নাম রটেছে যে, বয়স্থা মেয়ে মানেই তারা নষ্ট, বাবুদের দ্বারা পুষ্ট। ভিন্ গাঁয়ের ছেলেরা তাদের নিতে চায় না।*

এরূপ একটি গ্রামের খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, অনধিক দু'শো জনসংখ্যার ঐ গ্রামে আটটি ছাড়ুই মেয়ে আছে। এদের সবগুলিই অবশ্য মার্কামারা ভ্রষ্টা নয়, তবে অন্ততঃপক্ষে চারটি তো বটেই। অন্য গুলি সাঙা করতে চায়, কিন্তু তাদের বর জুটছে না। সমাজকর্মীরা মনে করেন, সৎ ভাবে যদি তাদের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করানো যায় তাহলে হয়তো এদের বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাঙা বাঁধ ভরাট করা অতি দুরূহ ব্যাপার তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকলে হয়তো আরো অঘটন ঘটতে পারে।

এরই কাছাকাছি আর একটি গ্রামে গত বছরে একটি অনূঢ়া যুবতীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সে কিছু দিন বেশ্যা-বৃত্তি করে ভাল-ভাল সাড়ী, জামা ইত্যাদি পরে ঘোরাঘুরি করল, সকাল-সন্ধ্যায় যাতায়াতের পথে দেখতাম মাঝে-মাঝে। তার মা একদিন এসে কাঁদা-কাটা করে জানাল, মেয়েটাকে কতদিন হোল সিউড়ী নিয়ে গিয়ে

---

* প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি নিকটস্থ সুরুল গাঁয়ের নিম্ন শ্রেণীর আইবুড়ো বয়স্থা মেয়েদেরও এই জেলায় অনেক গ্রাম তাদের বাড়ী বধূ করতে সহজে রাজি হয় না।

আটকে রেখেছে, কেমন আছে ভাল-মন্দ কিছুই খবর পাচ্ছে না। খবরটা কোন রকমে তাকে জেনে দিতে পারি কিনা।

সেই মেয়ে যথা সময়ে ফিরেছে, তবে গ্রামে নয়। কিছু দিন পরে আবার স্বপথে যাতায়াত করছে মা তার জন্য কোন সুব্যবস্থা করতে পারেনি। একবার তাকে রোগে ধরল, তার 'বাবু'ই নাকি ওষুধ-পত্রাদির ব্যবস্থা করে তাকে ভাল করেছে। এই সব মেয়েরা সমাজ-বহিষ্কৃতা হলেও তাদের রোজগারের পয়সায় কিছু-কিছু ভাগ মাকে বা ভাই-বোনদের দিয়ে থাকে, যাতে গরীবের সংসারে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে মাকে সাহায্য করে। পাঠকের মনে হতে পারে এদের পরিণতি কি? ভবিষ্যৎ কি? আমিও জানি না। আগেই বলেছি 'গোলাপ' পাগ্‌লী আখ্যা নিয়ে মরে বেঁচেছে। তবে সবাই গোলাপের মত মন্দ-ভাগ্য নিয়ে আসেনি নিশ্চয়। উপরোক্ত ঐ মেয়েটিকে একদিন হঠাৎ দেখলাম পথে প্যারামবুলেটারে একটি শিশুকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সুন্দর পোষাকে সে সুসজ্জিতা। তাকে দেখে একটু আশ্বস্তই হলাম। সে কিন্তু লজ্জায় না ভয়ে জানি না, মুখটা নীচু করে নিল, আর তুললো না। আমি তাকে না চেনার ভান করে পেরিয়ে এলাম।

খুব হালের খবর, ঐ মেয়ের দিদি কিছু দিন হল স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে এসে মায়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। শুনলাম নাকি শীঘ্রই তার বিচার হবে, তার স্বামীর গ্রামে বসে। উভয় পক্ষের সর্দাররা মিলে বিচার করবে। জানি না ঠিক কয় কলসি 'হণ্ডি' কোন পক্ষ খরচ করবে। এই মেয়ের খবর আমি যতদূর জানি, সে বেশ বুদ্ধিমতী এবং চতুরা। তার ছোট বোনকে সেই প্রথমে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়েছিল; বলা যায় বেশ্যা-বৃত্তিতে নিয়োগ করেছিল। সে যে ধোয়া তুলসী-পাতা নয় সে কথা বহুজন বিদিত। যদি বিচারে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে শুধু হাতে তার অভিভাবককে ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ গাঁয়ে আর একটি ছাড়ুই মেয়ে বাড়বে। বর্ত্তমানে তিনটি আছে, তাদের সঙ্গে এইটিও যুক্ত হবে। এ মেয়ে ছাড়ুই হবে বলেই আমার বিশ্বাস। গ্রামে আরো আছে একজন বিধবা ও একজন বয়স্থা অনুঢ়া, ও একটি প্রথম অপরাধিনী, যার মা-বাবা প্রচুর টাকা সমাজের কাছে জরিমানা দিয়ে মেয়েকে বহিষ্কারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কোনও রকমে ঐ খুঁতে মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য স্বামী-স্ত্রী ছুটোছুটি করছে বটে কিন্তু ঐ মেয়েকে বৌ করে ঘরে তুলতে ধারে-কাছের কোন গ্রামের ছেলে রাজি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। মনে হয় এ মেয়েকে তারা কুপথ থেকে ফিরিয়ে সুপথে আনতে অতো সহজে

পারবে না। নিজের থেকে ধাক্কা খেয়ে যদি ফেরে তবেই তা সম্ভব। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাই-ই হবে।

এই গ্রামের আর একটি ঘটনা বলে শেষ করবো। এই গ্রামের এক সম্পন্ন চাষীর বাড়ী, উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে, বৌ, নাতী-নাৎনী নিয়ে জমজমাট সংসার। ছেলেরা কেউ চাষ, কেউ বা চাকরি করে। কর্তা-গিন্নী এখনো বর্তমান। এই বাড়ির-ই এক সুন্দরী মেয়ে একটি মাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে এখন থেকে আট-নয় বছর আগে স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছিল। তার সেই কন্যার বয়স এখন ন-দশ বছর হবে। এখানের সাঁওতাল সমাজে এই স্ত্রীলোকটির মত সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্না ব্যক্তি নাই বলেই মনে হয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার বছর দুই পরে সে মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্য গ্রাম ছেড়ে কোথাও সে একা রাত্রিবাস নাকি করেনি। তার বাবার দশ খানা গ্রামে নাম-ডাক আছে। এই তল্লাটের প্রায় সব গ্রামেই তার আত্মীয়-কুটুম্ব আছে। কাজেই তার গতিবিধি আটকায় কে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তার বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন নালিশ করেনি। কিছু দিন আগে শুনলাম ঐ মেয়ে তারি গ্রামের এক বাড়িতে প্রায়ই অভিসারে যায়—রাত্রে একাকী। পুরুষটি কৃতদার, কিন্তু তার স্ত্রী অনেকদিন হোল স্বামী-ঘর ত্যাগ করে চলে গেছে। তাদের কোন সন্তান নাই। ঐ ব্যক্তি কিছুদিন থেকে মা-বাবা, ভাইদের থেকে ভিন্ন হয়ে একাকী বাস করছে একটি ছোট্ট ঘর সম্বল করে। শোনা যাচ্ছে দুই ছাড়ুই এক হবার কথা। সমাজে এখন সবাই জানে এ সম্ভাবনার কথা কিন্তু মুখ ফুটে এখনো কোন পক্ষই কিছু বলছেনা ; অর্থাৎ এতে সমাজের কোন আপত্তি নেই। এর কারণ আমি আগেই বলেছি, যদি নিজ জাতির মধ্যে স্বঘরের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সমাজ চুপ করে থেকে লক্ষ্য রাখে শেষটা কি দাঁড়ায় দেখার জন্য। এই দুজন যদি বাসা বাঁধে তাহলে অবশ্য সমাজের পাওনাটা না চাইতেই মিলে যাবে। আর যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে আবার তারা দুজনে পৃথক হয়ে যায় তাহলেও সমাজ তা মেনে নেবে, তার কোন শাস্তির বিধান নেই।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সাঁওতাল মেয়েদের যৌন ক্ষুধা মেটাবার এতদূর ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজের গণ্ডি ভেঙ্গে 'দিকু'দের দিকে এতো এগোচ্ছে কেন, সমাজের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ? এবং সমাজের চক্ষে এরূপ ঘটনা আসা সত্ত্বেও সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন ?

সীমিত পরিবেশে নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি পরিদৃষ্টে আমার যে ধারণা হয়েছে সেই

টুকুই এখানে জানাচ্ছি। উপরোক্ত প্রশ্নগুলির তো বটেই ঐরূপ আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলেই আমার ধারণা।

প্রথমতঃ বলা যায়, কাম-প্রবৃত্তি যদি উদ্দীপ্ত হয় এবং তা মেটাবার জন্য যতই স্বাধীনতা তাকে দেওয়া যাক্ সমাজ তার যে একটি গণ্ডী টেনে দিয়েছে, তার বাইরে গেলেই সেটা অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেখানে সাঁওতাল হলে পরপুরুষের সঙ্গ লাভে দোষ নেই, যত দোষ হোল অ-সাঁওতাল হলেই। উদ্দীপ্ত কাম গর্জে উঠে বলবে, কেন? আমি তো বিশ্বজনীন, তবে এতো বাছ-বিচার মানব কেন? যুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে বাঁধ ভাঙার খেলা চলছে, তবে সাঁওতাল বলে কি আইন ভিন্ন হবে? এই বিশ্ব-জোড়া খেলার মাতনকে রোধ করার জন্যই সর্ব দেশে সর্ব যুগে সমাজ-কর্তারা মাথা ঘামিয়েছে, নানা আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করেছে।

সাঁওতাল যুবতীরা দিকুদের দিকে তখনই ঝুঁকেছে যখন থেকে দিকুদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ ঘটেছে এবং দিকুরা যখন ওদের দিকে হাত বাড়িয়েছে তখন কাম-পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতার ঐতিহ্য নিয়ে ওদের মন সাড়া দিয়েছে। মনের সাড়া মিললে তখন একমাত্র বাধা থাকল সমাজের গণ্ডী ভাঙার ঝুঁকি। সে ঝুঁকি সে নিয়েছে; তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ বেড়েছে। এই জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে অর্থ। পরিমাণ তার যাই হোক, যেহেতু অর্থাভাবের জন্য সে এই অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়নি তাই সেই অর্থের মূল্য অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে মানসিক মূল্য পেয়েছে প্রচুর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এরূপ অর্থের ব্যয় তারা কিভাবে আগে করতো এবং এখনো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করে তার বিচার থেকে। অতএব বলা যায় শুরুতে অর্থনৈতিক দিকটা ছিল গৌণ, মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যটাই ছিল মুখ্য। ক্রমশঃ অল্প বয়সে অধিক রোজগারটাই এদের কাছে দেখা দিলেও সেই পয়সা জমিয়ে ওরা ভবিষ্যতের পুঁজি করেছে এমন তো একটাও দেখলাম না। এইরূপ রোজগারের পয়সায় বেশী দাম ওরা দিয়ে রংচঙে সাড়ী-ব্লাউজ ইত্যাদি অঙ্গাবরণ কেনে। বড় জোর কেনে দু'একটি রূপোর গয়না এবং গিল্টি সোনার নাকছাবি, কানের ফুল।

গোপন পথে যে পয়সা আসে তার সন্ধান বাড়ীর পুরুষরা রেখেও রাখে না। কিন্তু ঐ দিকুদের কাছ থেকেই আবার খোলা পথে যে পয়সা আসে তার উপরতো অনেকেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই দিকুদের উপরই অনেক সাঁওতাল পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ভর করে। অতএব দিকুরা যেখানে অন্নদাতা, তা শ্রমের বিনিময়ে হলেও

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা কি প্রকাশ্যে বলার মত সাহস কারো আছে? তাছাড়া দোষ ধরলে সে দোষ তো শুধু দিকুর নয়, সেজন্য তো ঘরের লোকও দায়ী। অতএব এজন্য বদ্ধ-দ্বার গৃহে অনুযোগ, অভিযোগ, বাকবিতণ্ডা মারামারি সবই চলতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে ঘরের লোককে ছাড়ুই করাই একমাত্র পথ থাকে।

এতক্ষণ আমি যা-যা বললাম সেগুলির প্রায় সবই সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ-সবের মধ্যে একটা মনোবৈজ্ঞানিক দিকও আছে। এই দিক থেকে আমার বক্তব্য এবারে পেশ করছি।

এদের সমাজ-জীবন ও শাসন-ব্যবস্থা বুঝতে হলে যৌন-জীবন সম্বন্ধে এদের যে ধ্যান-ধারণা সে সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্যই দরকার একথা আমার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। মনোবিজ্ঞানের চোখ এবং মন নিয়ে আমি যেসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বহুদিন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, ভাষায় তার যথাযথ রূপ দেওয়া শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। তবুও এরি মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ এবং আমার অবক্তব্য অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি হিসাবে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব।

এদের যৌনবোধ এবং কর্মজীবনের প্রকৃতি আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে বেশ কিছুটা যে ভিন্ন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজনৈতিক ও ব্যক্তিনৈতিক মানটাও ওদের আমাদের থেকে আলাদা, একথাটাও স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু এই নীতিবোধটার প্রকৃতি কিরূপ? এবং সেটা হোলই বা কিভাবে? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর পেলে আমার বক্তব্যটিও পরিষ্কার হবে।

আমরা জানি আমাদের জীবনে নীতিবোধটা আসে শিশুকালেই, যখন মাতা-পিতার কাছ থেকে আমরা ভাল-মন্দ বিচারের শিক্ষা লাভ করি। এই শিক্ষা শুরু হয় মোটামুটি দেড়-দুই বছর থেকে। এই সময়েই উপ্ত হয় মানব জীবনে নীতিবোধের বীজ,—'অধি-শাস্তার' (Super-Ego) গোড়াপত্তন। আমার মনে হয়েছে সাঁওতালদের জীবনে এই গোড়াপত্তনেই পার্থক্য আছে। সাঁওতাল সমাজ প্রাপ্তবয়স্কের নারী-পুরুষকে যেমন নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, শিশুদের বেলাতেও মাতা-পিতারা সেই স্বাধীনতা দেয়। অর্থাৎ শিশু-পালন পদ্ধতিটাই আমাদের তুলনায় এদের ভিন্ন। যে জন্য কাম-জীবনটাই এদের ভিন্ন রকমের। অর্থাৎ কাম বা যৌন জীবনের প্রতি বোধ বা বিচার আমাদের থেকে এদের আলাদা। আমাদের অধিশাস্তার মানের সঙ্গে এদের অধিশাস্তার মান মিলবে না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : আপনি ভাবতে পারেন কি যে, তিন-চার বছরের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে গ্রামের মধ্যের রাস্তায় ('কুলিতে') বসে পরস্পরের লিঙ্গ নিয়ে মশ্‌গুল হয়ে খেলছে, পাশে তিন-চার হাত মাত্র দূরে দুই বাড়ীর লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে! প্রথম যেদিন এ দৃশ্য দেখি, প্রথমেই মনে হয়েছিল হয়তো পূর্ণবয়স্ক লোকেরা শিশুদের খেলাটা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু পরে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, "ও তো শিশু ; করবেই তো! আমরা কি করব?"

আর আমরা? এরূপ ক্ষেত্রে কি করি?

আরো দু'টি শিশুর খবর দিচ্ছি। একটির বয়স আট, অন্যটির ছয় হবে। সন্ধে হয় হয়, এমন সময় বৃদ্ধা দিদিমা বাড়ী ফিরল। বুড়ো দাদু এখনো ফেরেনি। একটু দেরী হবে আজ ফিরতে,—বৃদ্ধা বল্ল। অর্থাৎ ততক্ষনে বুড়ো হাড়াম হয়তো মাতালশালে। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গরু-বাছুর, শুয়োর, মুরগী, ছাগল এ সবের দেখাশোনা করে কে? মেয়ে কি? উত্তরে বৃদ্ধা বল্ল, না, মেয়েও তো কাজে যায়, নইলে খাবে কি? ওগুলো অর্থাৎ জন্তুগুলো দেখে ওই 'লাতি' দুটো, অর্থাৎ মেয়ের ছেলেরা। বৃদ্ধার এই মেয়ে অনেকদিন থেকে ছাডুই এর জীবন কাটাচ্ছে। পাঁচ ছ-বছর ধরে সাঙা করেনি। ছেলে দুটির এখনো বাগালিতে ঢোকার বয়স হয়নি, নইলে একটি অন্ততঃ ঢুকে পড়ত। তখন আর মাকে বা দিদিমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না। দ্বিতীয়টি একাই তখন সংসারের সারাদিনের ভার নেবে।—এখন যুবতী মেয়েটি ছেলে দুটিকে নিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে বাস করে। বুড়ো-বুড়ী থাকে অন্য একটি ঘরে। ছেলে দুটি অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের গরু-ছাগল নিয়ে মাঠে চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরে, অর্থাৎ গরু-বাছুরকে ঘরে পৌঁছে বাকি সময়টায় মারবেল, ডাণ্ডা-গুলি ইত্যাদি খেলে কাটিয়ে দেয়।

শিশুর জন্ম থেকে যদি ধরা যায় তাহলে দেখব সেখানেও ওরা আমাদের থেকে অনেক আলাদা। জন্মের পর থেকে শিশু যতদিন বুকের দুধ খাবে (সাধারণতঃ অন্য আর একটি সন্তান মার পেটে আসার নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত) ততদিন শিশুকে মা কাছছাড়া করবে না। যদি দৈবাৎ কেউ করে তাহলে তখন মার নিন্দা হবে। এরূপ কাজ সমাজ বরদাস্ত করে না। তাই দেখা যায় 'মুখ-কান স্তর'টায় এরা শিশুর পরিচর্যায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। 'পায়ু'স্তরেও অনেকটিই ঐ চেষ্টা বজায় রাখে, কিন্তু 'লিঙ্গ-কাম' স্তরে শিশু প্রায় স্বাধীন, তখন মার কোল ছেড়ে দিদির সঙ্গই হয় তার প্রধান অবলম্বন। আরো একটু বড় হলে, অর্থাৎ ছ-সাত বছর বয়স হয়ে গেলে তখন সে মুক্ত সমাজের মুক্ত সহচর, উলঙ্গ দিগম্বর।

এইরূপ প্রকৃতির প্রাঙ্গনে উলঙ্গ আবহাওয়ায় যারা মানুষ হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে উভয়েই, তাদের সংসারী হবার সময় হলে ধরা-বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বেশীদিন থাকবে কি করে? এইদিক থেকে বিবেচনা করলে এদের যে বিচিত্র রকমের বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি আছে, সেগুলি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এদের আজকের সমাজের মেয়েরা যে ভাঙন ধরিয়েছে সেটা 'ওরা'-'আমরা' এই ভেদাভেদ প্রকটভাবে আছে বলেই এতো সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমাদের আলাদা না করে পারছে না। ওরা ওদের মেয়েরা আমাদের পাল্লার মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে ওরা ওদের পাল্লার মধ্যে, ওদের নিয়ম-কানুনের বাঁধন দিয়ে বাঁধতে পারে না। এইটাই আজকে সাঁওতাল সমাজ-কর্তাদের কাছে বড় সমস্যা। মেয়েরা পুরুষদের এই দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছে, তাই আজ তারা একটু সুযোগ পেলেই সমাজের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করতে ইতস্ততঃ করছে না।

সমাজ-শাসকদের হাতে আর একটি হাতিয়ার, মনে হয় এইটাই শেষ, আছে। ক্ষেত্র বিশেষে হেথা-হোথা তার প্রয়োগ হচ্ছে। এটি হচ্ছে বোঙ্গার ভয়। ডাইনী, ভূত-প্রেত ইত্যাদি অশরীরি আত্মার ভয় এদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এদের ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ দেবার সময় ঐ বিষয়ে কিছু আলোক-সম্পাত করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই হাতিয়ারও ভোঁতা অস্ত্র বলে প্রমাণিত হতে বেশী দেরী হবে না। সাঁওতাল সমাজকে আবার নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

ওদের সমাজের ভাঙনকে রোধ করতে হলে যে নতুন পথের কথা আমার মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমি মনে করি শুধু সাঁওতাল বা শুধু দিকু অর্থাৎ 'ওরা', 'আমরা' আলাদা দুটো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমাজ বা দল, এই চিন্তা আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে, উভয় দলকেই। আজকে সাঁওতাল সমাজে যে ভাঙন সাঁওতালী মেয়েরা এনেছে এবং আনছে, যে ভাঙনকে তাদের সমাজকর্তারা সামলাতে পারছে না, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতি সত্বর করা দরকার; এবং সেটা করা সম্ভব যদি উভয় দল মিলে একটি মিশ্রিত সমাজদল সৃষ্টি করে সম্মিলিতভাবে সমাজ-শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করা যায়। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দরকার। আপাততঃ এই ব্যাপারের পণ্ডিতদের কাছে আমি সবিনয়ে আমার বক্তব্য পেশ করে আজ বিদায় নিচ্ছি।

বার্দ্ধক্যের বোঝা

জনৈক বৃদ্ধ

বৃদ্ধ এসেছেন ডাক্তারের সাথে কথা বলবার জন্য। ডাক্তার তাঁর পরম স্নেহাস্পদ, অন্তরঙ্গও বটে। ক'দিন থেকে বৃদ্ধের মনে নানা ভাবনা জমেছে। মনটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। তাই এসেছেন এই দরদী মানুষটির কাছে নিজের ভার উজাড় কোরে একটু যদি হাল্কা হতে পারেন।

রোগীর ভীড়। ডাক্তার বৃদ্ধকে অনুরোধ করেন সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা কোরতে।

এক সময় ডাক্তারের অবকাশ মেলে। বৃদ্ধের সামনে এসে বলেন, 'এক কাপ চা খেয়ে আমরা শুরু করি, কেমন জেঠামশাই?' বৃদ্ধ হেসে বলেন, 'বেশ তো, আসুক চা।'

বৃদ্ধকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপটি হাতে নিয়ে ডাক্তার সামনে এসে বসেন। বলেন, 'এবার বলুন জেঠামশাই, কি খবর? অনেকদিন পরে এলেন এবার। আমিও সময় পাইনা যে গিয়ে খোঁজ কোরব। লজ্জা বোধ হয়। শরীর ভালো আছে তো?' বৃদ্ধ জবাবে বলেন শরীর তাঁর ভালোই আছে মোটামুটি। কিন্তু মনের শান্তি হারিয়ে গেছে "সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার! পাল তুলে নৌকা চলছিল, এলোমেলো হাওয়ায় যেন পাল বাঁধন-ছেঁড়া হোয়ে নৌকোর চলায় শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। তাকে সামলে চলতে পারছিনা। সবার কাছে তো সব কথা বলা যায় না। তুমি ডাক্তার, তা'ছাড়া জেঠামশায়ের ওপর একটু মমতাও তোমার আছে, তাই এসেছি তোমার কাছে, সব কথা বলে কিছু আরাম যদি পাই।' ডাক্তার জানতে চাইলেন, মনের অবস্থা এমন হবার পেছনে কোনো কারণ আছে কিনা। বৃদ্ধ বল্লেন হঠাৎ কিছু হয়েছে, তা, বলবো না, কিছুদিন থেকেই দেখছি, মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, সামান্য কারণেই মনে বিরক্তি আসে, কোনো সমালোচনা সহ্য হয় না। রাগ হয়। সেই সঙ্গে একটা নিঃসহায় ভাব। মনটা অগোছাল হোয়ে পড়ছে দিন-দিন। বুঝতে পারছি বার্দ্ধক্যের বোঝা ক্রমশঃ চেপে বসছে। ভেবেছিলাম নিজেই ঠিক কোরে নিতে পারবো এ অবস্থাটা। কিন্তু পারছি কই? বার্দ্ধক্য আমাকে দুর্বল

কোরেছে, তাই এসেছি তোমার কাছে।' বৃদ্ধের কথা শুনে একটু চুপ কোরে থেকে ডাক্তার বল্লেন, 'বার্দ্ধক্য আপনার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে বলছেন, আপনার চলাফেরা বা জীবন যাত্রায় কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারছেন?" "বুঝতে যেন সত্যিই পারছি" বৃদ্ধ বল্লেন "আমার চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গী, কথা-বার্ত্তা সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন আমার নিজের কাছেই ধরা পড়ছে। তাদের পূর্ব্বের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য তারা হারিয়ে ফেলেছে। সিন্ধবাদ নাবিক বহু চেষ্টায় ঘাড় থেকে দৈত্যকে নামাতে সক্ষম হোয়েছিল, কিন্তু আমার বার্দ্ধক্য অনড় বোঝা হোয়ে আমাকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এ বোঝা একটু হাল্কা করা যায় না, ডাক্তার?"

'শরীরে জরা এলেও মন তো সচল থাকে, জেঠামশাই, নিজের পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনি যথেষ্ট সচেতন, আপনার মনে তো জরা আসে নি, নৈরাশ্যকে দূর করা কি খুবই অসম্ভব?' ডাক্তারের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রশ্নে বৃদ্ধ হেসে বল্লেন, 'বহু বছর আগেকার কথা, ইংলণ্ডের একটা গ্রামের পথে বেড়াচ্ছি, পথের দু'ধারে মাঝে-মাঝে বাড়ী। একটা বাড়ী থেকে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা আমাকে দেখে চীৎকার কোরে বলতে থাকে, 'ব্ল্যাকি, ব্ল্যাকি,' তাদের অভিভাবিকা তাদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সেদিন সে কথা কেবল-মাত্র ছোটদের ছেলেমানুষী বোলে মনে হয়নি, কিন্তু তবু তা সহ্য করবার মতো মনোবল ছিল, যেমন ছিল শারীরিক শক্তি। কিন্তু আজ যখন বাসে-ট্রামে, পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে ছেলেরা, 'বুড়ো' বলে অবজ্ঞা বা অনুকম্পা করে—সহ্য হয় না। কিন্তু শরীরে বা মনে কোথাও বল পাই না প্রতিবাদের। নিজের অক্ষমতায় মনের তিক্ততাই বাড়ে কেবল।' বৃদ্ধের মনের ক্ষোভ লক্ষ্য কোরে ডাক্তার বলেন, 'পরিবেশ আমাদের ছেলে-মেয়েদের চরিত্রে নানা ত্রুটি এনেছে, সেতো আপনাদের অজানা নয়, জেঠামশাই। এসব সহজে দূর করাও সম্ভব নয়, কাজেই একে অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কি? ভুলে যান এসব।' বৃদ্ধ বলেন, 'ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? দীর্ঘ দিন বাইরের দুনিয়ার সাথে নিজের অজ্ঞাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলেছি। আজ সেই চেনা দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনা বড় কঠিন। অথচ সেই দুনিয়া তো আমাকে চায় না। প্রতিপদক্ষেপে আমি বুঝতে পারছি সংসারে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সর্ব্বত্রই আমি অযাচিত।,

বৃদ্ধের এই খেদোক্তিতে (হাহাকারে) ডাক্তার অত্যন্ত বেদনা বোধ কোরলেন, বল্লেন, 'আচ্ছা জেঠামশাই, আপনার চাকুরী জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যে কর্মতৎপরতা, যে নিষ্ঠা আপনার ছিল, তা'তে বিশ্বাস হয়না যে আপনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ কোরেছেন, বা কাজে আপনার ক্লান্তি এসেছিল। কি হোয়েছিল, বলুন তো ব্যাপারটা?'

বৃদ্ধ হেসে বল্লেন, 'ব্যাপার কিছুই না। সুস্থ দেহে দীর্ঘদিন কাজে ডুবে ছিলাম, বয়স বাড়ছে সে কথা মনে আসেনি বা আসতে দিইনি। কাজের ভেতর দিয়েই জীবন-সূর্য অস্তাচলগামী হোয়েছে। কিছু অনুভব করিনি। কিন্তু আমার আপনজনদের বিচারে আমার অবসর গ্রহণের সময় হোয়েছিল এবং কতকটা তাদেরই আবদারে (অবশ্যই স্নেহের) কর্মজীবন থেকে বিদায় নিয়েছি।'

ডাক্তার বল্লেন, আজকে আপনার মন তবে এত অশান্ত কেন? নিজেকে অপ্রয়োজনীয়ই বা ভাবছেন কেন? আপনার আপনজনদের স্নেহ-মমতাই তো আপনাকে গৃহমুখী কোরেছে। আপনি তো কোথাও অবাচিত নন।' বৃদ্ধ হেসে বল্লেন, 'সব টুকু শোন, তবে হয়তো বুঝতে পারবে। কাজ থেকে অবসর নিয়ে প্রথম ২।১ মাস তেমন কিছু পরিবর্তন টের পাইনি। প্রিয়জনদের স্নেহ-মমতায় নুতন পরিবেশে শান্তিতেই কেটেছে দিন। কিন্তু বেশীদিন তা' চললো না। যেন একটা সাময়িক আবেশ ধীরে-ধীরে কেটে গেল। এক ধরনের ক্ষোভ মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে লাগলো। কার বা কিসের বিরুদ্ধে সে ক্ষোভ সঠিক তোমায় বলতে পারবো না। হয়তো নিজের বার্দ্ধক্য বা বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্বলতার বিরুদ্ধে।" বৃদ্ধের কথার মাঝখানে ডাক্তার জানতে চান বাড়ীতে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা। বৃদ্ধ বলেন, "না ডাক্তার, দু:খ পাবার মত কোনো কিছু ঘটেছে বলে বলতে পারবো না। মনে হচ্ছে যেন আমি নিজেই বদ্‌লে যাচ্ছি। তবে আমার এ পরিবর্তন পরিবার-পরিজন সহজভাবে নিতে পারে কিনা তা কি কোরে বলবো। আমি তেমন কিছু বুঝিনা, তবে খুটি-নাটি ঘটনা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে তার অর্থ ইচ্ছামত কদর্থ করা যায় বৈ কি! কেউ কিছু বলেনা, তবু মনে হয় কর্মচঞ্চল দুনিয়া থেকে আমায় যেন ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হোচ্ছে। আমি যেন দূরের মানুষ, সে দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার আমি নই, সেখানে আমার স্থান নাই। এই পরিস্থিতিতে সময় আর কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে ভাবি অন্য কোথাও ক'দিন কাটিয়ে আসি। তুমি তো জান, যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে, নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে কত দেশ-বিদেশ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। সে সব দিন আর নাই, বয়সও হোয়েছে, তা'ছাড়া চলা-ফেরায় আজকাল নানা দুর্বিপাকের সম্মুখীন হোতে হয়, চারদিকে অসংযত বিশৃঙ্খলা।" ডাক্তার সায় দিয়ে বল্লেন, "এ সম্পূর্ণ খাঁটি কথা, জেঠামশাই। নিশ্চিন্তে চলার দিন আর নাই। সেজন্যে কোথাও বেড়াবার বাসনা আমরাও প্রায় পরিত্যাগ কোরেছি।"

`

"বাঁধন ছেঁড়ার' দিনটির প্রতীক্ষায় বসে আছি, ডাক্তার", বৃদ্ধ পূর্ব কথার রেশ ধরে বলতে শুরু কোরলেন, "ভবিষ্যৎ অজানার অন্ধকারে, অতীতের স্মৃতিচারণ বেদনাদায়ক,

বর্তমানের আমাদের ঠাঁই নাই। তুমি জান, ব্যর্থতার ক্ষোভ আমার থাকতে পারেনা কারণ আগন্তিক অর্থে ব্যর্থ আমি নই। আমার সমস্যা অন্যত্র। আমি জানি, আমি বৃদ্ধ হোয়েছি। আমার চাল-চলন, কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গীতে বার্দ্ধক্যের ছাপ প্রকট হোয়ে উঠছে দিন-দিন। সব চেয়ে বেশী পরিবর্তন এসেছে আমার মনে। দেহের অন্য পরিবর্তনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার প্রতিক্রিয়া মনের ওপরেও যে কম নয় সে তো ডাক্তার তুমি বুঝবে।" "কথা বলতে এখন ক্লান্তি বোধ হোচ্ছেনাতো জেঠামশাই?" ডাক্তার জানতে চান। "না, তোমাকে বলতে পেরে বরং হাল্কাটাই লাগছে। এবার শোন। কেমন একটা উদ্বেগময় অলসতা— নিষ্ক্রিয়তা বলতে পার, আমার মধ্যে শুধু চেপেই বসেনি, দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। মনের সহজ, স্বচ্ছন্দ বা নিরলস গতি আর নেই। কোনো কিছুতে উৎসাহ পাই না। তবে নিষ্ক্রিয় হোলেও মন কিন্তু আদৌ বেকার নয়। নানা এলোমেলো ভাবনা, ভয়, আনাগোনা করে সেখানে। তার অধিকাংশই অবান্তর, অবাস্তব, হয়তো বা কখনো অশোভনও। অতীতের সূত্র ধরে তারা বাস্তবে রূপ নেয়। তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা মনের আর নেই এবং ভাবনারও আর শেষ নেই। নির্দিষ্ট কোনো ধারায় সে সব ভাবনা আসে না, কিন্তু স্থায়ী আসন পেতে বসে, কখনো একটিকে চাপা দিয়ে অন্যটি প্রাধান্য পায়, কিন্তু ছেড়ে যায় না। আমি দিশেহারা হোয়ে পড়ি। এ ছাড়া যত সব অপ্রিয়, অবাঞ্ছিত, অমঙ্গলের ছবি মনে ভেসে ওঠে। চেষ্টা করি, কিন্তু এদের আসা-যাওয়া রোধ কোরতে পারিনা। যে সব ভাবনা আমি মোটেই আমল দিতে চাই না, দূরে ঠেলে দিতে চাই, মন তাদের বেশী আস্কারা দেয়। আমি আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ে পড়ি।" ডাক্তার প্রশ্ন করেন, "জেঠামশায় কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন না এখন?" "তাই তো আমি চাই" বৃদ্ধ বলেন, "এবং তাতে মনটাও কিছু সংযত থাকবে। কিন্তু কোন্ কাজ এবং সে কি সম্ভব? তা ছাড়া সে পরিবেশ কোথায়? কাজ নিয়ে যতদিন ছিলাম, অবান্তর চিন্তা বা অসঙ্গত ভাবনা মনে এলেও তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।" "কাজ থেকে তো স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন," ডাক্তার বলেন। "হ্যাঁ, নিলাম। এ বয়সে একা থাকতে ভয়-ভয় করে। তা ছাড়া চিরদিনই চেয়েছি আপনজনের সঙ্গ—সে সঙ্গই আমার হাতের লাঠি, যাকে ভর কোরে বাকী দিনগুলো পাড়ি দেব। তাই চলে এসেছিলাম।" "দিন কয়েক অন্য কোথাও কাটিয়ে আসুন। আপনাকে ভালবাসে, কাছে পেতে চায়, এমন পরিচিত জনের তো অভাব নেই, যার কাছে যাবেন তিনিই খুশী হবেন। যদি অভয় দেন তো বলি, আমার কাছে এসে থাকুন দিন কয়েক। আপনার সেবা-যত্ন কোরতে পেলে আপনার বৌমা

খুশীই হবে।" বৃদ্ধ স্নেহমাখা স্বরে বলেন, "তা আমি জানি। তবে কি জানো, পরিবেশ বদলাতে হোলে একটু দূরেই যেতে চাই। কিন্তু একা যাতায়াত কোরতে ভয় পাই। বিশেষতঃ স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ হোয়ে পড়েছে যে চলাফেরায় সেটাও একটা অন্তরায় সৃষ্টি করে। অনেক কিছুই ভুলে যাই। অতি নিকট আত্মীয়ের নামও অনেক সময় মনে আসে না।" ডাক্তার বলেন, "জেঠামশাই, আপনার অবস্থা তাদের চেয়ে ভালো যারা পরিবারের লোকদেরও নাম সময়-সময় স্মরণে আনতে পারে না বার্দ্ধক্যে। এমন কি চিনতেও পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীর ও মনের ক্ষয় শুরু হয় প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মে। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, দেহের অন্য কোনো অংশের ক্ষয় শুরু হওয়ার আগে শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে। অনেক অল্প বয়স থেকে সে ক্ষয় এত ধীরেও কম মাত্রায় হোতে থাকে যে পরিবর্ত্তন সহজে ধরা পড়ে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ বাড়ে—তখন কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই বলতে হয়, কি বল্লেন? তাছাড়া বার্দ্ধক্যে সবারই স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, কারো কম, কারো বেশী।" বৃদ্ধ বলেন, "আমার সৌভাগ্যই বলবো যে আমার শ্রবণশক্তি এখনো তেমন ক্ষীণ হয়নি। কিছুটা হোয়েছে, তা বুঝি। কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু বিস্মৃতি আমাকে ক্লিষ্ট কোরেছে, দুর্ব্বল কোরে তুলছে দিন-দিন। যদিও জানি এটা বার্দ্ধক্যের একটা অপরিহার্য্য অবদান, কিন্তু মেনে নিতে পারি না। মন চায় না।"

ডাক্তার বলেন, "জেঠামশাই, আপনাকে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা, আপনি সবই জানেন। তবু বলি। বয়স সবারই বাড়ছে। মানুষ চায় কি চায়না তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর সেটা নির্ভর করে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে ও দেহে পরিবর্ত্তন দেখা দেবেই। যৌবনে এবং প্রৌঢ় বয়সে যে কর্ম্মশক্তি বা সামর্থ্য মানুষের থাকে, বার্দ্ধক্যে তা নষ্ট হোয়ে যায়, তার জন্যে মনে দুঃখ আসতে পারে, কিন্তু তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। সে আশা, সে চেষ্টা শুধু নিষ্ফল নয়, অসঙ্গতও বটে। অতীতের স্মৃতি মনকে ক্ষুব্ধ কোরতে পারে, কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তো চলবে না। জেঠামশাই তাকে বলতে হবে, তোমার দিন ফুরিয়েছে তুমি এখন অতীত। আমাকে এভাবে পীড়ন কোরবে তা আমি হোতে দেব না। তোমার স্মৃতির ওপর আমি বর্ত্তমানকে প্রতিষ্ঠিত কোরবো, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো।

"সব মানুষকে সব বয়সেই বর্ত্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বার্দ্ধক্যের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হোল বর্ত্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সহজ জীবন যাপন করবার

প্রয়াস। হোঁচট খেতে হবে হয়তো, পড়ে গেলে আবার উঠতেও হবে। জানেন জ্যেঠামশাই, আপনাকে দেখে, আপনার সঙ্গে কথা বলে এ বিশ্বাস আসে যে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা আপনার আছে এবং আপনি তা পারবেন। আমার একান্ত অনুরোধ, জেঠামশাই, নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না।" ডাক্তারের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বল্লেন, 'আমাকে স্নেহ কর, শ্রদ্ধা কর তুমি। কিন্তু আশে-পাশে সব বৃদ্ধদের দেখে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে আর পারছি কই? অধিকাংশই দেখি দিশেহারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। সময় তা'দের কাটেনা, মুখে হতাশা, অভাব, অভিযোগ। বর্তমানের বিরুদ্ধেই তাদের অভিযোগ। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছেন, এমন বৃদ্ধ তো কই চোখে পড়েনা। অধিকাংশেরই দেখি—দেহে-মনে ক্লান্ততা, উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন তা'দের জীবন; রিক্ত, নিঃস্ব।" এমন সময় ডাক্তারের স্ত্রী এসে বৃদ্ধকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরে বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললেন' "জেঠামশাই, ঘরে একটু খাবার তৈরী কোরেছি। জানি, অসময়ে আপনি কিছু খাননা, তবু আমার ভারী সাধ আপনাকে একটু খাওয়াই।" বৃদ্ধ হেসে বল্লেন, এবার তুমি বিপদে ফেললে, মা। ঠিক আছে, তোমাকে নিরাশ করবো না। নিয়ে এস সামান্য কিছু।" ডাক্তারের স্ত্রী চলে গেলে বৃদ্ধ বল্লেন, "ডাক্তার, মায়েদের মুখের মিষ্টি হাসিটুকু আমাকে ভারী তৃপ্তি দেয়। ওদের আবদার ঠেলতে মন চায় না।" ডাক্তারের স্ত্রীর হাতের খাবার খেয়ে বৃদ্ধ আবার শুরু কোরলেন, "সূর্যাস্তের পর বাইরে থাকা আমার নিষেধ। সেদিন ফিরতে দেরী হোলো। বিরক্তিপূর্ণ অনুযোগ শুনতে হোলো, শুনতে হোলো আমার বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। শুনে আমার রাগ হোল। বললাম, 'এক-আধটু দেরী হওয়া এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, কদাচিৎ কখনো তা' হোতেও পারে। জবাব আসে, ব্যাপারটা আমার কাছে কিছু না হোতে পারে, তবে যারা আমার জন্যে দায়ী, একটা কিছু ঘটে গেলে লোকের কথা তো তাদের শুনতে হবে। এদিক দিয়ে আমি অবশ্য চিন্তা করিনি। দুর্ঘটনার আশঙ্কা তা'দের হোতে পারে বৈ কি। এ ন্যায় বুঝতে পেরে চুপ কোরে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারিনা, এটা স্নেহের শাসন না অবাঞ্ছিতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ! বুঝলে ডাক্তার সব কিছু মিলে বার্দ্ধক্যের বোঝা আরো ভারী হোয়ে উঠেছে। কিন্তু কি কোরবো বলতো। প্রাণবন্ত সচল দুনিয়ার এক পাশে সরে থাকাই কি বার্দ্ধক্যের নিয়তি? এক পাশে পড়ে থেকে শুধু দেখা, শুধু দিন-যাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে শেষ দিনটির প্রতীক্ষা? প্রাণ তো এখনো আছে, তবে কেন এই প্রাণ-চঞ্চলতায় আমার অংশ থাকবে না? বৃদ্ধদের কি দেবার কিছু নেই? তা'দের ভবিষ্যৎ বোলে কিছু নেই; বর্তমানে থেকেও যদি তারা না-থাকার সামিল হয়, শুধু অতীতের রোমন্থন কোরে, সে সব দিনের জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসানের

স্মৃতিচারণ কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন কাটাবে? তোমরা নতুনরা বল, বৃদ্ধেরা—পুরোনোরা মানিয়ে চলতে পারেন না। সময়-সময় অর্থহীন কথা বলেন, আত্মসম্মান-বোধ তাঁদের নষ্ট হোয়ে গেছে। তোমরা কি স্বীকার করবে না যে বৃদ্ধদেরও মান-অভিমান, বাসনা-অভিলাষ থাকতে পারে? না ডাক্তার, তাদের একপাশে সরিয়ে রেখোনা। দীর্ঘ দিন দুনিয়াকে তারা দেখেছে, তাদের অন্তরে যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, তাদের যা' দেবার, তা'দের কাছ থেকে যা' তোমরা নিতে পার, তা নেবার জন্ত এগিয়ে এস। একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা নিয়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখ। তোমাদের কাছ থেকে অবহেলার অপমান তাদের বুকেও বাজে। তারা নিজেদের আরো নিঃসহায়, নিরর্থক মনে করে।"

আবেগ-অভিভূত বৃদ্ধের দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ডাক্তার। হয়তো তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু কি কোরে এ সমস্যার সমাধান কোরবেন, বুঝে উঠতে পারেন না।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বৃদ্ধ উঠে বললেন, "তোমার অনেকটা মূল্যবান সময় তুমি আমায় দিলে ডাক্তার, তোমার স্নেহের সুযোগ হয়তো মাঝে-মাঝে আমাকে নিতে হবে আরো—যদি তোমার সময় হয়।" ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবেন, জেঠামশাই! ভালোই লাগে আমার, আপনি এলে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। আমার একটু হাঁটাও হবে।"

মানস অভীক্ষা (৫)

বুদ্ধি পরিমাপ

দীপালি বসু *

যে সমস্ত বুদ্ধি-অভীক্ষার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে সেগুলি মূলতঃ এককভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই সমস্ত অভীক্ষাগুলি একই সময়ে মাত্র এক জনের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। কাজেই এগুলির ব্যাপক প্রয়োগ খুবই সময়-সাপেক্ষ। তাছাড়া এগুলির সঠিক প্রয়োগ এবং উত্তরের সঠিক মূল্যায়ণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত পরীক্ষকের প্রয়োজন। কাজেই যে সমস্ত ক্ষেত্রে অল্প সময়ে অনেক লোকের বুদ্ধির পরিমাপ করা দরকার হয়, যেমন সামরিক বাহিনীতে বা কোন শিল্পে উপযুক্ত প্রার্থী নির্ব্বাচন করার সময় ইত্যাদি, তখন ঐসব একক অভীক্ষার প্রয়োগ খুবই অসুবিধাজনক। এই সব কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মনোবিদ্‌গণ দলগতভাবে প্রয়োগ সম্ভব এমন বুদ্ধি-অভীক্ষা তৈরীর চেষ্টা করেন।

১৯১৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের পর দলগতভাবে প্রয়োগের জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্র ভাবে অনুভূত হয়। কারণ সামরিক বাহিনীতে উপযুক্ত লোক-বাছাইয়ের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোকের বুদ্ধির পরিমাপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এককভাবে বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ করে লক্ষ-লক্ষ লোকের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কাজেই এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য-বিভাগে একটি মনস্তাত্বিক-বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের প্রচেষ্টায় আর্মি আলফা (Army Alfa) ও আর্মি বিটা (Army Beta) নামে দুটি দলগতভাবে প্রয়োগ-যোগ্য বুদ্ধি-অভীক্ষা তৈরী হয়। আর্মি আল্‌ফা অভীক্ষাটি বাচিক (Verbal) এবং আর্মি বিটা হল একটি কৃত্যাভীক্ষা (Performance Test)। এই দুটি অভীক্ষা তৈরীর ব্যাপারে যে সমস্ত মনোবিদের বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে তার মধ্যে আর্থার এস. ওটিসের (Arthur S. Otis) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য-বিভাগের এই প্রচেষ্টাকে দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষা উদ্ভাবনের ব্যাপারে সার্থক প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের

---

* মনঃসমীক্ষণ শিক্ষার্থী;

জন্য যে সকল দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষা তৈরী হয়েছে, সেগুলি এই আর্মি আলফা ও আর্মি বিটা এই অভীক্ষা দুটিকে অনুসরণ করেই করা হয়েছে। অর্থাৎ দলগত অভীক্ষা তৈরীর ব্যাপারে এদের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল মানস-অভীক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বৈজ্ঞানিক মাপকাঠির বিচারে এই আর্মি আলফা ও আর্মি বিটা খুব উচ্চমানের না হলেও সৈন্যদলের বিভিন্ন বিভাগে উপযুক্ত লোক-নিয়োগ ও বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা দুটির প্রয়োগের ফলাফল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। এই সময় প্রায় সাড়ে সতেরো লক্ষ লোকের উপর এই অভীক্ষা দুটি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে মনোবিদ্‌গণ অনেক তথ্য পান। এই সব তথ্য মনোবিদ্‌দের গবেষণার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়।

দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে সাধারণতঃ গণ-পরীক্ষার (Mass testing) হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া ষ্ট্যানফোর্ড-বিনের অভীক্ষা বা ওয়েসলারের অভীক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষককে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দলগত অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপুর্ণ। কারণ এই ক্ষেত্রে পরীক্ষকের কাজ হল পরীক্ষার্থীদের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া ও সঠিকভাবে পরীক্ষার সময় গণনা করা। পরীক্ষকের ভূমিকা কম গুরুত্বপুর্ণ হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মোটামুটিভাবে এক রকম থাকে। একক অভীক্ষা অপেক্ষা দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের উত্তর মুল্যায়নের পদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত বিষয়গত (objective)।

একক অভীক্ষার চেয়ে দলগত অভীক্ষার দ্বারা বেশী নির্ভরযোগ্য স্বমিতি (norm) পাওয়া যায়। কারণ অল্প পরিশ্রমে দলগত অভীক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোকের উপর প্রয়োগ করা যায়। একক অভীক্ষা প্রমাণ-বিধানের (Standardization) জন্য যেখানে ২ থেকে ৪ হাজার লোককে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, সেখানে দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১ থেকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

একক অভীক্ষা অপেক্ষা দলগত অভীক্ষার কতগুলি সুবিধা থাকলেও এবং বর্তমানে এর আবশ্যকতা স্বীকার করলেও এর অসুবিধাগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। দলগত অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরীক্ষক অন্তরঙ্গতা (rapport)

স্থাপন করতে পারেন না। কাজেই পরীক্ষার প্রতি পরীক্ষার্থীর আগ্রহ বজায় রেখে পরীক্ষার্থীর সহযোগিতা লাভের সুযোগ পরীক্ষকের নেই বললেই চলে। অথচ অভীক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষার্থীর আগ্রহ ও সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। সাময়িক অসুস্থতা, ক্লান্তি, উদ্বেগ ইত্যাদি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে। একক অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক এই সব কারণগুলি অনেক সময়ই বুঝতে পারেন। কিন্তু দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া পরীক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষার্থীর আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করাও (observe) সম্ভব নয়; যদিও এই সময় পরীক্ষার্থীর আচার-আচরণ ঠিকমত লক্ষ্য করলে তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। কাজেই কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দলগত অভীক্ষা অপেক্ষা একক অভীক্ষার প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়।

বিনে-সাইমন ইত্যাদি একক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগের সময় সব পরীক্ষার্থীকে সব গুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। কোন প্রশ্ন থেকে শুরু করতে হবে তা পরীক্ষার্থীর বয়স দেখে পরীক্ষক মোটামুটিভাবে ঠিক করেন। কিন্তু দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে সব পরীক্ষার্থীকে সব প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। কাজেই দলগত অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ-সীমা (range of application) একক অভীক্ষার তুলনায় অধিক ব্যাপক। বিনে-ষ্ট্যানফোর্ড অভীক্ষাটি তিন বছর থেকে একেবারে উন্নত বয়স্ক-স্তর পর্যন্ত সকলেরই বুদ্ধির পরিমাপের মাপকাঠি। কিন্তু দলগত অভীক্ষাগুলির কোনটি হয়তো শুধু ছোট শিশুদের জন্য, কোনটি আবার বিদ্যালয়গামী ছেলে মেয়ের জন্য, কোনটি হয়তো কলেজ-স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য, কোনটি আবার শুধু বয়স্কদের পক্ষে উপযোগী।

ছোট শিশু থেকে বয়স্ক-স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের জন্যই বর্তমানে একাধিক দলগত-অভীক্ষা আছে। এর প্রত্যেকটি অভীক্ষার বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কাজেই প্রতিটি স্তরের উপযোগী দু-একটি অভীক্ষার পরিচিতি নীচে দেওয়া হল।

খুব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে দলগত-অভীক্ষার প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ এদের ক্ষেত্রে অভীক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দলগত-অভীক্ষা প্রয়োগের সময় ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে ৫-৬ বছর বয়সের শিশুদের ১০-১৫ জন করে ছোট-ছোট দলে ভাগ করে দলগত-অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষকের পরীক্ষার্থীদের প্রতি অধিক ব্যক্তিগত নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই বয়সের শিশুদের

পরীক্ষা করার সময় মুখে-মুখে সমস্ত নির্দেশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কোন-কোন সময় শিশুরা পরীক্ষার নির্দেশ সঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা তা অনুমান করার জন্য ২-১টি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষকের সামনেই করতে বলা হয়। যে সমস্ত অভীক্ষা শিশুদের দেওয়া হয় তার অধিকাংশগুলিতেই সাধারণতঃ ছবি বা নক্সা (diagram) আঁকা থাকে। তার মধ্যে কোনটি সঠিক ছবি বা কোনটি অন্যগুলির থেকে পৃথক তা শিশুদের দাগ দিয়ে নির্দেশ করতে বলা হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে ছোট-ছোট বিন্দু যোগ করে দাগ দিতে বলা হয়।

স্পষ্টতঃই নার্সারি বা প্রাথমিক-স্তরের শিশুদের পরীক্ষার সময় লেখা বা পড়া কোন-দিক দিয়েই কোন ভাষার ব্যবহার নেই। তাই এই সমস্ত অভীক্ষাগুলিকে অনেকে অবাচিক (non verbal) অভীক্ষা বলে থাকেন। কিন্তু এই নামটি এই অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য নয়। কারণ এইসব অভীক্ষার ছবির সাহায্যে শিশুদের বাচিক-বোধশক্তিরও (Verbal comprehension) পরিমাপ করা হয়। কাজেই এইসব অভীক্ষাগুলিকে অবাচিক অভীক্ষা না বলে সচিত্র অভীক্ষা (Pictorial) বা অপঠন (non-reading) অভীক্ষা বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানসিক বুদ্ধি-বৃত্তি পরিমাপের জন্য যে সব দলগত অভীক্ষার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে ওটিস্-লিনন অভীক্ষার (Otis-Lennon Mental Ability Test) নাম উল্লেখযোগ্য। এই অভীক্ষাটির প্রশ্নগুলি কি ধরণের তা বোঝাবার জন্য নিচে কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের বিবরণ দেওয়া হল।

১। শ্রেণী-বিভাগ (classification)—চারটি করে বিভিন্ন জিনিষের ছবি বা নক্সা আঁকা আছে। তার মধ্যে যেটি অপর তিনটি থেকে পৃথক তাতে দাগ দিতে বলা হয়েছে।

২। বাচিক-ধারণা (Verbal conceptualization)—চারটি ছবি দেওয়া আছে তার মধ্যে যে ছবিটিতে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে তার নিচে দাগ দিতে হবে।

৩। মাত্রিক-বিচারশক্তি (quantitative reasoning)—প্রথমে একটি বৃত্ত আঁকা আছে। বৃত্তটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তার-পর পর-পর কয়েকটি করে বিন্দু দেওয়া আছে। ঐ বৃত্তটি যে কটি ভাগে বিভক্ত সেই কটি বিন্দু যেখানে আঁকা আছে সেটি নির্দেশ করতে বলা হয়েছে।

৪। সাধারণ জ্ঞান (general information)—টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও এবং ক্যামেরার ছবি আঁকা আছে। এর মধ্যে যেটির সাহায্যে আমরা কথা বলি সেটি নির্দেশ করতে হবে।

৫। নির্দেশ অনুসরণ করা (following directions)—একটা গ্লাসের চার রকম ভাবে চারটি ছবি আঁকা আছে। এর মধ্যে যে ছবিটিতে গ্লাসটিকে একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে এবং তার মাথায় একটি ক্রস্ (+) চিহ্ন দেওয়া আছে সেটিকে নির্দেশ করতে হবে।

এই ওটিস্-লিনন অভীক্ষাটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। এতে প্রথম ভাগে ২৩টি ও দ্বিতীয়-ভাগে ৩২টি প্রশ্ন আছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এইসব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সমস্ত দলগত অভীক্ষার উদ্ভাবন হয়েছে তার মধ্যে লর্গে-থর্ণডাইকের Lorge-Thorndike Multi-Level Battery) অভীক্ষাটির (B স্তর) নাম উল্লেখযোগ্য। এতে পাঁচটি স্তর আছে। এই সম্পূর্ণ অভীক্ষাটি ৫।৬ বছরের শিশুদের থেকে ১২ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী। এর পাঁচটি স্তরের B স্তরটি কেবলমাত্র চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী। এতে বাচিক ও অবাচিক দু'টি অংশ আছে। বাচিক পরীক্ষার মধ্যে আছে—শব্দজ্ঞান (vocabulary), বাক্য শেষ করা (Sentence completion), আঙ্কিক বিচার-শক্তি (Arithmetic reasoning), বাচিক শ্রেণী-বিভাগ (verbal classification), বাচিক উপমা (vebal analogies) এবং অবাচিক পরীক্ষার মধ্যে আছে—সংখ্যার শ্রেণী বিভাগ (classification of numbers) এবং সংখ্যার উপমা (number analogies)।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী দলগত-অভীক্ষাগুলির মধ্যে স্কুল ও কলেজ-সামর্থ্য পরীক্ষার (School and College ability test) নাম করা যেতে পারে। এই অভীক্ষার দুই নং স্তরটি ১০ থেকে ১২ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলে-মেয়েদের উপযোগী। এর A ও B নামে দুটি তুল্য আকার (equivalent form) আছে। প্রধানতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষায় শিক্ষার্থী কতটা উৎকর্ষতা দেখাতে পারে তার ভবিষ্যৎবাণী করার উদ্দেশ্যেই এই অভীক্ষাটির উদ্ভব হয়েছে।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে যে সমস্ত দলগত অভীক্ষা তৈরী-করা হয়েছে তার অধিকাংশগুলিই বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে

ব্যবহারের জন্য কয়েকটি অভীক্ষাও তৈরী করা হয়েছে। যেমন পিন্টারের উচ্চতর অভীক্ষা (Pinter Advanced Test), আর্মি আল্‌ফা, আর্মি বিটা এবং আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন টেষ্ট (Army General Classification Test)। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আর্মি আল্‌ফা সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। পরে অসামরিক লোকেদের ব্যবহারের উপযোগী করে এই অভীক্ষাটির কয়েকটি সংশোধন প্রকাশ করা হয়। এই সংশোধনগুলির মধ্যে 'আলকা-৯' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগের প্রয়োজনে আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন টেষ্টটি উদ্ভাবিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে বয়স্কদের বুদ্ধি-পরিমাপের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে কুইক ওয়ার্ড টেষ্ট (Quick Word Test) নামে একটি ছোট অভীক্ষা তৈরী করা হয়। একটি প্রয়োগ করতে মোট ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে। পরে স্কুলের ও কলেজের ছেলে-মেয়েদের ও বিভিন্ন বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপযোগী করে অভীক্ষাটিতে কয়েকটি স্তরের সংযোজন করা হয়।

বর্তমান শতাব্দীকে গতির যুগ বলা যেতে পারে। এখন সকলেরই চেষ্টা কি করে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ করা যায়। কাজেই নানান ক্ষেত্রে বর্তমানে দলগত অভীক্ষা-গুলির ব্যাপক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ব্যাপক প্রয়োগ অভীক্ষাগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে দূর করে এগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য ও সঠিক করে তুলতে সহায়তা করবে।

যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রচলন এখন রয়েছে তার সবগুলিই পাশ্চাত্য-দেশে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সমস্ত অভীক্ষার অধিকাংশগুলিই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই শিক্ষার মান, সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব দেশে এক রকম নয়। . যে সকল প্রশ্ন পাশ্চাত্য দেশের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে উপযোগী তার সব গুলি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী নয়। কাজেই এই সব বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে আমাদের দেশে সঠিক প্রয়োগ করতে হলে সেগুলিকে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করে সংশোধন করা প্রয়োজন। অভীক্ষাগুলি আমাদের দেশে ব্যাপক প্রয়োগ করে নির্ভরযোগ্য স্বমিতি ঠিক করা দরকার। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের দেশ এখনও এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি।

আত্মনিগ্রহামোদী (Masochist) ফিলিপস্-এর মনোবিশ্লেষণ

অমল শঙ্কর রায়

ফিলিপস্ সোমারসেট মম-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শৃঙ্খলিত মানব' (of Human Bondage)-এর প্রধান নায়ক।

এ চরিত্র-চিত্রণ শুধু শিল্পকলার গৌরবে সমৃদ্ধশালী নয়, অনুসূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণীশক্তির এক আশ্চর্য রূপও এ স্থলে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া জ্ঞাত হওয়া যায়, উক্ত নায়কের ভিতর এক ধরনের আত্মনিগ্রহামোদী (Masochism) মনোভাব তার জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিশোর বয়স্ক ফিলিপস্ অত্যন্ত সংবেদনশীল, ক্ষীণকায়, খঞ্জ ও সে তার দেহ-বিকৃতির জন্য আত্ম-সচেতন। ফিলিপস্ পিতৃ-মাতৃহীন ও পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত। পিতৃব্য একজন ধর্মযাজক। তিনি ফিলিপস্-কে স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলে সে তার বিকৃত দেহের জন্য সহপাঠীদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়। তার জীবন সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। শিক্ষকেরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করেন না। একজন শিক্ষক তো সোজাসুজি তাকে 'বিকৃতপদ নির্বোধ' বলে সম্বোধন করেন।

পিতৃব্যের ইচ্ছা ফিলিপস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। কিন্তু ফিলিপস্-এর ইচ্ছা তা নয়। সে অন্য কোন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়। পরিশেষে সে হাইডেলবার্গ-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এক বৎসর কাল সে ঐ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়ন করে। তার পর ফিরে আসে পিতৃব্যের গৃহে। ঐ সময় এক বয়স্কা নারীর (এক শিক্ষয়িত্রী) সঙ্গে তার প্রেমঘটিত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঐ নারীর নাম কুমারী উইলকিন্সন।

এর পর ফিলিপস্ লণ্ডনে যায় হিসাব-রক্ষক হিসাবে শিক্ষানবীশী করতে। কিন্তু ঐ কাজে সে কৃতী হতে পারেনি। তখন সে যায় প্যারিসে চিত্রশিল্পী হবার অভিপ্রায়ে।

সেখানে ক্যানী মার্মী এক তরুনীর সঙ্গে তার বন্ধুতা জন্মায়। ক্যানী অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে সে আত্মহত্যা করে।

ফিলিপস্ দুই বৎসর ধরে ঐ কলাভবনে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু ঐ শিক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষ একদিন তাকে ডেকে জানিয়ে দেন চিত্রশিল্পী হিসাবে সে পূর্ণমাত্রায় ব্যর্থ। ফিলিপস্ নিরবে ঐ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে।

এবার ফিলিপস্ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। ঐ সময়ে সে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ বলে মনে করে। তখন মিলড্রেড নামক এক তরুণীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। দুজনের ভিতর বেশ সদ্ভাব জন্মায়। ক্রমশঃ ঐ অনুসঙ্গ প্রেম-বোধে পর্যবসিত হয়। মিলড্রেড এক চায়ের দোকানের পরিচারিকা।

মিলড্রেড ফিলিপস্-কে সঙ্গ দান করে বটে তবে ঘনিষ্টভাবে তার সঙ্গে মেশে না। ফিলিপস্ এটা লক্ষ্য করে বিশেষ বেদনা অনুভব করে। একদিন সে মিলড্রেডের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়।

মিলড্রেড এমিল নামক এক যুবকের সঙ্গে ঘোরাফেরা সুরু করে। ফিলিপস্ এতে বিরক্ত বোধ করে। মিলড্রেডকে সে ভোলবার চেষ্টা করে। নোরা নেলবিষ্ট নাম্নী এক লেখিকার সঙ্গে আলাপ হয়। নোরা ফিলিপস্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুজনের ভিতর সখ্যতা জন্মায়।

হঠাৎ একদিন মিলড্রেডের আবির্ভাব হয়। তাকে দেখে ফিলিপস্ বিচলিত হয়ে পড়ে। আবার সে মিলড্রেডের প্রতি আকর্ষিত হয়। মিলড্রেড তখন অন্তঃসত্বা। ফিলিপস্ বুঝতে পারে এ জন্যই বা আশ্রয় লাভের জন্য মিলড্রেড তার নিকট এসেছে। কিন্তু তবু ফিলিপস্ মিলড্রেডের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দিন কয়েক পরে মিলড্রেড আবার ফিলিপস্‌কে ছেড়ে চলে যায়। ফিলিপস্ জানতে পারে মিলড্রেড তার বন্ধু গ্রিফিথ্‌স্-এর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করে।

গ্রিফিথ্‌স্-এর সঙ্গে মিলড্রেডের একদিন বিরোধ বাধে। তাদের ভিতর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এর পর মিলড্রেড বারবণিতার বৃত্তি অবলম্বন করে। সে আবার ফিলিপস্‌এর নিকট ফিরে আসে। ফিলিপস্ তাকে গ্রহণ করে ও বাড়ীতে স্থান দেয়। তবে ঐ তরুণীর প্রতি সে আর প্রেম-ভাব পোষণ করে না। মিলড্রেড

এটা উপলব্ধি করে কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সে দিব্যি ঐ বাড়ীতে বসবাস করতে থাকে ও বাড়ীর আসবাবপত্রগুলি অযত্নসহকারে টানাটানি করে তার কোন-কোনটা ভেঙেও ফেলে। পরিশেষে ঐ বাড়ী থেকে একদিন উধাও হয়ে যায়।

ঐ সময়ে ফিলিপস্ এর আর্থিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। দৈনন্দিন খাওয়াও তার জোটে না। মেডিক্যাল কলেজের পড়াশুনা তাকে ছেড়ে দিতে হয়। তার এক সাংবাদিক বন্ধু তার উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে। ফিলিপস্ স্বল্প আয়ের একটি চাকরী পায়। এমনিভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার নিকট সংবাদ আসে তার পিতৃব্যের মৃত্যু হয়েছে। ফিলিপস্ পিতৃব্যের সম্পত্তির মালিক হয়। আবার সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় ও কৃতী হয়ে বেরিয়ে আসে।

কর্ম-জীবনের শুরুতে ফিলিপস্ সাল্লি নাম্নী একটি তরুণীকে বিবাহ করে। সাল্লির প্রতি সে প্রেমাসক্ত হয় না, কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করে। এইখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি।

এবার ফিলিপস্ এর মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক। ফিলিপস্ মিলড্রেডের প্রতি প্রবল ভাবে আসক্ত হয় কিন্তু ঐ তরুণীর নিকট থেকে কোন সাড়া পায় না। বরং বলা চলে, সে মিলড্রেডের তরফ থেকে নির্দয় ব্যবহার পায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা সত্ত্বেও ফিলিপস্ তার সঙ্গ কামনা করে। এ থেকে কি ধারণা করা চলে না যে, ফিলিপস্ মূলতঃ আত্মনিগ্রহামোদী (Masochist) ছিল ? অর্থাৎ প্রেমিকার ভালবাসা লাভ না করা সত্ত্বেও, তার দ্বারা অবহেলিত হয়েও তা থেকে সে অদ্ভুত ধরণের এক আত্ম-তৃপ্তি পায়। এ যেন আলেয়ার আলোর পিছে ছুটে উদ্ভট প্রকৃতির এক আনন্দ লাভের সামিল হওয়া। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মানসিকতার মূলে অবচেতন মনের প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তার কারণ এ ধরণের আসক্তি বা প্রেম অযৌক্তিক প্রকৃতির। এক-এক ধরনের ভাব-বিকারের (Complex) পর্যায়ে ফেললেও বোধ করি ভুল হয় না।

মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, উক্ত আচরণিক বিকাশের উৎস কোথায় ? আমরা এ স্থলে ফ্রয়েডের চিন্তা-দর্শনের প্রয়োগ ঘটাবো। তার কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় তিনিই সর্ব প্রথম অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন।

মানুষের ভিতর যুক্তি, বুদ্ধি, সমাজ-বোধ ও প্রচলিত ধরনের শিক্ষার প্রভাব সক্রিয়

থাকা সত্ত্বেও সে অদৃশ্য এক মানসিকতার দাপটে পড়ে বিবেক-বিরুদ্ধ ও উদ্ভট প্রকৃতির আচরণে প্রবৃত্ত হয়। বহু স্থলে দুয়ের ভিতর দ্বন্দ্ব ঘটে ও মানুষ শক্তিহীন হয়ে স্বকীয় বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করতে সুরু করে।

মনোবিশ্লেষণের ফলে জানা যায়, এ ধরণের অদ্ভুত আচরণ বা মনোবৃত্তির মূলে বাল্য-জীবনের এষণাবৃত্তির অপূর্ণতা বা অবদান বিরাজমান থাকে। জীবনে সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব অনস্বীকার্য ও তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ও তার প্রভাব মন থেকে মুছে ফেলা যায় না,—মনের গভীরে অবদমিত অবস্থায় বিদ্যমান থেকে, জীবনের পরবর্তীকালে সচেতন-লব্ধ নীতি, কর্মপ্রবণতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্যের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে প্রাকার গড়ে তোলে। এর ফলে মনের বিকাশ সঙ্কুচিত হয় ও কখনও-কখনও জীবন-বিরোধী বা নিষ্ক্রিয় মানসিকতার রূপ, মনোবিকৃতি, উদ্যমের অভাব প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার উদ্রেক করে। মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতির অনুসরণে জ্ঞাত-হওয়া যায়, এ গুলির মূলে বাল্য-জীবনের অপরিণত বুদ্ধি, অপ্রীতিকর, দ্বন্দ্বমূলক ও আঘাতাত্মক অভি-জ্ঞতার রেশ মনের অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয়ে সচেতন মনের প্রভাবকে দুর্বল করে তোলে।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে নায়কের বাল্য-জীবনের রূপ সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানতে পারি। তার জীবন-প্রভাত থেকে অঙ্গ-বৈকল্যের দরুণ যে বারে-বারে অনুভূতি-মূলক বিপর্যয় দেখা দেয় তার প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ অনুভূতি বা তৎজনিত আবেগ জীবনে প্রভাবশীল হলে তার পরিপূরণ, ব্যক্তি যৌনশক্তি-পূরণের মাধ্যমে ঘটাতে সচেষ্ট হতে পারে। মনে হয় এ স্থলেও অনুরূপ ক্রিয়াশীলতার নিদর্শন প্রকট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মিলড্রেডের প্রেম লাভের জন্য ফিলিপস্-এর ভিতর একটা উৎকট ধরনের তাগিদও বিদ্যমান। খঞ্জ ফিলিপস্-এর বেদনাক্লিষ্ট চিত্ত মিস্ উইলকিনসন্, নোরা, সালি, ফ্যানি-এদের ভালবাসা লাভ করে, কিন্তু মিলড্রেডের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। মনে হয় এ অতৃপ্ত ইচ্ছার প্রভাব তাকে ব্যাকুল করে তোলে। এ ছাড়া ঠিক কোন নারীর আকর্ষণ কোন পুরুষকে ও কি অবস্থায় বিচলিত করে তার হদিশ পাওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ শুধু মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ রহস্যের সন্ধান লাভ করা চলে, অন্য কোন-ভাবে নয়।

কোন সাহিত্য সমালোচক বলেন মিলড্রেডের প্রতি ফিলিপস্ এর আকর্ষণের মূলে তার মাতৃ-জট বা 'mother complex' এর প্রভাব বিদ্যমান থাকা সম্ভব। তবে মম-এর গল্পাংশের ভিতর এর কোন উল্লেখ মেলে না।

কিন্তু মম লিখেছেন শৈশব-জীবনে তাঁর মায়ের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ ছিল, আশি বছর বয়সেও তাঁর ভিতর ঐ স্নেহের রেশ সক্রিয় ছিল। আমরা এ কথাও জানি মম বিবাহিত জীবনে সুখী হন নাই। তিনি অসম্ভব তোত্‌লাও ছিলেন। এ থেকে ধারণা করা চলে, জীবন-প্রভাতে মম এর মায়ের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল পরিণতকালে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে তার চলমানতার স্বাভাবিক স্ফুরণ ও পূরণ ঘটে নি। এজন্যই কি লেখক মিলড্রেড নামক চরিত্র-চিত্রণের ভিতর দিয়ে তার অবদমিত তথা বিকৃত ইচ্ছাকে অভিব্যক্ত করেন? অর্থাৎ একথা কি বলা চলে যে মিলড্রেড মম এর উদ্ভট ইচ্ছার প্রতীক? আমাদের এ সিদ্ধান্তকে যদি যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় তাহলে এ ধরণের সাহিত্য-সৃষ্টিকে কি এক প্রকার প্রতিরক্ষণ-কৌশলের (Defence Mechanism) সামিল বলে গণ্য করা চলে না? মনে হয়, মম এর মানসিকতা উৎসারিত এ সাহিত্য-কীর্তির ভিতর দিয়ে সাহিত্যিকের স্বকীয় ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্তি (catharsis) প্রকাশ লাভ করে।

তবে মম এর বিচার-বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-দর্শনের সঙ্গে জীবনের এ আশাহীনতার রূপ ঠিক মত মিল খায় না। এ জন্য গল্পের পরিণতি অন্য রূপ নেয়। ফিলিপস্‌ পরিশেষে সালি নাম্নি এক তরুণীকে বিবাহ করে সুখে ঘর-সংসার করে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করলে এ ধরণের উপসংহারের মূলে দ্বিবিধ কারণ বিদ্যমান থাকতে পারে। এক, মম ব্যক্তিগত জীবনে যে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেননি গল্প রচনার মাধ্যমে তার পূরণ ঘটেনি, দ্বিতীয়, আশাহীনতায় বিধ্বস্ত না হয়ে জীবনে তিনি প্রকারান্তরে বাস্তবতা-বোধের (Ego) বিজয় ঘোষণা করেন।

এবার উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক। "Of Human Bondage"—অর্থাৎ শৃঙ্খলিত মানব। এ শৃঙ্খল কি-জাতীয়? বলা বাহুল্য, এ শৃঙ্খল আবেগ-কেন্দ্রিক। এ আবেগ মূলতঃ অযৌক্তিক তথা অবচেতন মনের দ্বার প্রভাবিত। মনে হয় ঔপন্যাসিকের মনোরাজ্যে যে আবেগ শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিরাজমান ছিল, তারই প্রকাশ ঘটে এ রচনার মাধ্যমে। তবে এ অভিব্যক্তি আশ্চর্য ও সুন্দর ভাবে বিকাশ লাভ করে শিল্পাশ্রিতরূপে।

প্রসঙ্গতঃ এগুমণ্ড বের্গলার প্রণীত 'Principles of Self Damage' গ্রন্থের একটির উক্তির উল্লেখ করব। তিনি লিখেছেন, 'No human being can endure the protrated helplessness of early childhood without developing at least

some of the patterns which crystallise into psychic masochism. The scourge is thus a universal human trait." অর্থাৎ শৈশব-জীবনের সহায়হীন অবস্থার প্রভাব জীবনের পরবর্ত্তীকালে ক্রিয়াশীল হয়ে কোন না কোন প্রকার আত্ম-নিগ্রহমূলক মনোভাবের উদ্রেক ঘটায়। এ যেন এক সর্বমানবীয় আবেদনবিদ্ধ মানসিকতার রূপ বিশেষ। তবে কি প্রতি ব্যক্তির ভিতরেই নিজেকে দুঃখে-কষ্টে বিদ্ধ করে তৃপ্তি পাওয়ার এক প্রবণতা মনের অবচেতনে বিদ্যমান থাকে? চলতি কথায় বলে, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।' নিজেকে একটা পীড়নের মধ্যে নিয়ে না ফেললে কি মানুষের মন সুস্থির হয় না? ফ্রয়েড বলেন প্রেম-জীবনেও বহু স্থলে এ রুচি খুব প্রকটরূপে বিকাশলাভ করে। শরৎচন্দ্রের দেবদাসের ভিতরেও এ প্রবণতা সক্রিয় হয়। সে যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও তার প্রণয়িণী পার্ব্বতীকে নিজের কাছে নিবিড়ভাবে আনবার চেষ্টা করেনি। হা-হুতাশ করে, নিজের সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এ কি এক ধরণের অজানা প্রকৃতির অভিমানের রূপ বা বিকৃত ধরণের সুখ লাভের পন্থার সামিল?

বলা বাহুল্য, এ ধরণের মনোভাবের ভিতর এক অসামাজিক আচরণিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এর ভিতর ভীরু চিত্তের প্রকাশ বিদ্যমান।

এর সঙ্গে যুঝ্তে হলে বা মন থেকে এ প্রকৃতির উদ্ভট ইচ্ছাকে তাড়াতে হলে পুরুষকার বা বাস্তবতাবোধের প্রাধান্য ঘটানোর প্রয়োজন আছে। এটা করা চলে, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এ ধরণের অযৌক্তিক ইচ্ছার সূত্র-সন্ধান লাভ করে, এর কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বা বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইভাবে ইচ্ছার রূপান্তর সাধনও সম্ভবপর হতে পারে।

ফ্রয়েড বলেন ইচ্ছা বা কামনাই জীবনস্রোতকে প্রধানতঃ চলমান করে রাখে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,

> ইচ্ছে।
> সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
> সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।' (তাসের দেশ)

ইচ্ছার ভাঙন অপেক্ষা গড়ন বা সুনিয়ন্ত্রণই জীবনে কাম্য। কিন্তু এটা সম্ভবপর। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে মনোবিশ্লেষণ এ কাজে বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

ফ্রয়েড একটি পত্রে লেখেন মনকে বিশ্লেষণ (Analysis) করতে পারলে সেটা মানসিক সংশ্লেষণ (Synthesis) ঘটানোর পথে কোন বাধা (obstacle) সৃষ্টি করে না। এ ছাড়া এর দ্বারা মানসিক পরিশুদ্ধিও (Sublimation) ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকে 'অশান্ত আকাঙ্খা পাখি' বলে উল্লেখ করেন। সাংখ্য-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে তম ও রজ গুণের প্রভাবেই এরূপ ঘটে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মতে প্রথমে মানসিক বিশ্লেষণ ও পরে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ মনের ভিতর প্রশান্তির ভাব এনে দিতে পারে। বলা বাহুল্য, এটা একটি মনোবৈজ্ঞানিক পন্থা। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ মনোবিজ্ঞানের এ অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ এ বিষয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় না। আমরা বিষয়বস্তুটির উপর তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা মনে করি মনোবিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দ্বারা শুধু মনকে পরিশুদ্ধ বা উন্নত করে তোলা সম্ভব হয় না, ভারতীয় সংস্কৃতির যে একটি মূল কথা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ বা মনের গভীরে যে আত্মোন্নতিমূলক মানসিকতার বীজ নিহিত আছে তার সন্ধানলাভ ও তাকে জীবনে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

পরিবার-পরিকল্পনার আইন ও মানসিক সমস্যাবলী

—অমরেন্দ্রনাথ বসু

ভারতের জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীদের ধারণা যে ১৯৯০-এর মধ্যেই জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছাবে। এরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে কোনও উন্নতিশীল দেশের সমগ্র বৈষয়িক উন্নতির পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই জন্ম-শাসন যে এই মুহূর্তেই প্রয়োজন, এ বিষয়ে আজ আর কারও দ্বিধা নেই। ভারত সরকার দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য নানা কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য উপযুক্ত প্রচারের মারফত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এত সকল কার্যসূচী ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হ্রাস পায় নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এরূপ মন্থর গতিতে হ্রাস পেলে বৈষয়িক উন্নতির সমগ্র পরিকল্পনাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। কাজেই হ্রাস পাওয়ার গতি আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। তাই এখন অনেকে বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণ, আইনের সাহায্যে বিবাহের বয়স আরও উর্ধ্ব নির্ধারণ করে দেওয়া, দুই বা তিনের অধিক সন্তান জন্মদান করাকে বেআইনী ঘোষণা করা, ইত্যাদি নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত প্রকাশ করেছেন। ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই অশিক্ষিত ও পরিবার-পরিকল্পনার ব্যাপারে নির্লিপ্ত। কাজেই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এরূপ একটা জরুরী ব্যাপার কেবল মাত্র এই অশিক্ষিত ও নির্লিপ্ত জনতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চান না। এরূপ ছেড়ে দেওয়া সমীচীনও নয়। কাজেই আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বর্তমানে ভারতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য যুদ্ধ-কালীন অবস্থার (প্রয়োজন ও গুরুত্বের দিক থেকে) অনুরূপ আইন ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি আইন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমাদের ঐ সকল আইন ও ব্যবস্থাদির ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের কথা নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও খুঁটিনাটি সহ বিচার করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আইন ও ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে। এ-সকল প্রতিক্রিয়া ও

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। অংশকালীন উপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

ফলাফলের কথা বিবেচনার সময় আমাদের, এমনকি সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের কথাও ভাবতে হবে ; কারণ আমাদের বর্তমানের সুখ সুবিধা লাভের জন্য ভাবী বংশধরদের উপর আমাদের কর্তব্যে ত্রুটিজনিত ফলাফল ও ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারি না। তাতে সমগ্র মানব সমাজেরই ক্ষতিসাধন করা হবে। বর্তমানে একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা সহজতর ও সুবিধাজনক—কেবল মাত্র এই বিবেচনার উপর নির্ভর করেই একটি পন্থা গ্রহণ বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণকর নয়। যদি সহজ পন্থাটি ভাবীকালের উপর নানা প্রকারের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সে ক্ষেত্রে অন্য পন্থা কঠিনতর হলেও গ্রহণযোগ্য। মানুষের মঙ্গল যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে পন্থার সহজতা, পন্থা নির্ধারণের মাপকাঠি হওয়া কোনক্রমেই ঠিক নয়। এবং মানুষের কল্যাণ বিবেচনার সময় সংকীর্ণ স্থান-কালের মধ্যে মানুষের সাময়িক মঙ্গলের কথা ভাবলে চলবে না। এতদিনের বিজ্ঞান-সাধনায় লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যতদূর পর্যন্ত এই স্থান-কালের পরিধি বিস্তৃত করা যায় তা করতে হবে। এই কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় তার সাথে জড়িত মানুষের (বর্তমান ও ভাবীকালের) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাবলী ইত্যাদির কথা গভীর ভাবে ভাবতে হবে। এখনকার যে কোনও কাজের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এই কাজে ত্রুটি থাকলে, হিসাবে গরমিল হলে প্রকৃতি (nature) ক্ষমা করবে না। তার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

এই প্রবন্ধে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল আইনের কথা ভাবা হচ্ছে তার মধ্যে একটি আইনের সাথে জড়িত কিছু মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলীর কথা আলোচনা করা হবে। ভারতের কোনও-কোনও প্রদেশে এরূপ আইন-প্রণয়নের কথা ভাবা হচ্ছে বা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, যার সাহায্যে দুই বা তিনের অধিক সন্তানের জন্মদান অপরাধ বলে পরিগণিত হবে এবং জন্মদানকারী বাবা ও মাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারবে। এই শাস্তি জরিমানা ও কারাদণ্ড হতে পারে। আশা করা হচ্ছে শাস্তির ভয়ে বাবা-মা অধিক সন্তানের জন্মদান থেকে বিরত থাকবে। আইনের মধ্যে শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা থাকায় যারা আইনের বিষয়টি সম্পর্কে তাৎপর্য উপলব্ধি করে আত্ম-সংযম অবলম্বন করতে পারবে না, তারা শাস্তির ভয়ে সংযত আচরণ করবে। শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখানেই। কিন্তু শাস্তির ভয়ও সকল মানুষকে সকল সময় কোন একটা কাজ থেকে বিরত করতে পারে না ; বিশেষতঃ অধিকাংশ মানুষই যদি অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। তাই অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে যেমন আইন উপেক্ষা করে বেআইনী বা অসংযত আচরণ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আইনের ক্ষেত্রেও আইনের উপেক্ষা ও

অসংযত আচরণ পরিলক্ষিত হলে, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সাময়িক লোভ-লালসা, উত্তেজনা, কুসংস্কার, সাবধানতার অভাব, ভুল হিসাব ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কিছু-কিছু মানুষকে এই আইন লঙ্ঘনের আচরণের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। বলা যেতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটাতে পারবে, কারণ গর্ভপাত ঘটান এখন আইনসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মন গর্ভপাত সহজভাবে গ্রহণ করার মত প্রস্তুত কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। গর্ভপাতের পথে অনেক সংস্কার, মানবতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যেই কোনও কোন ধর্মীয় সংস্থা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন। মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তারা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আইন-ভঙ্গকারীর সংখ্যা নেহাত কম হবে না। তখন মূল সমস্যা দাঁড়াবে এরূপ আইন-লঙ্ঘনকারী পিতা-মাতার সন্তানদের নিয়ে। আইন-ভঙ্গকারী পিতা-মাতার উপর আইনের প্রয়োগ সন্তানদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যেন অপর একটি সমস্যার উদ্ভব না ঘটে।

মনে করা যাক কোনও মা-বাবা আইন অনুমোদিত সংখ্যার অধিকসংখ্যক সন্তানের জন্মদান করলেন। তখন এই অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি পেতে হবে। এখন দেখা যাক এই শাস্তিদানের ফলে শিশু-সন্তানেরা কিভাবে মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত হয়। মা-বাবা অপরাধ করেছেন; কাজেই তাঁদের শাস্তি পেতে হবে। ফলে হয়ত তারা ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত হবে। কিন্তু যে সন্তানের আবির্ভাবের জন্য তাদের অপরাধ প্রমাণিত হল বা প্রকাশিত হল এবং শাস্তি পেতে হল, তার প্রতি তাদের একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। নিজেদের অসংযত বা অসাবধানতামূলক আচরণের দায়িত্ব তারা নবাগত সন্তানের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কারণ ঐ আচরণ ও সন্তানের আবির্ভাব একই সূত্রে গ্রথিত। অপরাধের দায়িত্বের এরূপ স্থানান্তর ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কজন মানুষ আছে যারা সব ব্যাপারটা বস্তুনিষ্ঠ (objective) ভাবে গ্রহণ করতে পারবে এবং অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিতে পারবে? শাস্তি পাওয়া শেষ হয়ে গেলেও এই সন্তানের অস্তিত্বকে মা-বাবা একটা লজ্জাকর ঘটনা বলে মনে করতে পারেন; কারণ যে অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হল সেই অপরাধের ফলটিকে তাদের সারা জীবন ধরে রাখতে হবে। সন্তানের উপর মা-বাবার এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফল, সন্তানের পক্ষে এবং মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কি মারাত্মক

আকার ধারণ করতে পারে তা মনোবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

আবার মা-বাবার আর্থিক সঙ্গতি যদি অপ্রতুল হয়ে এবং তাদের উভয়েই বা একজন যদি পরিবারের উপার্জনকারী হন, তাহলে কারাদণ্ডের জন্য পরিবারের ভরণ-পোষণের সংস্থানে ব্যাঘাত ঘটবে। সে ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবার, নবজাত এবং অন্যান্য সন্তানসহ সকলেই অসুবিধায় পড়বে। এই চাপ সকলের উপর, বিশেষ করে পূর্বে জাত সন্তানদের উপর, মানসিক দিক থেকে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এই সন্তানেরা যদি শিশু বয়সের হয় (এটাই স্বাভাবিক) তাহলে মা অথবা বাবার অনুপস্থিতির জন্য এবং সংসারে খাওয়া-দাওয়ার টানাটানির জন্য তারা একটা নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ অনুভব করবে। শিশু বয়সের এরূপ নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা তাদের পরবর্তী জীবনের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে নিকৃষ্ট ভাবে প্রভাবিত করবে। এই ভাবে মা-বাবার অপরাধের জন্য সন্তানেরা, যারা সম্পূর্ণই নির্দোষী, শাস্তি পাবে।

অধিক সন্তান জন্মদানের জন্য মা-বাবার শাস্তি সন্তানদের মধ্যে আরও নানা-ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। যে সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য মা-বাবাকে শাস্তি পেতে হল, সেই সন্তান যখন বড় হবে এবং বুঝতে শিখবে ও জানতে পারবে যে তার জন্মের জন্য মা-বাবাকে শাস্তি পেতে হয়েছে, তখন স্বভাবতঃই তার মনে হবে যে সে সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত। এমন কি এই ঘটনার জন্য সে সমাজের আর পাঁচজনের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠতে পারে। শিশু বয়স থেকেই সে অবাঞ্ছিত শিশুর মানসিকতায় ভুগবে। আমরা আগেই বলেছি যে এই শিশুর প্রতি মা-বাবার আচরণ অনেক সময় সুস্থ নাও হতে পারে। ফলে এই শিশু নিদারুণ হীনমন্যতায় ভুগবে এবং এই বোধ তার ব্যক্তিত্বে বিকৃতি ঘটাবে। এর ফলে সমাজের প্রতি তার মনোভাব কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া নবজাত শিশুর পূর্বে যে সকল সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মনেও নানা প্রকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে সন্তান জন্মদানের সাথে যে আচরণের জন্য সন্তানের জন্ম তা একই সূত্রে গ্রথিত। অর্থাৎ মা-বাবার যৌন সঙ্গম-ক্রিয়া ও শিশুর জন্মদান একই সূত্রে গ্রথিত। ফলে, সাধারণের চোখে শিশুর জন্মদানের জন্য শাস্তি প্রকারান্তরে সঙ্গম-ক্রিয়ারই শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে ; সঙ্গম-ক্রিয়াই অসংযত আচরণ বলে পরিগণিত হবে ও ধিক্কৃত হবে। পূর্বে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানেরা মা-বাবার যে আচরণ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, সেই আচরণটি সম্বন্ধে তাদের সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলা হবে এবং

প্রকারান্তরে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে তাদের মা-বাবা এই আচরণের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এর ফলে একদিকে যেমন নবজাত শিশুর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দিতে পারে, তেমনি অপর দিকে মা বাবার প্রতিও তাদের মনে অশ্রদ্ধামিশ্রিত নানা প্রকারের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। এবং এই সকল মনোভাব পরোক্ষভাবে সামাজিক আইনের মধ্যে সমর্থন পাবে। ফলে সকল সন্তানেরা অসম্ভব মানসিক দ্বন্দ্ব ও তদ্‌জনিত যন্ত্রণা ভোগ করবে। মা-বাবার প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান-বোধের মধ্য দিয়ে শিশুর বাস্তবতা-বোধ (reality sense বা ego strength এবং বিবেক-বুদ্ধি (super ego) বিকশিত হয়, এই দ্বন্দ্বের ফলে তা শুরুতেই বিপর্যস্ত হবে।

মা ও বাবার প্রতি তাদের বিপরীত লিঙ্গের শিশু-সন্তানের একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে। পুত্র-সন্তানের মায়ের প্রতি এবং কন্যা-সন্তানের বাবার প্রতি সহজাত আকর্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে জাগরিত হয় কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক চাহিদা (instinctual demands) এবং পুত্রের বাবার প্রতি ও কন্যার মায়ের প্রতি দেখা দেয় ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ভাষায় একেই বলা হয় ইডিপাস-গূঢ়ৈষা (Oedipus-complex)। সমাজ ও পরিবারের কাঠামোর মধ্যে শিশুর এই চাহিদা ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হবার নয়। ফলে তার মনে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির সহযোগিতায় শিশু শৈশব থেকেই এই দ্বন্দ্বের অর্থাৎ ইডিপাস-গূঢ়ৈষার মীমাংসার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে সুপরিণত মানুষ। এমন কি সভ্যতার বিকাশও মানুষের এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার মধ্যে বিধৃত। "The reactions against the instinctual demands of the Oedipus-complex are the source of the most precious and socially important achievements of the human mind ; and this holds true not only in the life of individuals but probably also in the history of the human species as a whole. The super ego, too, the moral agency which dominates the ego, has its origin in the process of overcoming the Oedipus complex." (Freud, 1926 ; Psycho analysis ; S. E. vol 20, 1959), কিন্তু সন্তান জন্মদানের জন মা-বাবা প্রকাশ্যে শাস্তি পেলে পূর্বের সন্তানদের এই ইডিপাস-কমপ্লেক্স মীমাংসার পথে না গিয়ে নিকৃষ্টতার দিকে উদ্দীপিত হবে। ফলে এরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত মা-বাবার সন্তানেরা নিকৃষ্ট মানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। এমনকি এরূপ সন্তানদের সহজেই মানসিক-রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভবনাও থাকবে। এই সকল

শিশুরা কৈশোরে সহজেই অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে। অবাঞ্ছিত-শিশুর মানসিকতা নিয়ে একদল শিশু সমাজের বুকে বড় হতে থাকবে এবং উপযুক্ত সময়ে তারা সমাজ-জীবনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে। এই ভাবে আমরা নতুনতর সমস্যার সম্মুখীন হব। নিশ্চয়ই এরূপ পরিস্থিতি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

অতএব আইন-প্রণয়ণের পুর্বে সকল দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আইন-প্রণেতাগণের সকল দিকে দৃষ্টি রেখে আইনে বিভিন্ন ধারা নিবদ্ধ করতে হবে যাতে ভাবীকালের কাছে জবাবদিহি করতে না হয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে কোন্ পন্থাটি সকল দিক থেকে কল্যাণকর তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কঠিনতর হলেও সেই পন্থাটি গ্রহণ করতে হবে। তাই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কার্যসূচীর মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, কারণ এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

ধৈষণা

তরুণচন্দ্র সিংহ *

পত্রিকার এই সংখ্যা হইতে অষ্টাদশ বর্ষ শুরু হইল। বৈশাখ হইতে বাঙ্গালী বর্ষ-গননা সুরু করে। ১৩৮৩ সনের এই নব-বর্ষে আমরা বর্ষ-বরণের সঙ্গে-সঙ্গে সকলের শুভ ও সফলতা কামনা করি।

ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টি ও দেশ অনেক ভাবে জড়িত। তাই ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠির তথা সমষ্টির এবং দেশেরও কল্যাণ কামনা করি। পরিধি ক্রমেই বাড়িয়া যায়। যেমন এক দেশের সহিত অন্য দেশের সম্বন্ধ আছে; সুতরাং আরও বৃহত্তর বিচারে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গেই কিছু না কিছু সম্বন্ধ, বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক দেশেরই আছে ও তাহা বুঝিয়া, রক্ষা করিয়া, প্রয়োজন মত বাড়াইয়া-কমাইয়া বা নুতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই ভারত পরস্পর ও সকলের সঙ্গেই সুসঙ্গত, শুভ, কল্যাণকর সম্বন্ধ থাকুক এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে এবং নিজ কর্মেও তাহার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এই একের কল্যাণ ইচ্ছায় অন্যে সায় না দিয়া তাহাদের নিজের-নিজের আপাতঃ স্বার্থের দিকে নজর দিয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে শান্তি ও কল্যাণ বিঘ্নিত হয়। বর্ত্তমান পৃথিবীতে শান্তির পরিবেশ প্রায় কোথাও যেন দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট-বড় বহু দেশ লইয়া এই পৃথিবী। বহু দেশেরই নিজেদের মধ্যে শান্তি নাই, অন্য দেশের সহিতও সুস্থ সম্বন্ধ যেন গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ সম্বন্ধে নানা মতবাদীর নানা মত শোনা যাইবে।

আমরা রাজনীতির কুটিল চক্রজালে প্রবেশের অধিকার রাখিনা। মনোবিদের দৃষ্টিতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই কলিকাতা সহরে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এমনকি ভারতের নানা স্থানে বহু বাঙ্গালী আছেন যাঁহারা মনোবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এই বিদ্যার অধ্যাপনায়ও নিযুক্ত আছেন। দেশের এই অতি গুরু সমস্যার প্রয়োজনীয় মীমাংসার

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের লিখিত মত আলোচনার, ও তাহাদের প্রকাশ ও প্রচারের জন্য আমাদের নিকট পাঠাইতে বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। আমাদের পাঠকদিগের সম্মুখে এবং দেশের অন্যান্য চিন্তাশীল কর্মী ও পরিচালকদিগের জ্ঞাতার্থে সকল মতামত প্রকাশ করিতে আমরা বিশেষ আগ্রহী। যে সকল মত আমরা পাইব ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে আমরা ইহা অনুভব করি, বিশ্বাস করি।

নববর্ষে মানুষ পুরাতনের লাভ-লোকসানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইয়া নূতন আশা লইয়া নূতন উদ্যমে বৎসর আরম্ভ করে। ক্রমোন্নতি আমরাও চাই। আমরাও আশা করিব চিত্তর উন্নতি হইবে, যে উদ্দেশ্য লইয়া এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে মনোজগতের সেই সব নানা বিষয় আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের সম্মুখে আরও সুষ্ঠু ভাবে আমরা পরিবেশন করিতে পারিব ইহাই আমাদের আশা। নববর্ষের প্রথমেই আমরা আবারও নূতন আশা লইয়া কার্যে ব্রতী হইতেছি। ইহার সফলতা-সার্থকতার পরিমাপ কাল করিবে। আমরা যেন কাজ ঠিক মত করিয়া যাইতে পারি। সেজন্য সকলের সহায়তা ও সহযোগিতা কামনা করি।

আমরা ভালর আশা সকলেই করি। বিকৃতমনাদের কথা আলাদা। কিন্তু কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ এই বিচারের মধ্যেই নানা জটিলতা ভিড় করিয়া আসে। একে যাহা ভাল মনে করে, অন্যে তাহাই ভাল নাও মনে করিতে পারে। ইহাই বিরোধের মূল। আরও তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় আমার যাহা ভাল লাগে, আমার যাহা চাহিদা, এক কথায় আমার যাহা স্বার্থ তাহা যদি অপরের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবেই বিরোধ বাধে। ইহার সহিত আত্ম-অহংকার যুক্ত হইয়া সমস্যাটা আরও অনেক জটিল করিয়া তোলে। লাভ-লোকসানের বিচার ভুলিয়া নিজের অহমিকাকে প্রাধান্য দিয়া ক্ষতি স্বীকার করিতেও বাধে না এমন মানুষ অনেক দেখা যায়। বস্তু-স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি-স্বার্থ এবং অহংকার তখন বড় হইয়া উঠে। সম্পত্তি খোয়াইয়াও নিজের জেদ বজায় রাখিবার দৃষ্টান্ত খুব কম নাই। এই স্বার্থ-বোধ ও অহমিকা আমাদের দুই বড় শত্রু। ইহাদের প্রভাবে সঙ্গত ক্ষেত্রেও মানুষ নতি স্বীকার করিতে পারে না। সর্বনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিজের স্বার্থের অর্দ্ধেক ত্যাগ করিতে হইলেও যতটুকু রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টাই করেন এই প্রবচন চালু আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রবচন অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মদ-মাৎসর্যে ডুবিয়া মানুষ নানা অঘটন ডাকিয়া আনে। অপরের প্রতি আক্রোশ বা ঈর্ষা প্রবল হইলেও উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

আমাদের রিপুগুলির মধ্যে যে কোনওটার প্রভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলে তখন আর হিতাহিত বিচারের শুভাবস্থা মনের থাকে না। আক্রোশ বা আক্রম-বৃত্তি প্রবল হইলেও বিচারে নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। আরও নানা জটিলতা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে আমাদের মধ্যে যে সব মূল প্রবৃত্তিগুলি কাজ করে বাস্তবে পরিপূরণের ক্ষেত্রে তাহাদের অনেক প্রকাশই পরস্পর-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যেই বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই অন্তরের বিরোধ বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া সেইখানেও সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করে। মানুষ যেন নিজের পাকেই বিপাকে পড়িয়া আছে।

ইহাই যখন অবস্থা তখন মানুষ যে শান্তি ও কল্যাণের আশা লইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা কি কেবলই মিথ্যা স্বপ্ন! অনেকদিনের পুরাতন এই পৃথিবীতে মানুষও বহু যুগ হইল বাস করিয়া আসিতেছে। আজও তো আমাদের মনের মত রাম-রাজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভব হইল না। রামের রাজত্বকালেও কি যথার্থ রাম-রাজ্য বলিতে যে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে? অন্ততঃ রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। যদি কল্পনা করিয়া লই কোনও এক সময় সত্যই আমাদের স্বপ্নের সেই রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তবুও প্রশ্ন জাগে সে রাজ্যের পতন ঘটিল কেন? সে পতনের কারণ কি মানুষ নিজেই নহে? যদি তাহাই হয় তবে বুঝিতে হইবে মানুষের মধ্যেই এমন বৃত্তি আছে যাহা কোনও ভালকেই চিরস্থায়ী হইতে দেয় না। বলিতে হয় কোনও ভালই যেন সর্বজনের সর্বকালের সার্বিক ভাল নহে—অন্ততঃ সব মানুষ তাহা কখনই স্বীকার করিয়া লয় নাই, লইতে পারে নাই, নিজেদের মধ্যের বিরোধের জন্যই। যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে তাহা হইতে বলিতে হয় মানুষ এই পৃথিবীতে বহু যুগ বাস করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে নিজেদের মনের গভীরের বিভিন্ন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে আজও কোনও সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থায়ী মীমাংসা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। মূল বৃত্তিগুলি প্রায় তাহাদের আদিম অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। সামান্য পরিবর্তন যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা এতই নগন্য যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজও নিশ্চিন্তে বাস করিবার—কোনও উপায় নাই। ইতিহাসের নজির হইতে যতটুকু জানা যায় তাহাতেও এই কথাই প্রমানিত হয় যে, যাহা মানুষ ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়া সেই ভালকে জীবনে-জগতে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আংশিক ভাবে তাহা সফল হইলেও আবার ভিন্ন প্রভাবে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মানুষ আবার গড়িয়াছে আবার সেই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

যুগ-যুগ ধরিয়া এই যে পুনঃ-পুনঃ ভাঙ্গা-গড়া চলিয়া আসিতেছে ইহার কি কোনও শেষ নাই! মানুষের মনের গভীরের কামনা-বাসনা ও বিভিন্ন বৃত্তির স্বরূপ দেখিয়া মনে সন্দেহ জাগে হয়ত পৃথিবীর চক্র এই ভাঙ্গা-গড়ার আবর্ত্তেই ঘুরিতে থাকিবে। স্বর্গরাজ্য বলিতে আমরা যাহা কল্পনা করি তাহা হয়ত কাল্পনিক স্বর্গেই কেবল থাকিবে, এই মর্ত্তে তাহা কদাপি স্থাপিত হইবে না। তাইবা বলি কেন? পুরাণের কথা মানিয়া লইলে দেখা যায় স্বর্গরাজ্যেও অবিরাম অনন্ত শান্তি বিরাজ করে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির মূলেই সৃজনের সঙ্গে নিধন স্থান পাইয়াছে। তবে আমাদের কি কোন উপায় নাই? এই মার আমাদের সহিতেই হইবে? এই বিশেষ দ্বন্দের কি কোনও মীমাংসা বা অবসান নাই?

মনোজগতের অবস্থার দিকে তাকাইয়া আজ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এইটুকুই বলিতে পারা যায় যে, এই বিরোধের হাত হইতে সমগ্র মানবজাতির সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতেও বাস্তব বলিয়া মনে করা যায় না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কত যুগ চলিবে তাহাও বলা যায় না। এই দ্বন্দের গতি-প্রকৃতিও আমাদের বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সঠিক কিছু বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট ভাবে বলা সবত নহে। সৃজন ও ধ্বংস এই দুই ধরণের বৃত্তিই যে আমাদের মধ্যে কাজ করে পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। সুতরাং ধ্বংসই একমাত্র কথা নহে। আবার সৃজন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই মানুষের স্বভাব। যে মানুষ কেবল ধ্বংসই করে কোনও সৃজন কিছু করে না এমন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি তেমন মানুষের কল্পনা করি তবে সে কোনও গুরুতর মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া মানিতে হইবে। সেই শ্রেণীর মনোরোগীদের কথা এখানে আলোচনা করা হয় নাই। তবু এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন আছে যে সেই সর্বধ্বংসী বিকারগ্রস্ত মনেও কোনো না কোনও মানস-সৃজনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তাহা না হইলে ধ্বংসের উপায়, কৌশল ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও সে কিন্তু ভাবিতে পারিত না। এই সকল ক্রিয়াও মনের-সৃজনী শক্তির পরিচায়ক। সেই কথা এখন থাকুক; সামগ্রিক ভাবে মনুষ্যজাতি যেমন ধ্বংসকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না, তেমনই তাহার পক্ষে সৃজনকে বাদ দিয়া চলাও সম্ভব নহে। আমাদের অতীত এই সাক্ষ্যই দেয়।

এই যদি অবস্থা হয় তবে আমাদের আশা করিবার কি থাকে? প্রশ্নটা সহজ নহে উত্তরও সহজ নহে। তবু এইটুকু বলা চলে যে আমরা যদি মানব-সমাজের চিরন্তন-অখণ্ড কল্যাণ ও শান্তির আশা করি তাহা হইলে আমাদের আশাহত হইতে হইবে।

কিন্তু যদি সেই আশার পরিমাপ আমরা সীমিত করিয়া আনি অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্যে তাহা সীমায়িত করিয়া আমাদের আশা পোষণ করি তাহা হইলে সে আশা পূরণ হইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সে পূরণও সম্পূর্ণ না হইয়া আংশিক হইতে পারে। ভালর যতটুকু পাওয়া যায় তাহাও তো ভাল? সবটুকু পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া পাইবার চেষ্টা না করিয়া বসিয়া থাকা বা তাহার বিরোধিতা করাও এক প্রকার মানসিক অপুষ্টতার পরিচায়ক।

পূর্বে নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হইয়াছে অহমের সেই সংগঠনমূলক প্রকৃতির উল্লেখ এইখানে আবার করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। নিজের প্রবৃত্তি মনের ভিতর হইতে (নির্জ্ঞান হইতে) যে দাবী অবিরাম করিয়া চলিয়াছে তাহা অনুভব করিতেছে অহম্, আবার বহিঃপ্রকৃতি যে বাস্তবসীমা ও বাস্তবের দাবী করিয়া চলিতেছে তাহার অনুভূতিও এই অহমেরই। এই অর্থে ভিতর ও বাহির হইতে অবিরাম বিভিন্নধর্মী দাবী অহম্‌কে পোহাইতে হইতেছে। এই সকল দাবীগুলির মধ্যে কোনটাকে কতখানি, কি ভাবে পূরণ অথবা অবদমন করিবে, তাহা এই অহমের নিজস্ব সংগঠন ও সৃজনী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ভাবে এই সব পরস্পর-বিরোধী দাবীর সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া চলা অল্পসংখ্যক মানুষের পক্ষেই বাস্তব হইতে পারে। যে স্তরের সজাগ দৃষ্টি, সততা ও জ্ঞানের উপর মীমাংসা নির্ভর করে সকলের পক্ষে সেই স্তরে উন্নিত হওয়া আজও সম্ভব হইতে পারে নাই। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে সকলের, পক্ষে সেই উন্নতি করা সম্ভব মনে হয় না। একমাত্র মহাকালই ইহার উত্তর দিতে পারেন।

নিয়মাবলী

● 'চিন্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

● সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

● সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন।

● 'চিন্তা'য় প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।

● লেখককে দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়; লেখকের অনুরোধ-সাপেক্ষ তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্ প্রিন্টও দেওয়া হয়।

● বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া।

—:)•(:—

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১৪, পার্সিবাগান লেন

কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

অষ্টাদশ বর্ষ　　　　চিত্ত　　　　প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় * ১৩৮৩

সূচীপত্র

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Mahamaya Printing Works, 6/1, Cornfield Road, Calcutta-19.

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

শ্রাবণ-আশ্বিন [illegible]

সমীক্ষণী

৩৭নং সাউথ এণ্ড পার্ক কলিকাতা-২৯, ফোন নম্বর : ৪৭-৩১৫৭

মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত চার বৎসর হইতে 'সমীক্ষণী' নামে এক আলোচনা-চক্র চলিয়া আসিতেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলে। আগ্রহী সকলেই যোগ দিতে পারেন! নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা ও মত সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করার ফলে সকলেরই জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ হয়। এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ যোগদান করিয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ সহযোগিতা ও সাহায্য করেন।

প্রতি বুধবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে 'সুরেশ' ও 'অচলা'র মনোবিশ্লেষণ

অমল শঙ্কর রায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনটি : মহিম, সুরেশ ও অচলা। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে বিচার করলে ত্রয়ীর ভিতর দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত নায়ক-নায়িকার চিত্রণই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। মহিম ও অচলা স্বামী-স্ত্রী। সুরেশ মহিমের বন্ধু। মহিম হিন্দু ও অচলা ব্রাহ্ম। এজন্য সুরেশ ঐ বিবাহের পূর্বে মহিমকে একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিবাহ করার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। মহিম অচলা-দের বাড়ীতে ঘন-ঘন যাতায়াত করে, এ সংবাদ সুরেশের জানা। এজন্য বহুদিন মহিমের সঙ্গে সুরেশের সাক্ষাৎকার না হওয়ার দরুণ সে বন্ধুর খোঁজে অচলাদের বাড়ীতে যায়। ঐ সময়ে অচলা ও সুরেশের ভিতর আলাপ-সালাপ হয় ও সুরেশের খানিকটা জ্ঞাতসারে আর খানিকটা অজ্ঞাতসারে ও অচলার অজ্ঞাতসারে দু'জনের ভিতর একটা আকর্ষণ জন্মায়। ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ফলে ঐ আকর্ষণ গভীরতর হতে থাকে। সুরেশ ছিল চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ও তার আচরণের ভিতর উদগ্র কামনা-বাসনার ভাব প্রকাশমান। বস্তুতঃ অনেক স্থলে অচলার প্রতি তার যৌনাসক্তির অভিব্যক্তি একরূপ প্রকট হয়েই পড়ে। এর ফলে অচলার মনও বিচলিত হয়। তবে সে ঐ মনোভাবের কোনরূপ প্রকাশ ঘটায় না। কিন্তু উপন্যাস পাঠে স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায় অচলার মনে এজন্য একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে সে মহিমকে বিবাহ করবে এটা একরূপ স্থির হয় ও এ বিষয়ে সে তার পিতার অনুমোদনও লাভ করে, অপরদিকে তার মনের গুহায় সুরেশের প্রতি অবচেতনজাত কামনার অচ্ছেদ্যতার ভাব আসন লাভ করে। অচলা ধীর, স্থির প্রকৃতির নারী। কিন্তু তা সত্বেও কথাবার্তা-ভাবভঙ্গীর মাধ্যমে তার ভিতর যে অগ্নিস্পর্শের দীপ্তি অবদমিত রয়েছে তার স্বরূপ উচ্ছল হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে স্বামী মহিমের নিকট থেকে কোন বিরুদ্ধতার ভাব বিকাশমান হলে অচলা হয়ত খানিকটা আত্ম সচেতনতা লাভ করে নিজেকে সংযত করতে পারত। কিন্তু মহিমের আচরণের ভিতর এক প্রকৃতির আবেগ-হীনতা ও ঔদাসীন্যই লক্ষ্যিত হয়। এটা পরিশেষে অচলার মনে পূর্বেকার ছিদ্রপথে একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করে। আর তার ভিতর একস্থলে সুরেশের আকস্মিক আবির্ভাব অচলার সংযমের আসন ভেঙে দেয়। সুরেশকে নিয়ে অচলা পিত্রালয়ে চলে যায়। তবে পরে সে ফিরে এসে স্বামীকে অবলম্বন করেই আবার সংসার গড়তে চায়।

কিন্তু সুরেশের মন তখন প্রচণ্ডভাবে অচলার প্রতি আকর্ষিত। সে অচলার সঙ্গলাভের জন্য বারে-বারে মহিম-অচলার বাড়ীতে যাতায়াত করতে থাকে। এমনি সময়ে মহিম অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসক মহিমকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে যাবার নির্দেশ দেন। অচলা সচেতনে অসুস্থ মহিমের জন্য নানাভাবে সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে সুরেশকে আহ্বান করে,— কিন্তু তার আত্মকামী মন অবচেতনে উদগ্র কামনা-বাসনার প্রতীক সুরেশের সঙ্গ কামনা না করে পারেনা। অচলার মনের এই দ্বন্দ্ব এক সঙ্কটের উদ্ভব ঘটায়। সুরেশের মনে ধারণা জন্মায় অচলা একান্তভাবে তার সঙ্গলাভের জনাই তাকে ঐ বিদেশ-যাত্রায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এস্থলেও লক্ষ্যণীয়, যৌন-বৃত্তির দুর্বার বেগ প্রকীর্ণরূপে সুরেশকে বাস্তবতা-বোধহীন করে তোলে ও সে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে রেলপথে যাত্রাকালে অচলাকে নিয়ে একটি ষ্টেশনে নেমে পড়ে ও তার সঙ্গে যৌনজীবন কাটানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। কিন্তু অচলা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও বাঙ্গালী নারী। তাই স্বামী-স্ত্রীর সনাতন সম্পর্ক-বোধ তার মনকে বিচলিত করে ও নৈতিক সত্তার (Superego) বশে সে সুরেশের প্রতি নির্লিপ্তভাব প্রদর্শন করে। সম্ভবতঃ অপরাধ-বোধের ভাব, আত্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তি ও ঐ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করার দরুণ সে সচেতন হয়ে ওঠে ও পুনর্বার মহিমের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়। এরপর সুরেশের ভিতরেও অনুশোচনা দেখা দেয় ও এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তার মৃত্যু হয়। অচলা মহিমের নিকট ফি.র আসে।

উপন্যাসে সচেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব ও ঐ মানসিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অবচেতনের শক্তির এই শিল্পাশ্রিত চিত্রণ গ্রন্থখানিকে বিশ্বসাহিত্যের আসরে অতুলনীয়রূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। অবৈধ প্রেমের আবেদন যে হৃদয়রাজ্যে কি প্রবল আকার ধারণ করে থাকতে পারে তার একটি সূক্ষ্ম চিত্র এ উপন্যাসে মেলে।

এ স্থলে শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন, সমাজবিধি বা নীতি উল্লঙ্ঘনের মূলে মনের কোন উপাদান মূলতঃ দায়ী? নারী-পুরুষের ভিতর এ যৌনাসক্তিমূলক আচরণিক প্রকাশের উৎস কোথায়? নারী-পুরুষের বাস্তবতাবোধ এ ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে নি কেন?

শরৎচন্দ্র এ জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও এ ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক করেন তাঁর 'চন্দ্রশেখর' নামক উপন্যাসে। প্রতাপ ও শৈবলিনী শৈশবকাল থেকেই প্রণয়াবদ্ধ ছিল। পরে বিবাহিত জীবনেও ঐ প্রেমাসক্তি তাদের

জীবনে বিদ্যমান ছিল। এর ফলে নানা বিপর্যয় ঘটে। ঐ অবস্থায় প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে প্রশ্ন করে, অপরের স্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি যদি দুর্বলীর হয় তাহলে প্রায়শ্চিত্যের ফলে কি ঐ দোষ খণ্ডন হয় না? রমানন্দ স্বামী বলেন, 'তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক।' অর্থাৎ নারী-পুরুষের যৌনাকর্ষণমূলক বিষয়বস্তুর প্রতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সীমিত মাত্র। অচলা মহিমের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করবে এটা জেনেও অচলার প্রতি সুরেশের আকর্ষণ দেখা দেয়। এ ধরনের আকর্ষণের মূল কি? এর জবাব মেলে মনঃ সমীক্ষণ তত্ত্বে। ফ্রয়েড বলেন জৈবশক্তির (biological) আবেদনই এস্থলে সক্রিয়। ঐ শক্তি কার্যকরী হয় অবচেতনের মাধ্যমে। এজন্য এর সুস্পষ্টরূপ মানুষের নিকট অজ্ঞাত। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য এর সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট পথ অবচেতনকে সচেতনে এনে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলা, নয়ত এটা যে অযৌক্তিক সে সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ। তবে এ স্থলে মনঃ সমীক্ষণ তত্ত্বের বিশেষ অবদান এই যে, যে অবচেতন শক্তি মানুষকে এ ধরনের বাস্তবতা-বিরোধী কাজে প্রবৃত্ত করে তার উৎস সন্ধান ও স্বরূপলাভ বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

এবার পুনরায় সুরেশ-অচলা প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। সুরেশ ও অচলা উভয়েই বহু গুণসম্পন্ন। সুরেশ পরোপকারী, সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। অচলা সুশিক্ষিতা, ধীর, স্থির প্রকৃতির নারী। কিন্তু যৌন-আবেদনের ক্ষেত্রে তারা দুর্বল প্রকৃতির। তবে কোন-কোন সমালোচক বলেন সুরেশ ছিল মূলতঃ আবেগপ্রবণ ও চঞ্চল স্বভাবযুক্ত আর অচলা ছিল ঠিক বিপরীত প্রকৃতির নারী। এজন্য সুরেশ নিজের অজ্ঞাতসারে স্বকীয় মানসিক ক্রটির পরিপূরণের চেষ্টার বশেই অচলার নিবিড় সান্নিধ্য-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরণের মানসিকতার রূপ প্রেমে পর্যবসিত হয়। হয়ত এই শক্তিই সুরেশকে অধিকতর রূপে অচলার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও অবচেতন মনের প্রেরণা বিদ্যমান বলে মনে হয়।

উপন্যাস পাঠে লক্ষ্য করা যায় সুরেশের আবেগভরা চিত্তের প্রতি অচলা প্রথম থেকেই আকর্ষিত হয়। এ ছাড়া সুরেশ ছিল ধনী ও মহিম দরিদ্র। এ জন্য অচলার পিতা কেদার বাবু দুটি যুবকের ভিতর সুরেশকেই জামাতারূপে গ্রহণ করার জন্য অধিকতরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে অচলার মনও প্রথমদিকে দোলায়মান হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মহিমকেই স্বামী রূপে গ্রহণ করে।

তবে এ মিলনের মধ্যে এক ছিদ্র ছিল। মনে হয় অচলার চিত্তে সুরেশের আবেগ-প্রবণ ও চঞ্চল স্বভাবের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় ভাবই দেখা দেয়। পরে সেটা একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়। সুরেশও অচলার এ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত হয় ও এরই সুযোগ নিয়ে সে প্রচণ্ড রকমের এক হঠকারিতা করে বসে। কিন্তু অচলা তখন স্ববশে ফিরে আসে। তার ভিতর সচেতন-বোধ জেগে ওঠে। একদিকে অপরাধ-বোধ অপরদিকে বাস্তবতা-বোধ দুয়ের এক সংমিশ্রিত রূপ তার মনে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার পথ তখন তার আয়ত্বের বাইরে। পরিশেষে অচলা স্বামীর নিকট ফিরে এলেও এক Tragic অবস্থারই সৃষ্টি হয়।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'-এর কথাও তুলব। তিনটি উপন্যাসেই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়। 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ীর ভিতর অবদমিত প্রেমাকাঙ্খা বিদ্যমান ছিল। নায়িকা, স্বামীর নিকট থেকে ঐ চাহিদা মেটাতে পারে নি ও সেজন্য সে উপেন্দ্রের প্রেম কামনা করে ও এ ক্ষেত্রে প্রতিহত হয়। ফলে তার ভিতর প্রতিহিংসার ভাব জেগে ওঠে—ফ্রয়েডের ভাষায় বলব তার বিনাশ-প্রবৃত্তি (Death-Instinct) প্রকট হয়ে ওঠে। সে তার প্রকাশ ঘটায় উপেন্দ্রের পরমাত্মীয় ও স্নেহভাজন দিবাকরকে ভুলিয়ে আরাকানে নিয়ে গিয়ে উপেন্দ্রের মনে ব্যথা দিয়ে। তার এ আচরণের জন্য মানসপ্রদেশে অপরাধ-বোধ দেখা দেয় ও ফলে সে মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী ছিল বাইজি। জীবনে তার প্রেমাকাঙ্খা অপূর্ণ ছিল। সেটা সে লাভ করতে চায় শ্রীকান্তের নিবিড় সাহচর্য লাভ করে। শ্রীকান্তের দিক থেকে এক মানসিক বাধা দেখা দেয়। সে বলে, 'লক্ষ্মী ! আমি তোমার জন্য সব ত্যাগ করতে পারি, কেবল পারি না আত্মসম্মান।' বলা বাহুল্য এ স্থলে নায়কের নৈতিক সত্তাই (Superego) মুলতঃ সক্রিয় হয়। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী বহুদিন একসঙ্গে কাটায়। পরিশেষে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ প্রেমের নিকট আত্মসমর্পন করে।

উপন্যাস তিনটির ভিতর কামনা-বাসনার অপূর্ণতার শিল্পাশ্রিত রূপ মেলে। গ্রন্থ তিনটির কোন-কোনটা প্রকাশের পর ঐগুলি তৎকালীন পাঠক-সমাজের নিকট কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে অল্পবিস্তর আন্দোলন ও বিক্ষোভও দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থগুলি রচনা করেন সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র মন নামক উপাদানটি কত রহস্যপুর্ণ ও তার আবেদন রক্ষা বা তার

সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি কাম্য এটাই তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে তিনি বলতে চান, নারীর সত্যিকার পরিচয় মেলে তার হৃদয়বোধের ভিতর অর্থাৎ তার সুকুমারবৃত্তি বা ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির ভিতর।

একভাবে বলা চলে শরৎচন্দ্র পাঠকসমাজের অন্ধ বা প্রথাগত অযৌক্তিক বিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে তাদের সচেতন-বোধে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চান। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র নিজেও একথা এক স্থানে বলেন।

পরিশেষে উল্লেখ করব, উপরিউক্ত উপন্যাস তিনটি শুধু সাহিত্যের সমৃদ্ধিই ঘটায়নি, মনে হয় মনঃসমীক্ষকদের নিকট একটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বলেও মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের কোন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক রোগ সম্পর্কে শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশ্বসাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ নাটক ও উপন্যাসগুলি পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এস্থলে বলা হয় সেকস্‌পীয়র, ডষ্টয়ভস্কি প্রভৃতি লেখকদের রচনা পড়লে মনের রহস্য সম্পর্কে অনেকখানি অবহিত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে ও বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ হতে পারে। এ ছাড়া এ ধরনের জ্ঞান মনোবিশ্লেষণেরও সহায়তা করতে পারে। আমি মনে করি 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসও লক্ষ-দুয়ারী মনের চাবিকাঠির খানিকটা সন্ধান দিতে পারে ও এজন্য মনের রহস্য সন্ধানের আধার-রূপী এ সব উপন্যাসকে বিশেষ উপযোগী বলে গণ্য করা চলে।

পুরুষ ও নারী—অর্দ্ধনারীশ্বর থেকে

(একটি কথোপকথন)

বিশ্বনাথ রায় *

পুরুষ : আমিতো কিছুতেই বুঝতে পারছিনা যে আমার সম্বন্ধে সব কিছু না জেনে-শুনে তুমি কি করে আমাকে ভালবাসতে পার ?

নারী : তোমার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি বা দেখেছি সেইটাই যথেষ্ট। কেননা তার বাইরে যা আছে বা যদি কিছু থাকে, সেটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। আমি ভালবেসেছি এবং তার জন্য ঘর বাঁধতে চাই। আমার পুত্র চাই, কন্যা চাই এবং সাংসারিক সব কিছুর মধ্যে আমি থাকতে চাই। আমার কাছে ঐ সীমাবদ্ধ জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট। এর বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে তা থাক। আমার জানার দরকার নেই। কিম্বা পরে ঘর বাঁধা হলে সেখানে বসে-বসে তোমার কাহিনী শুনব ছুটির দিনে দুপুর বেলায়।

পুরুষ : কিন্তু তুমি বোধ হয় ভাবতে পারছ না যে আমাদের এই সহাবস্থানের চিন্তা একটা মামুলী ব্যাপার নয়। আমাদের বিবাহ করতে হবে, অন্নের সংস্থান করতে হবে, পুত্র-কন্যা হলে তাদের জন্য সামাজিক প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারপর বয়স আছে যেটা বাড়বে। দেহের ক্ষুধা একদিন মিটে যাবে অনেকখানি, কিন্তু তখন আসবে মানসিক ক্ষুধা। সেটা মেটাবার মত ক্ষমতা আমাদের পরস্পরের মধ্যে থাকা চাই। তা নাহলে আমরা একই বাসায় থেকে বড় একা-একা থাকব।

নারী : একেবারে বাজে কথা। তুমি অতদূর ভাবছ কেন ? আজকেরটা আজ ভাব, কালকেরটা কাল আবার ভাবা যাবে। আর নিঃসঙ্গতা ? ওটাতো থাকবেই।

---

* রীডার ইন্ সাইকোলজি ; ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট্ অফ এডুকেশন্ (এন, সি, ই, আর, টি), নিউ দিল্লী।

কেননা যদিও আমরা বিবাহ নামক এক সামাজিক প্রথার মাধ্যমে যৌন সহাবস্থানের জন্য একটা অনুমতি পাব তবুও এ সব কিছুই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার প্রয়োজন একজন পুরুষকে—অবশ্য আপাতঃ পরিপ্রেক্ষিতে সে আমার মনের মত হওয়া দরকার। সে কাজটা তুমি সম্পূর্ণ করেছ। তোমার দরকার একজন স্ত্রীলোককে তোমার যৌন-ক্ষুধা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য। বংশধর তৈরী করার জন্যতো অবশ্যই দরকার। বলনা, আমার দ্বারা তা কি হবে না ? আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় না ?

পুরুষ : এই শেষ প্রশ্নগুলো উঠতোনা যদি আমরা পরস্পরকে আরও গভীরভাবে জানতাম। এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে তুমি আমাকে আজও সম্পূর্ণ বুঝতে পারনি। যদি বুঝতে পারতে তাহলে এই প্রশ্নগুলো জাগত না তোমার মনে এবং দরকার হোত না পুনরায় পরস্পরকে মূল্যায়ন করার। ভালবাসাটা আর কিছুই না, একটা রহস্যকে ভেদ করার চেষ্টা করা মাত্র। কোনও একটা বস্তুকে বেশ গভীর ভাবে অর্থাৎ তলিয়ে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাটাই ভালবাসা এবং ভালবাসার ফলই হচ্ছে সেই বস্তুকে আর ত্যাগ না করা। মধ্যে-মধ্যে এমন ঘটনাও ঘটে যখন ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সেই বস্তুর প্রতি গভীর আকর্ষণটা কিন্তু কমে যায় না। ‘চেষ্টা করাটা’ আকর্ষণের মাধ্যমেই গড়ে উঠে, যেমন তুমি আমার প্রতি আকর্ষিত এবং সেইজন্য আমার সম্বন্ধে বা তোমার সম্বন্ধে কিছু রহস্য ভেদ করতে চাইছ যাকে তুমি বলতে চাও ভালবাসা।

নারী : এতে রহস্য ভেদ করার কি আছে ! পতঙ্গ কি রহস্য ভেদ করার জন্য আলোর দিকে যায় ? এটা সহজাত, এটাকে এড়ানো যায়না। মনে হয় আমার ভেতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছি না কিছুতেই, এবং যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে চলে যাচ্ছে। তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় যেন আমি তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার দেহের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি এবং শেষে তোমার আমার মধ্যে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাইনা। সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার সব কিছু তোমার মধ্যে হারিয়ে গেছে অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

পুরুষ : তুমি যে কথা বললে তাতে আত্মসমর্পন আছে। অর্থাৎ আমার মধ্যে তুমি বিশেষ গুণ কিছু দেখেছ বা পেয়েছ যেটা তোমার কাছে বেশ বড় ধরনের একটা-

কিছু বলে মনে হয়েছে। আমার সম্পর্কে এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারনাই তোমাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়েছে। অর্থাৎ আমাকে তুমি বড় করে দেখেছ তোমার চেয়ে এবং তুমি নিজেকে আমার কাছে করে তুলেছ অনেক ছোট। বয়সের দিক থেকে বড়তে আর ছোটতে ভালবাসা হয়না, যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্নেহ। পিতা-কন্যা বা মাতা-পুত্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভালবাসা সম-সম ভাবেই হয়। তুমি যেহেতু আমাকে একটা বিরাট কিছু ভেবেছ সেইজন্য সম্পর্কটা হয়ে গেছে পিতা ও কন্যার এবং তার জন্য তুমি চাও আমার কাছে স্নেহ, একটু আশ্বাস বা আদর। কিন্তু ভালবাসা চাও না।

নারী : তাহলে সমাজে এই নিয়ম কেন আজও অনেকেই মেনে থাকে যে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বয়সে বড় হবে ?

পুরুষ : ঐ আত্মসমর্থনটা বজায় রাখার জন্য। স্ত্রীজাতিকে ঐ ধরনের সম্পর্কে রাখাটা বোধহয় কেউ-কেউ পছন্দ করেন। এটা গায়ের জোরও বলতে পার। এবং এর দ্বারা একটা লাভ হয় যেটা হচ্ছে, কলহ বিবাদটা বেশী দুর এগোতে পারেনা যখনই দৈহিক শক্তির পরীক্ষা এসে যায়। আর তা ছাড়া স্ত্রীজাতির মধ্যে কলহপ্রিয়তার যে লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলোকে রোধ করতে হলে শারীরিক শক্তির অবশ্যই দরকার হয় পুরুষের পক্ষে, এইসব ক্ষেত্রে সেই জন্য ভালবাসা কোনও কালেই জন্ম লাভ করে না। যা হয় তা হচ্ছে পিতা-কন্যা বা মাতা-পুত্র সম্পর্কের মত একটা সম্পর্ক মাত্র। এতে সামাজিক গণ্ডগোলও বিশেষ দেখা দেয় না কেননা এই আত্মসমর্পণ সেসবকে দুরে ঠেলে দেয়। কিন্তু সম-সমভাবে যেহেতু সহাবস্থান থাকে, আকর্ষণ থাকে, পরস্পর পরস্পরের জন্য অনুভব করে এবং সেই অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয় অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে, সেখানে ভালবাসা জন্মাতে বাধ্য। এই ভালবাসার মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় আভাস আছে। এবং যেখানে ভালবাসা পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তার জন কোন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা বা আশাও থাকে না। একটা আনন্দের অনুভূতি পরস্পরকে নাড়িয়ে দেয় এবং যদি বা কোন জাগতিক দুরত্ব তাদের মধ্যে এসে যায় তবুও তারা অতি নিকটেই আছে বলে মনে করে নিজেদেরকে। একটা নিশ্চিন্ত আনন্দ পাওয়া যায় ভালবাসায়।

নারী : আমিও তো সেই আনন্দই চাই। কিন্তু তুমিতো তা পেতে দিচ্ছ না। তুমি ভাবছ যে আমার এই চাওয়াটাই অযথা। কেননা আমি তোমাকে না বুঝে

আমার আকাঙ্খা, আশা ও উদ্বেগগুলোর সমাধান করার জন্য তোমাকে একটা 'নটবর', 'নায়ক'—তোমার কথায় 'পিতা'—ভেবে নিয়েছি। না, তা নয়। আসলে তুমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও অচিন্তিত অথবা ঝুঁকি নিতে রাজী নও। তুমি একটা ভীরু, কাপুরুষ বা স্ত্রী-স্বভাবী পুরুষ। তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাও। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও দিন, কোথাও কেউ কোনও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে? সূর্য্যের গতি, পৃথিবীর অস্তিত্ব, আমার তোমার সবাইয়ের জীবনের মাপ কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। সবই ক্ষয়িষ্ণু এবং কোনও না কোন সময়ে সব কিছুই পুনরায় পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। এবং এইটাই নিশ্চিত। কিন্তু মানুষ এই নিশ্চিত সংবাদ জেনেও তাকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। তাকে জয় করতে চায়—সব জেনে শুনেও যে তা সম্ভব নয়। চায় অমরত্ব। চায় চিরস্থায়িত্ব। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে শুধু পৃথিবী কেন, সমগ্র বিশ্ব একদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। একতিল জায়গা থাকবে না কোথাও শুধু দু'পায়ে দাঁড়াবার জন্যও। সেইজন্যই মৃত্যু দরকার এবং এইজন্যই সেখানে মহিমা আছে। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের বাইরে তুমি আমি বা কোন কিছুই কিছুতেই যেতে পারি না। এই অনিশ্চিতটাই নিশ্চিত। সেইজন্য তুমি যা বলছ সেটা একটা দিবাস্বপ্ন মাত্র। সেটা সম্ভব নয়। ওটা একটা আদর্শমাত্র যার সঙ্গে নিত্যকার জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি এই ভ্রান্তিতে বশীভূত হয়ে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিয়ে রাজী হতে পারছ না। তোমার এই দুর্ব্বলতাই তোমাকে অক্ষম করেছে। এর জন্য তুমি ভালবাসতে পারছনা কাউকে। তুমি যাকে স্নেহ, আদর বলছ ওটাও ভালবাসা। এবং ভালবাসা স্নেহ, আদর ছাড়া টিঁকবে কি করে? হয় তুমি আমার কাছে চাইবে, নয়ত আমি তোমার কাছে চাইব। ক্রমশঃ-ক্রমশ: দুজনেই দুজনের কাছে চাইতে থাকব এবং একটা সময় আসবেই যখন আর পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারা যাবে না। তখনই আমরা ভালবাসায় পড়ব দুজনে। ভালবাসাকে অর্জন করে নিতে হবে। একি 'ছেলের হাতের মোয়া' যে চাইলেই পাওয়া যায় বা একটা সাধারণ যৌন-সম্পর্কিত কৌতুহল যে মিটে গেলে ফেলে দিলাম। এবং সেইজন্যই সমাজের পিতারা বিবাহ নামক অনুশীলনের আয়োজন করেছেন যাতে সমাজের স্বীকৃতি নিয়ে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী কোনও একসময়ে একত্রিত থাকার জন্য ভাবতে পারে। এবং এই যৌন আকর্ষণটাইতো আসল এবং প্রাথমিক দরকার।

তারপর ভালবাসা। আগে যৌন-ক্ষুধা মিটুক তারপর মানসিক ক্ষুধা। তুমিই বল?

পুরুষ : অনেক কথা বলে ফেলেছ। কিন্তু তবুও তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি যা ভেবে বলছ সেগুলোর সবটাই তোমার কথা এবং সেগুলো তোমার যুক্তিগুলোকে অবশ্যই আরও বেশী করে সমর্থন জানায়। কিন্তু আমি? আমি কি নিয়ে থাকব? আমার কথা কে শুনবে? বিবাহের পর ছেলে-মেয়ে হলে তুমি তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে এবং আমাকে তখন তুমি একটা অর্থ আগমনের পথ ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। তোমার কাছে তোমার পুত্র-কন্যা, চাল, ডাল, চিনি, উনুন, কড়া-হাঁড়ী, রান্নাঘরই সব হবে। আমি পুনরায় নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো। বসার ঘরের আলমারীতে যে বইগুলো আছে তারাই হবে আমার সঙ্গী। কিছু বাইরের কাজ থাকবে। আর থাকবে তোমাদের প্রতি কিছু 'কর্তব্য' পালন করা। এর দ্বারা আমি সেই নিঃসঙ্গ পুরুষই রয়ে গেলাম। তুমিও দূরে সরে যাবে। যদিও থাকবে পাশের ঘরে, হয়ত আমার মাথা ধরলে একটু দয়া করে টিপে দিতে আসবে। তুমি পেয়ে গেছ তোমার পুত্র-কন্যা, রান্নাঘর। আমি তখন তোমার ঘরে একটা ঠাকুর হয়ে যাব। পূজো করবে। যদি আমি কোনও দিন ক্ষেপে গিয়ে ঘরে আর টাকা না আনি, কিম্বা অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে যদি ভেগে যাই তার ভয়ে তুমি বলবে, 'তোমার সংসার তুমি দেখবে নাতো কি আমি দেখব?' আমি স্পষ্ট বুঝতে পারব তুমি মিথ্যা কথা বলছ। সংসারটা তোমার আমি সেখানে একটা জন্তু, যে তোমাদেরকে সতর্ক পাহারায় রাখবে যাতে বাইরের কোনও কিছু তোমাদের কোনও ক্ষয়-ক্ষতি করতে না পারে। আমি হারিয়ে যাব নিঃসঙ্গতা হতাশা, ক্লান্তি আর মানসিক অপমৃত্যুর মধ্যে। আমি ভাবব আমাকে কেউ ভালবাসে না। শুধু দরকার মত একটু অভিনয় করে আমার সঙ্গে সবাই ভালবাসার নামে—তুমি করবে, ছেলে করবে, মেয়ে……।

না, আমার মেয়ে সেও কি ঐ ভাবে ফাঁকি দেবে! না, না, তা হতেই পারে না! অসম্ভব!

নারী : দেখলে তো এখনও কতখানি ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে আছ? তুমি আশা কর তোমার মত একটা ব্যক্তিকে তোমার মেয়ে ভালবাসবে। সেও তোমার কাছে স্নেহ, মমতা চাইবে। কিন্তু ভালবাসবে বা যৌন-সংক্রান্ত ব্যাপারে

অন্যকারুর প্রতি আকর্ষিত হয়ে উঠবে। সেইজন্যই বলছি তোমাকে সাহসী হতে হবে, ঝুঁকি নিতে হবে এবং দেখবে এগুলোর মধ্যে কি রকম একটা পুলক আছে। তুমিও জিতবে—আমি তাই মনে করি এবং বিশ্বাস করি এবং সেই পুলকে দেখবে তোমার মধ্যেকার একটা প্রাণ হঠাৎ বলে দেবে তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি তোমাকে ভালবাসি—আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি। এবং আমাকে ভালবাসায় ও বিবাহের মধ্যে যে সামান্য ঝুঁকি আছে সেটা কিছুই নয়। সেটাতো চোখ বুঁজে করে ফেলা যায় এবং করার পর দেখবে যে এটা একটা ঝুঁকিই ছিল না এবং তোমার আশঙ্কাগুলো দুশ্চিন্তাগুলো একেবারেই অমূলক ছিল।

পুরুষ : আমি জানি এবং বুঝতে পারছি যে তুমি আমাকে সাহসী করতে চাইছ অর্থাৎ আমাকে আবার 'নায়ক' হতে হবে। কিন্তু তুমি জান না আমার মধ্যে কতকগুলো ধারণা আছে যেগুলো আমাকে একটা অদ্ভুত করে তুলেছে। সেগুলো শুনলে তুমি, শুধু তুমি কেন সবাই, যাদের সঙ্গে সেগুলো জড়িত তারা সবাই আমাকে দেখে হাসবে, আমার কথা শুনে হাসবে। কেউ-কেউ হয়ত আমাকে অবজ্ঞা করবে এবং হয়তো কিছু লোক ধরে মারধোরও করতে পারে। এই চিন্তাগুলোই আমাকে স্থানুবৎ করে রেখেছে। আমি চাই ভালবাসতে। কিন্তু এরা যেন বলে 'পাগল, ভালবাসতে চায়'।

নারী : কি সেই চিন্তাগুলো?

পুরুষ : যেমন ধরো 'জন্ম' সম্পর্কে'। আমার মনে হয় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী তাদের নিজেদের যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সময় আমার জন্ম দিয়েছিল এবং এইভাবে সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের যৌন মিলনের উত্তেজনায় আনন্দ পাওয়ার সময় আমার মত অজস্র শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জানতেও পারে না যে কি হয়ে গেল। একটা আনন্দ পাওয়ার জন্যই তারা যে কাজ করেছিল, সেই কাজটা স্মৃতি তাদের কিছুদিনের মধ্যে এক গভীর বিষাদে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। একবার যখন হয়ে গেছে তখন যা হয় হবে সুতরাং যে শিশুটি এলো সে এদের আনন্দ পাওয়ার মাধ্যমেই হঠাৎ এসে গেল এবং পরে এদের বিষাদের কারণ হোল। ওরা চেয়েছিল আনন্দ কিন্তু পেল পরে শিশুর জন্মলাভের দুঃসংবাদ এবং অতিশয় বিষাদ ও এক ধরণের রাগ যার উৎপত্তি : 'কি করে যে হয়ে গেল, বুঝতেই

পারা গেল না। ইস্ আর একসেকেণ্ড আগে রুখে গেলেই হোত না'—ধরণের চিন্তা থেকে। সুতরাং শিশু হয়ে উঠল তার পিতা-মাতার বিরাগের কারণ অথচ কথা ছিল আনন্দ দেওয়ার। কিন্তু সমাজতো ছাড়বে না পিতা-মাতাকে। খানিকটা দায়িত্ব-বোধ, কর্তব্যজ্ঞান বা অপরাধ-বোধের স্খলন করার জন্য সেই শিশুকে তারা মানুষ? করতে বা বড় করতে লাগল। তারা তাদের শিশুকে আর ভালবাসতে পারল না কোনওদিন। কেননা সে হচ্ছে তাদের অবাঞ্ছিত শিশু। যৌন-আকাঙ্খা মেটান যাবে অথচ শিশু জন্মাবে না। কোনও রকম পরিবার-পরিকল্পনার সাহায্য না নিয়ে এমন কিছু একটা করা যায় না? যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটাতে যাবে কি, শিশুর জন্মলাভের পরে আর ওকাজ করার ইচ্ছা জাগে না। সুতরাং শিশুর প্রতি যে কর্তব্য, মমতা, পিতামাতার—দায়িত্ব দেখার সেটা আর কিছুই নয়, সেটা একটা প্রচেষ্টামাত্র যাতে শিশু না জানতে পারে যে সে তার পিতামাতার অবাঞ্ছিত শিশু। আমি আমার অনেকগুলি বিবাহিত বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। এবং-তাদের অধিকাংশেরই মত হচ্ছে যে কখন যে কি করে 'হয়ে' যায় সেটা বলা খুব কঠিন। তবে স্ত্রী হয়ত দেহ গরম হয়ে যাওয়ার থেকে কিছুটা বলতেও পারে। এবং এই সংবাদের ভিত্তিতেই আমি বলছি যে পৃথিবীর অধিকাংশ: শিশু অবাঞ্ছিত। শুধুমাত্র 'বিবাহিত' মার্কা একটা ছাপ থাকলেই একদল রেহাই পেয়ে যায়। অন্যান্যরা একটু লজ্জায় পড়ে যায়। আমি দেখেছি নতুন বিবাহিতরা যখন প্রথম পিতা-মাতা হতে চলেছে জানতে পারে তখন তারা কি একটা লজ্জায় যে পড়ে না দেখলে এবং না অনুভব করলে বোঝা যায় না।

নারী : এগুলো যৌনসংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। এবং সব মানুষই তার অজ্ঞতার মূল্য শেষ কানাকড়ি অবধি শুধতে বাধ্য। এরই জন্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে নানাদিক থেকে নানাভাবে। আর লজ্জার ব্যাপারটা একটা অপরিপক্কতার নিদর্শন। সমাজের স্বীকৃতি নিয়েই যখন বিবাহ হয়েছে তখন কোনও একজন অপারগ না হলে আশা করা যায় যে তাদের ছেলে-পিলে হবে। এতে লজ্জার কি আছে? এসবও তোমার মনগড়া দিবা-স্বপ্ন। একজন স্ত্রীলোকের কাছে তার প্রথম সন্তান হওয়ায় সংবাদটা যে কতটা রোমাঞ্চকর, তা তুমি বুঝবে না। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা একদিকে আর জঠরে সন্তানের অবস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জন করা অভিজ্ঞতা তাদের কাছে সমান সমান। এ বিষয়ে তোমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

পুরুষ : কিন্তু সন্তান যদি বুঝতে পারে সে তার পিতা-মাতার অবাঞ্ছিত শিশু ছিল প্রথমাবস্থায়, তাহলে তাকে যে ভীষণ একটা গ্লানিতে পেয়ে বসে সে তুমি বুঝতে পারবে না। এবং সেই গ্লানি তার মধ্যে ভয়, আশঙ্কা এবং সকল প্রকারের দুর্বলতাকে একসঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়। তার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা বেশী ভয়, কেননা ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী আত্মাভিমানী বা আত্মসচেতন যা খুশী ধরে নিতে পার। কিন্তু আত্মগ্লানির বোঝা যে কি মারাত্মক হতে পারে সে তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি ভাগ্যবতী, কেননা তোমার মধ্যে সেই বোধ নেই। আমার আছে এবং সেই জন্য আমার মেরুদণ্ড থাকলেও একটা 'মেরুদণ্ডহীন' প্রাণী হয়ে গেছি। আমার মনে যখন থেকেই এই বোধ জেগেছে তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে, জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ, দিন-রাত্রি বা এই ধরনের বিপরীতধর্মী বস্তুগুলোর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। তুমি যে দেখছ আমি বেঁচে আছি অর্থাৎ আমার একটা স্ব-ইচ্ছা আছে যার দ্বারা আমার চিন্তাধারা, নড়ন-চড়ন প্রভৃতিকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক করতে পারি এসবের কিন্তু কোনও অর্থ নেই আমার কাছে। আমি ভাবি যে আমি মরে গেছি। আচ্ছা, তুমিও যদি ভাব যে আমি মরে গেছি তাতে কি কোনও তফাৎ ধরা পড়ে আমার বেঁচে থাকার সঙ্গে?

নারী : যা ঘটেনি তার চিন্তা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমার চিন্তা সব সময় বাস্তবকে ঘিরে থাকে।

পুরুষ : তুমি বাস্তব বলতে বোধহয় কতকগুলো immediate reality এ'র কথা ভাবছ। কিন্তু ভেবে দেখ এগুলোর কি কোনও ultimate মূল্য আছে? সময়ের স্রোতে সব কিছু ভেসে যাবে, সব কিছু গ্রাস করে নেবে। সুতরাং তোমার কাছে বাস্তব হচ্ছে এই মনটুকু, তার ঘটনাগুলো এবং তৎক্ষণাৎ অতীতের স্বপ্ন। এছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য তোমার চাওয়া বা পাওয়ার ব্যাপারটার সহিত এর মিল আছে। কিন্তু এইটাই শেষ নয়। এবং আমার সম্বন্ধে যে ধারণা তোমার কিছুক্ষণ আগে অবধি ছিল, সেই ধারণা ঠিক এই ধরনের কতকগুলো অস্থায়ী বাস্তবকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা। এই অস্থায়ী বাস্তবগুলোর মধ্যে আছে আমার চেহারা, বাচনভঙ্গী, উপার্জন ক্ষমতা, বিদ্যাবত্তা। এবং এই সবগুলো মিলিয়ে তোমার কাছে আমি একটি 'x' হয়ে দেখা দিয়েছি। সেটা কি আমি জানিনা। তবে তুমি হয়ত বলতে পার। আমিও ঠিক ঐ রকম কতকগুলো জিনিষের

সমষ্টি তোমার মধ্যে পাই এবং তুমিও আমার কাছে ঐ রকম একটা 'x'। এক একটা মুহূর্ত আসে যখন মনে হয় তোমাকে আমার দরকার শুধু মাত্র যৌন-ক্ষুধা মেটানোর জন্য। কিছুক্ষণ পরে সেটা চলে যায়। তখন তোমার কথা আর মনে আসে না। অন্যান্য কাজের ভীড়ে সব মিলিয়ে যায়। তুমি তখন অবচেতন মনে চলে যাও। ফাইল, অফিস্, বন্ধু, চা, খেলা ওপরে ভেসে আসে। আশে-পাশে কোনও সুন্দরী মহিলাকে দেখলে তোমার কথা মনে পড়ে। আমি তুলনা করে দেখি কে ভাল দেখতে। মাঝে-মাঝে মনে হয় তোমাকে ভাল দেখতে। কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন মনে হয়না যে তোমাকে ভাল দেখতে। ঐ রাস্তার মেয়েটাকেই ভাল লাগে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমাকে সে চিন্তা দূরে ফেলে দিতে হয়। আমাকে চেষ্টা করে ভাবতে হয় এবং তার সঙ্গে জোর করে একমত হতে হয় যে 'না তোমাকেই ভাল দেখতে'। কেননা, আমার মনে হয় আমি একটা অপরাধ করে ফেলব যদি আমি তোমাকে ভাল না ভেবে অপর কোনও মেয়েকে ভাল ভাবি। আমার মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব বা কর্তব্যজ্ঞান জন্মে গেছে। যার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কোনও মেয়ের কথা চিন্তা করা আমার কাছে অপরাধ মনে হয়। তোমার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। তোমার দেহের সব কিছু আমি চাইলেই তুমি দেবে। তুমিও যদি আমার কাছে দশটা টাকা চাও আমিও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেব। কোথাও কোনও কাজের কথা জানালে আমি অনুগত ভৃত্যের মত তা করে দেব এবং অবশ্যই তাতে আমি আনন্দ পাব। কিন্তু পরে রাগও হবে। মনে আসবে তুমি কে যে তোমার সব কিছুর প্রতি আমার এই ধরনের একটা আনুগত্য থাকবে ? হাজার-হাজার মেয়ের মতন তুমিও একজন। তোমার চেয়ে দেখতে ভাল, উপার্জনক্ষম মেয়ের অভাব নেই। কেন তোমার জন্য আমি আমার স্বার্থকে ত্যাগ করব বা নিজেকে পীড়ন করব এই ভাবে ? সেই মুহূর্তে মনে হয় আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে আর দেখা করব না এবং ভবিষ্যতে যদি কোনও দিন দেখা হয় তাহলে 'না' করে দেব। মনে রাগ হয়। সামনে যে টেবিলটা আছে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে, মনে হয় মারি এক লাথি ঐ কাঁচের গেলাসটায়, নিজের চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলি, বেশ জোরে দৌড়ে পালিয়ে যাই জঙ্গলে। কিন্তু কিছুই করতে পারিনা। ঠিক যেমনটি তেমনটি থাকি। ঘাড় গুঁজে ফাইলের পাতা ওলটাই, রুটিন অনুযায়ী ছাত্রদের পড়াই। সময় শেষ হলে চলে আসি অফিস থেকে।

নারী : এতসবও তোমার মনে আসে ? আমি কিন্তু এত ভাবি না। আমার শুধু মনে হয় আমাকে তোমার কাছে যেতে হয় তোমাকে পাওয়ার জন্য। তোমাকে পেলে আমি খুশী হই, আনন্দ হয়। তুমি যতক্ষন আমার কাছে থাক, মনে হয় ঐ সময়টুকু কত মূল্যবান। কবে সেই সময় আসবে যখন চিরকালের মত তোমাকে আমার করে নিতে পারব ?

পুরুষ : আমাকে বলতে দাও। অফিস থেকে বেরিয়ে আমার অন্য চিন্তা আসে মনে। মনে হয় তবুও তো একজন আমায় অপেক্ষায় কোথাও না কোথাও সময় গুনছে। হয়ত ঐ একজনই আমার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। রাস্তায় হাজার-হাজার মেয়েকে পাওয়ার কথা চিন্তা করার কোন অধিকার বা সেই ধরণের দৈবিক ক্ষমতাও আমার নেই। আবার এও হতে পারে যদি আমি কাউকে নিয়ে বসি, আর সে যদি আমাকে অবজ্ঞা করে তাহলে তো আমি জঞ্জাল হয়ে গেলাম। না না 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা' যায় না। আমার যতটুকু ক্ষমতা ঠিক ততটুকুর মধ্যে বেঁচে থাকার চিন্তা করাই আমার উচিৎ। সাধ্যাতীত কোনও ঘটনা বা চেষ্টার প্রতি ঝুঁকে পড়ায় কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আর তা আমার ক্ষমতার বাইরে। যখনই এই অক্ষমতার জ্ঞান বিকেলে আমার মধ্যে আসে আমি গুটি-গুটি তোমার কাছে চলে আসি। এবং তৎক্ষণাৎ মনে হয় তোমাকে পেতে পারি আমার এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মাধ্যমে। তাই বাইরে কোনও চেষ্টা করা আমার উচিৎ নয়। সুতরাং বিকেলটা তোমার সঙ্গে কাটাই। কিন্তু কিছুতেই আমি ভাবতে পারি না যে আমি তোমাকে সহজাতভাবে ভালবাসি। মনে হয় কে যেন আমার ঘাড় ধরে তোমাকে ভালবাসাবার চেষ্টা করছে। আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে 'না, না' করে ওঠে। কিন্তু বাইরে আমাকে দেখাতে হয় যে আমি কত ভালবাসি। এবং তুমিও সেইটাকেই একটা আসল জিনিষ ধরে নিয়ে আমাকেও ভালবাসতে শুরু করেছ। তুমি একটা মায়ার খেলায় মেতেছ। তুমি আমার 'x' বা ছায়াকে ভালবাস। আমাকে নয়। কেননা আমার মনের গভীরতম দেশের চিন্তাকে তুমি জানতে না। এবং যেহেতু আমরা পরস্পর পরস্পরের 'x' টাকে বা বাহিরটাকে ভালবাসি বা পরস্পরের সম্পর্কে একটা মন-গড়া, স্বপ্ন-ঘেরা মূর্ত্তিকে (এটাকেও 'x' বলতে পার) ভালবাসি সেহেতু। আমরা সবাই একটা মায়ার প্রতি আকৃষ্ট। আসলে আমরা কেউ কাউকে ভালবাসি না, ভালবাসার অভিনয় করি মাত্র। আমরা ঘৃণা করি পরস্পরকে—নিজের অভিনয়ের কথা

চিন্তা করে, অপরকে নকল করার চেষ্টা করার জন্য। যেহেতু সমাজের অন্যান্যদের উপস্থিতির ও তাদের মন্তব্যের ভয় আছে, সেহেতু আমরা পরস্পরকে জোর করে ভালবাসি বা ভালবাসতে চেষ্টা করি। কেননা মনে-মনে নিঃসঙ্গতার ভয় আছে। অথবা হতাশা, বেদনা যখন পাগল করে তোলার মতন করে তখন মনে হয়, 'যদি কেউ আমাকে একটু আশ্বাস দিত বা মমতা বা স্নেহ দেখাত' 'একটু সান্ত্বনা বা অভয় দিত' তাহলে নিঃসঙ্গতা বা হতাশা আমাকে এত কাহিল করত না। তাহলে পিতা-মাতার অবাঞ্ছিত শিশু হওয়ার গ্লানি আমাকে অর্দ্ধমৃত করে রাখতে পারত না। এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা, আত্মগ্লানি প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই প্রতিটি মানুষ আদিমকাল থেকেই চেষ্টা করে চলেছে। সামাজিক অনুষ্ঠান বা নিয়মগুলি এই কারণেই তৈরী করা হয়েছে। সবাই সবাইকে দেখবে, রাখবে তার, জন্য চিন্তা করবে। একে অপরের শোকে, দুঃখে, উৎসবে যোগদান করবে তার যন্ত্রণা বা আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য। যে দুঃখে শোকে বা উৎসবে নিমগ্ন সে যেন জানতে পারে যে 'হ্যাঁ, এরাও আমার আশে-পাশে আছে এবং এরাও আমার দুঃখ, শোক বা উৎসবে সমপরিমাণে অংশগ্রহণকারী'। কিন্তু এটাও কি একটা হাস্যকর ব্যাপার নয়? কারুর আত্মীয় মারা গেল। তার জন্য আমি দুঃখিত হব কেন? কারুর বাড়ীতে উৎসব হোল। সেখানে আমাকে যেতে হবে কেন? এসব আর কিছুই নয়—লোকভয় বা চক্ষুলজ্জার ব্যাপার—যেটা সাধারণতঃ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ঐ ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এ সবকিছুই ভণ্ডামী এবং এই ভণ্ডামীই আমাদের স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। একেই আমরা বলে থাকি 'সভ্যতা'। জন্তুরাতো জামাপ্যান্ট পরে বেড়ায় না। তারা তো যৌন-সংক্রান্ত কাজকর্ম সর্বজনসমক্ষেই করে থাকে। মানুষের মধ্যেও আদিমযুগে এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু ঐ 'সভ্যতা' তাকে জামাপ্যান্ট পরিয়েছে। অর্থাৎ যৌন-সংক্রান্ত ব্যাভিচারিতাকে রোধ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। সবকিছুকেই ধামাচাপা দেওয়ায় চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ যদি চেঁচিয়ে কথা বলে, গাল-ফুলিয়ে খাবার খায়, জোরে চুমুক দিয়ে চা খায়, মুখ টিপে হাসার বদলে হো-হো করে হেসে ফেলে, সভ্য সমাজের লোকেরা ফিরে দেখে তাকে। কেউ-কেউ তাকে 'গেঁয়ো' বলে এড়িয়ে যায় আবার অনেকে তাকে 'দিলদরিয়া', 'প্রাণখোলা' লোক বলে গ্রহণ করে। তার হাতে যদি টাকা থাকে, অনেক লোককে চাকরী দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে সবাই যাকে 'মুক্ত-পুরুষ' বলে পুজো করবে।

আর যদি না থাকে তাহলে 'পাগল' বলে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। এ সবই ঐ 'সভ্যতা' নামক একটি সামাজিক ঢাকনার স্বরূপ। ভেতরকার 'ইচ্ছা-দৈত্য' যেন বেরিয়ে না আসতে পারে। তাকে সব সময় চাপা দেওয়া দরকার। তা নাহলে অরাজকতা দেখা দেবে। স্ত্রীজাতির সম্মান থাকবে না। এই 'সভ্যতা' কিন্তু কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এটাকে বলা যেতে পারে যে 'It is a gentlemans Compromise' সুতরাং মানুষ 'সামাজিক জীব' হয়ে উঠল। নিঃসঙ্গতা, হতাশা, বেদনা, লাভ, লোকসান সব কিছুতেই সে সমব্যাথীর মত আশে-পাশের লোকেদের পেয়ে গেল। সে নিজের জন্য আপাততঃ নিশ্চিন্ত হোল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে।

নারী : তুমিও ভাব নাকি ? ভাবতে অবাক লাগছে ?

পুরুষ : আমি ভাবিনা যে তা নয়। ভাবি নিজের জন্য। ভাবি অপরের জন্য, ভাবি সমাজভুক্ত সবাইয়ের জন্য। এবং সেই জন্যই আমি প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে যখন দেখি বা তাকাই, কি ভয়ঙ্কর একটা ছবি আমার মনে আসে। আমার মনে হয় এরা হাতে একটা কিছু পেতে চায়, তা নাহলে ছোট ছেলে খেলনা না পেলে যেমন কাঁদে, মায়ের কোলে ওঠবার জন্য যেমন কাঁদে তেমনই কাঁদবে। সুতরাং এরা সবাই একটা কিছু চায়। কি যে চায় তা বলতে পারেনা, কেননা কি যে চায় তার সম্বন্ধে তাদের কোনও সম্যক ধারণা নেই। ছোটবেলায় বাবা-মা যা শিখিয়েছে বা করিয়েছে, ধরে নিয়েছে সেইটাই বোধহয় তাদের চাওয়ার একটা অংশ। তারপর দেখেছে অনেকেই পড়াশুনো করছে, বিবাহ করছে, চাকরী করছে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর-সংসার করছে, পেন্সান পাচ্ছে, শেয়ার-বাজারের গতি নিয়ে উঠা-নামা করছে, তারপর একদিন মরে যাচ্ছে। এও ধরে নেয় সঙ্গে-সঙ্গে যে 'সবাই যা করেছে আমিও তাই করব'। সবাই যেদিকে যাচ্ছে আমিও সেদিকে যাই। একটা গণ-ইচ্ছা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়। সেই গড্ডালিকা প্রবাহের সেও একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভেবে দেখেনা যে তার সেই গতিপথ সে পালটাতে পারত কি না ? অন্য কিছু একটা সে করলেও করতে পারত কি না ? একজন হয়ত ভাবে কিন্তু পুনরায় ঝুঁকি নেওয়ার বিপদাপদের কথা চিন্তা করে আর সেদিকে যায় না। সেও ঐ গণ-ইচ্ছায় যোগদান করে।

নারী : এই নিয়ে একটা মজার গল্প তোমাকে শোনাই। একবার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের মধ্যে তুমুল তর্ক বাধে। বিষয় অধিকাংশ বিবাহিত ব্যক্তিরা

স্ত্রী-আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে। মহারাজার পৌরুষে ঘা লাগায় উনি এর প্রমাণ চাইলেন। রাজ্যে প্রচার করে দেওয়া হোল যে, 'অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক মাঠে যারা বিবাহিত তারা যেন জমায়েত হয়। মহারাজার আদেশ।' মাঠের মাঝ বরাবর একটা দীর্ঘ দাগ দেওয়া হোল। মহারাজা ও গোপাল সেখানে গেলেন। এরপর ঘোষণা করা হোল যে, 'যারা তাদের স্ত্রীর কথামত চলে তারা দাগের একদিকে আর যারা তাদের স্ত্রীর কথামত চলে না তারা অন্যদিকে দাঁড়াক।' দেখা গেল একজন মাত্র ছাড়া আর সবাই স্ত্রীর কথামত চলে। মহারাজা হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছেন ভেবে বললেন, 'যাক এই রাজ্যে অন্তত: একজনও আছে যে আমার দলে।' কিন্তু গোপাল বলল, 'মহারাজ, ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন এবং ও যদি সত্যি-সত্যি স্ত্রীর কথামত চলে এটা হয়, তাহলে ওকে পুরস্কৃত করা দরকার।' মহারাজা ওকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে ঐ দিকে দাঁড়াল? লোকটি অত্যন্ত মৃদু ও ভীত কণ্ঠে বলল, 'মহারাজা, দোষ নেবেন না। বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় স্ত্রী বলে দিয়েছিল যে, 'যেদিকে ভীড় দেখবে সেদিকে যাবে না। তাই আমি ওদিকে না গিয়ে এদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' মহারাজার সব আশা চুরমার হয়ে গেল। মানব-চরিত্র সম্পর্কে গোপালের জ্ঞান দেখে তাকে পুরস্কার দিলেন আরও একখণ্ড জমি।

পুরুষ : আমার বক্তব্য-বিষয়টাও ঠিক ঐ ধরনেরই। তফাৎ এই যে তোমার উপাখ্যানে একজনও ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু আমার কথায় আছে। আমি ঐ মহারাজার কথা বলছি। সে অন্তত: চিন্তা করেছিল যে একজনও অন্তত: এই প্রবাহের বাইরে আছে, যে তার চেতনতা, ইচ্ছা প্রভৃতি নিজের মত করে চালনা করছে। কিন্তু তিনিও দেখলেন যে তাঁর ধারণা ভুল। মহারাজা যে এই ধরনের একটা সাহসিকতা চিন্তার ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিলেন এইটাই যথেষ্ট। এই প্রবাহের একমাত্র কারণ হচ্ছে 'ভয়'। নতুন দিকে, নতুন চেতনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে অবাধ্য সাহস দরকার তার অভাবই হচ্ছে একমাত্র কারণ। অপরে যা করছে আমি যদি সেটাও অন্তত: না করতে পারি তাহলে লোকের চক্ষে আমার কি দাম থাকল? আমি একটা দুর্বল, অপাংক্তেয় জীব বলে গন্য হয়ে যাব। সুতরাং ওরা যা করছে বা করেছে আমি প্রথমে সেইটাই করি। তারপর অন্য সব কিছু দেখা যাবে। কিন্তু হায় আশা! ক্ষমতা, আয়ু, আয়োজন সবই সীমাবদ্ধ। অপরে যা করেছে তাই করতে-করতেই জীবন শেষ হয়ে গেল, নিজের কিছু করার আর সময় হোল না। 'আমি' আর রইল না। যা রইল তা হচ্ছে

'ওদের মধ্যে আমি'। এরই জন্য বিবাহ ও বংশধর উৎপাদন করার চেষ্টা। কিম্বা কোনও একটা কিছু কাজ করা যার দ্বারা 'আমি অমর হয়ে থাকব' বা 'লোকে আমাকে স্মরণ করবে।' অর্থাৎ আমি যখন মরে যাব তখন ওরা কি আমাকে মনে রাখবে? নাও রাখতে পারে। নানা লোকের ভীড়ে আমার অস্তিত্বটা বিলীন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা কি কেউ চায়? সবাই চায় মৃত্যুর পরও সবাই বা অনেকে তাকে তখনও মনে রাখবে। অর্থাৎ আমার দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও 'আমার স্মৃতি' ওদের মধ্যে রয়ে যাবে। জাগতিক বেঁচে থাকাটা বংশধরদের মাধ্যমে আর মানসিক বেঁচে থাকাটা কাজকর্মের মাধ্যমে করার চেষ্টা সবাই করে চলেছে। এখানেও নিজেকে মৃত্যু-আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিজের ক্ষুদ্র পরিবার বা সামাজিক বৃহত্তর পরিবারকে এমন একটা কিছু দিয়ে যেতে হবে যার দ্বারা তাদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। অর্থাৎ 'আমি বাঁচতে চাই' এই ইচ্ছাকেই সবাই নানা ভাবে, নানা দিক থেকে পূরণ করবার চেষ্টা করছে। এই যে তুমি, তুমিও ঠিক ঐভাবে বাঁচতে চাও। কিন্তু একা-একা সম্ভব নয়। তাই একজন পুরুষের সান্নিধ্য চাও, যার মাধ্যমে তোমার জঠরে উৎপাদিত, তোমার স্তনে লালিত, তোমার কোলে পালিত কতকগুলি ছেলে-মেয়ে তোমার আশে-পাশে থাকবে। তারা হবে তোমার আশ্রিত। তুমি হবে তাদের 'মা'। তুমি আশা কর তারা তোমার কথা শুনবে, তোমার বাধ্য হবে। তোমার ক্ষমতানুযায়ী তাদেরকে সাজাবে, গোছাবে, নাচাবে, হাসাবে, কাঁদাবে। অর্থাৎ তারা হবে তোমার খেলার পুতুল। আমি কেবল যাতে সেগুলো ঠিকমত থাকে তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করব। আসলে সবই তোমার ইচ্ছা। এবং তোমার ইচ্ছাগুলোই তুমি পূর্ণ করতে চাও অন্যদের মাধ্যমে। এতে কি প্রমান হয় না যে তুমি স্বার্থপর?

নারী: এর দ্বারা যদি প্রমাণ হয় আমি স্বার্থপর তাহলে অবশ্যই আমি স্বার্থপর। তবুও তুমি তো একজনকে পাবে যে তার নিজের ইচ্ছাকে তার চেতনাকে পূরণ করবার চেষ্টা করছে। তুমি না হয় তাকে একটু সাহায্য করবে। সেটুকুও কি পারবে না? আমার ঐ স্বার্থপরতার জন্য, তোমার দেহের ওজন আমার ওপর চাপাতে হবে। তুমি আমাকে যন্ত্রণা দেবে, নাড়বে, দেখবে, টিপবে, কামড়াবে। আমি সব সহ্য করব। কেননা আমি চাইব একটা সন্তান আমার জঠরে আসুক। তারপর কতদিন ধরে আমাকে সেই ভার সহ্য করতে হবে। কত যন্ত্রণায় আমাকে উৎপীড়িত হতে হবে, কত

রাত্রে সেই শিশুকে পরিচর্যা করার জন্য ঘুম হবে না; আবার সকালে উঠে তোমার চা, অফিস সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে তুমি চটে যাবে। হয়ত ভয় দেখাবে যে তুমি অন্য কারুর সঙ্গে থাকতে চাও আমিই যেন প্রতিবন্ধক। তুমিই চাইবে তোমার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতাদের তুষ্ট করে রাখতে চা-জলখাবার সব কিছু সময়ে-অসময়ে পরিবেশন করে। শিশু বড় হলে তার চাল-চলনে প্রহরায় থাকতে হবে যাতে তার অঙ্গহানি না হয়। তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, বিবাহ দিতে হবে এবং দেখতে হবে যে সে যেন জীবনকে পুরোপুরি পেয়েছে, তাকে উপলব্ধি করেছে এবং সে একজন প্রশান্ত সুখী পুরুষ হতে পেরেছে। এবং এই সব কিছুরই জন্য তোমাকেই আমার দরকার। তোমার ঐ ভয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, আত্মগ্লানি প্রভৃতিগুলো যে কতখানি অসার সেইটাই প্রমাণ করার জন্য। আমার জঠরজাত পুত্র হবে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র। তাকে নিজের মত তৈরী করে তোমাকে দেখিয়ে দেব যে তোমার ধারণাগুলো কত নির্মমভাবে ভুল। আমি জানি আমি কৃতকার্য্য হব। কেননা আমি তোমাকে, আমাকে সমগ্র মানবজাতিকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি, আমি, সমগ্র মানবজাতি যা ভেবেছে, করেছে তার কোন কিছুই নিরর্থক বা ভুল নয়। হয়ত সব ক্ষেত্রে, সর্বসময়ে, সর্বজনের জন্য তার স্থিরতা সিদ্ধ হয় নি। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তো হয়েছে। যেখানে হয়নি সেখানে অজ্ঞতা কাজ করেছে। আমি আগেও একথা বলেছি। তুমি অনেক কিছু জেনেছ কিন্তু আরও অনেক কিছু জানতে পারনি এখনও। সারা জীবন ধরে জানতে হবে। হয়ত মৃত্যুর সময়ও সেই জানার কাজ শেষ হবে না। কিন্তু অনেক কিছু যা তুমি জেনে যাবে সবাইকে সেগুলো জানিয়ে যাবে। পরবর্তীরা সেই জ্ঞানটুকু সম্বল করে আবার এগিয়ে চলবে সম্মুখের দিকে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় শুধুমাত্র এক বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। সেই জন্য বংশধর দরকার। তা নাহলে এই অসমাপ্ত কাজ করবে কে? সেই জন্য আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ এযাবৎ যা করে এসেছে ভুলচুক করলেও, তার মধ্যে থেকে একটা জিনিস জানা গিয়েছে সেটা হচ্ছে, জ্ঞানের সীমানায় পৌছান দরকার। একজন মানুষ কেন— হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের জীবন এই পরীক্ষায় ব্যস্ত। সবাইয়ের উদ্দেশ্য এক জীবনের সীমানায় পৌছান এবং সেটাই গণ-ইচ্ছা। সেইজন্যই তারা সবাই সবাইকে আশেপাশে রাখতে চায়। দরকার-অদরকারে, সুখে-দুঃখে সবাইকে স্মরণ করে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়—

যে উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে একত্রিত হয়, তার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—সেই ঘটনা বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এক সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। সবাইয়ের মতামত নেওয়া হয় এবং তার থেকে একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য পথ খুঁজে বের করা হয় এবং সেইটাই হয়ে থাকে জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছানোর পথ। এইটাই বিশুদ্ধ জ্ঞান যে জ্ঞানকে আর পালটাবার দরকার হয় না, যে জ্ঞান চিরস্থায়ী হয় এবং যার উপর সবাই বিশ্বাসকে স্থাপন করে থাকে। যারা এই কার্যে অংশগ্রহণ করে তারা এই কৃতকার্যে সফলতার জন্য সবাই সবাইকে ভালবাসে। এতে কোনও অপরাধ, ভয়, ঘৃণা, হতাশা, আত্মগ্লানির স্থান নেই। আমিও সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি সবাইকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি। আর তুমি হচ্ছ সেই সবাইয়ের মধ্যে একজন। আমার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা কম। সবাইয়ের ভালবাসাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই একজনকে দরকার এবং সেইটুকুই আমার ক্ষমতার মধ্যে। আর কাউকে চিনবার বা জানবার সময় নেই। মোটামুটি ভাবে নিজের বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্র হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করেছি। হয়ত তোমার চেয়ে দেখতে-শুনতে আরও ভাল ছেলে আছে। কিন্তু অত সময় কোথায় তাদের মধ্যে বাছাবাছি করার? শেষে 'ঠগ বাছতে গাঁ উজার' হয়ে যাবে। তার চেয়ে মোটামুটি একজনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসাকে স্থাপন করাটা কি অপরাধ? মৃত্যু অবধারিত। কবে কখন বা কোথায় হবে তাও বলা যায় না। সুতরাং সময় কম। আশার সীমা নেই। ভরসার পাত্র নেই। নিরাশ হতেও বেশীক্ষণ লাগবে না। সুতরাং 'হাতের পাঁচ' ফেলে লাভ কি? যতটুকু পেয়েছি নিজের মনমত তাকে নিয়েই শান্ত থাকা ভাল। বেশী আশা ভাল নয়। তাতে সন্দেহ পেয়ে বসবে। অশান্তি, ঝঞ্ঝাট, যন্ত্রণায় কাতর হতে হবে। কি দরকার অত কিছুতে। সব কিছুই যখন সীমাবদ্ধ তখন সীমাবদ্ধ আশা, আকাঙ্খার মধ্যেই থাকার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয় কি? আমার কাছে আশা বা উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমারই সৃষ্টির মাধ্যমে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তোমাকে আমি ভালবাসি এবং তুমি আমার বা নিজের সম্বন্ধে যা কিছু ভাব না কেন সবই ভিত্তিহীন। তুমি আমার এই challange গ্রহণ করো।

পুরুষ : না, আমি কারুর challange গ্রহণ করতেও রাজী নই, কাউকে challange করতেও রাজী নই। কেননা এর দ্বারা হয় আমি ছোট বা বড় একটা কিছু

প্রমাণিত হয়ে যাব জনসমক্ষে। কিংবা হয়ত কোথাও একটা ভুল হয়ে যাবে কারুর এবং সেইটাই হয়ত আমার জয়-পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠবে। কেউ হয়ত আমাকে করুণা করবে কিংবা আমাকে হয়ত কাউকে করুণা করতে হবে এই জয়-পরাজয়ের জন্য। এই জয়-পরাজয়ের মূল্যটা কি? কিছুই নেই কেবলমাত্র কতকগুলি জাগতিক সুখ-সুবিধার জন্য ছাড়া। সেটাও আবার জয়ের মাধ্যমে ঘটবে। পরাজয়ের গ্লানি কেউ হজম করতে পারে না। যে বলে পারে, সে মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, ঠগ। এবং পরাজয়ের গ্লানিটা আমাকে আবার জয়ের আশায় মাতাবে। আমাকে আবার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে চেষ্টার পর চেষ্টা চালাতে হবে। যাকে তুমি বলেছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু কি লাভ তাতে কেবলমাত্র একটু ব্যস্ত হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া। এবং এও এক ধরণের ভণ্ডামী। আমি লক্ষ্য করেছি আমার পাশের বাড়ীতে একটি যুবক থাকে। দেখে মনে হয় বেকার। সে একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে চেয়ে। সময়কে বধ করাটাই হচ্ছে তার কাজ। সকাল থেকে দুপুর। তারপর সন্ধ্যা বা রাত পর-পর আসে। সে এই সময়টাকে যে কোনও ভাবে কাটাতে চায়—শুয়ে, বসে, একটু বেড়িয়ে। আমার বেশ ভালবাসে। কিন্তু পাড়ার লোকেরা অবাক হয়। একটা লেখাপড়া জানা স্বাস্থ্যবান যুবক কেন এইভাবে অলসের মতো দিন কাটায়? সে কেন একটা কাজ করে না? কেন সে ব্যস্ত থাকে না? আমি তার হয়ে উত্তর দিই : ভালই আছে, আমাদের মত ভণ্ডামিতে আশ্রয় নেয়নি এইটাই ভাল। লোকভয়ে, আত্মগ্লানিতে বা নিঃসঙ্গতায় হয়ত কাতর নয়। সে তার নিজের মতন। সে হয়ত ঐ ভয়ের হাত থেকে পালাবার জন্য একটা কিছু আশ্রয়ের চেষ্টা করে না। তার বদলে নীলাকাশ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল, বা ছোট্ট নীলপাখীগুলোকে কেন্দ্র করে সে তার বাঁচার ব্যবস্থা করেছে। দৈহিক বাঁচাটা হয়ত তার কাছে একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমি তাকে হিংসা করি। ও বেশ ওর নিজত্বটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

নারী : জানিনা কে সেই যুবক যে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং যার জন্য তুমি এতগুলো যুক্তি খাড়া করে তার হয়ে বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। এটা তোমার একটা কল্পনা বিলাসমাত্র। একটা বস্তুকে ঘিরে নিজের স্বপ্নের সৌধ সৃষ্টি করে তুলেছো, অথচ ব্যাপারটা একেবারেই ওরকম নাও হতে পারে, যদি তুমি ঐ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করতে তাহলে হয়ত তোমার কল্পনায় ঠিক উল্টোটাই জবাব পেতে, সে হয়ত চায় না ঐভাবে সময় কাটাতে, কিন্তু অবস্থার দুর্বিপাকে

পড়ে হয়ত তাকে এভাবে সময় কাটাতে হয়। সেও হয়ত চায় একটা কিছু করতে, কিন্তু হয়ত এখনও সে সুযোগ করে উঠতে পারে নি। খোঁজ নিলে টের পাবে যে সবাইয়ের মত সেও একটা কিছু করার চেষ্টা করছে কিন্তু হয়ত কৃতকার্য্য হয়নি। এর জন্য সে নিজে কতখানি দায়ী বলা যায় না, তবে হয়ত সমাজ কিছুটা দায়ী, রাষ্ট্রাবস্থাও কিছুটা দায়ী। তুমি যাকে ভণ্ডামি বলছ সেটা ভণ্ডামি মোটেই নয়, ঐটাই হচ্ছে জীবনের বড় দিকটা। একটা ধারাকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করার জন্যই সব কিছু। হয়ত এও জানতে পারবে যে সে জীবন সম্পর্কে একটা জটিল চিন্তায় মগ্ন নয়। সে ঠিক হয়ত তোমার মত দুশ্চিন্তায় আহত নয়, সে হয়ত একটা বিরাট কিছু করার বিলাস-স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে এবং তাকে পূর্ণ না করতে পারার বেদনায় কাতর নয়। 'হায় কিছুই হোল না, করতে পারলাম না কিছুই', বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে না। কোনও রকমে বেঁচে থাকার একটা উপকরণ পেলেই হয়ত বেঁচে যাবে। এবং এর মধ্যে জয়-পরাজয়েরও কোনও ব্যাপার নেই। এটা একটা সহজ বোধের ধারা। এইভাবে গ্রহণ করলেই হোল। এতে হার-জিতের কি আছে? যেটা প্রয়োজন সেটাকে যোগাড় করতে হবে। তবে, হয়ত অনেক কিছু জিনিষকেই অপ্রয়োজনীয় ভাবা যেতে পারে গোড়াতে অন্যান্য জিনিসের চেয়ে। যেমন ঘর, জামা-কাপড়, খাবার ইত্যাদি। বাহুল্য বর্জন করা গেলেও একটা সর্ব নিম্ন দরকার সবাইয়ের মধ্যে আছে। এই সর্ব নিম্নটা হোলেই হোল। এতে জয়-পরাজয়ের কোন ব্যাপার নেই।

পুরুষ: সর্ব নিম্ন বলতে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছ বুঝলাম। কিন্তু এই সর্ব্ব নিম্ন বলতে তুমি যা বোঝাতে চেয়েছ সেটা কতখানি 'নিম্ন', অর্থাৎ কোথায় এর শুরু আর কোথায় এর শেষ এটা তুমি বলনি। তুমি বলেছ জামা-কাপড়, খাবার ইত্যাদি। মোট কতগুলো জামা-কাপড়, কি ধরণের কাপড়ে সেগুলো তৈরী হওয়া উচিৎ, কি ভাবে সেগুলো কোথা থেকে তৈরী হওয়া দরকার তা ভেবে দেখার দরকার আছে। নানা রকমের ঋতুতে নানা রকমের এই ধরণের জামা দরকার। রোগা লোকের পক্ষে এক রকম, মধ্য মাপের লোকের এক রকম, মোটা মাপের লোকের পক্ষে এক রকম জামা-কাপড় দরকার। তারপর রুচির প্রশ্নতো আছেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এরও কোনও শেষ নেই। যেমন ধর, একসময়ে দুটো জামা, দুটো প্যাণ্ট, দুটো পাজামা, দুটো পাঞ্জাবী, দুজোড়া জুতো (একটা কাজের সময়, একটা অবসর সময়ে) মোটামুটি সাধারণ দামের হলে, ইংলিশ

কাট হলে হয়ত চলে যেত। কিন্তু এখন পরিবেশ থেকে দেখে শিখলাম যে দাম কম হলেও সপ্তাহে দু'সেট জামা-প্যান্ট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি দরকার। সুতরাং সব কিছুই বাড়ছে, কোনদিন হয়ত সুতোর জামা-কাপড় ছেড়ে synthetic fibre এর জামা-কাপড় পরতে হবে। অবস্থা আমাকে বাধ্য করবে। তারপর ধর খাদ্য। ডাল-ভাত খেলেই দিন চলে যায়। কিন্তু ডিম, মাছ মাংসও খেতে হয়। ফলের সময় আপেল, কলা খেতে হয়। মধ্যে-মধ্যে ক্ষীর—তৈরী করেই হোক বা কিনেই হোক খেতে ভালো লাগে। কখনও বিস্কুট খেতে হয় বা বাদাম দিয়ে মুড়ি খেতে ভালো লাগে। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারেও কোনও নির্দিষ্ট সীমানা গড়ে তোলা যায় না। আবার আমার মনে হয় খাওয়ার ব্যাপারে রোজ-রোজ নতুন হলে আরও ভাল হয়: তবে হয়ত ভাত বা রুটিটা নির্দ্ধারিত থাকে। কিন্তু ধর যদি সপ্তাহে একদিন পোলাও, একদিন রুটি, একদিন ভাত, একদিন তনদুরি রুটি-মাংস, একদিন ঘি-ভাত ইত্যাদি খাওয়া যায় তাহলে কার না ভাল লাগে? আসলে সমগ্র ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, যার সন্তুষ্টিকরণের কাজের শেষ নেই। তারপর এগুলোর ক্রয় ক্ষমতা, জোগাড় করার ক্ষমতা, ভাল করে রান্না করার ক্ষমতা প্রভৃতির ওপরও নির্ভর করে। তার ওপর ঘরে লোকজন বৃদ্ধির ব্যাপার আছে। দু'জনের ইচ্ছাকে একত্র করা গেলেও, তৃতীয়জন বা তার পরে যারা আছে তাদের ইচ্ছার জোর কোনও রকমেই থাকতে পারে না কেননা তাহলে গোলমাল লাগবে। একজনের ইচ্ছায়, আর একজনের ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি ভদ্রতার খাতিরে 'আপনার খাওয়ার ব্যাপারে কোনও কিছু বলার আছে? অর্থাৎ ঝাল, নুন, এটা-ওটা আমিষ-নিরামিষ ইত্যাদির ব্যাপারে তার কোনও বক্তব্য আছে কিনা? থাকলে গৃহস্থ তার ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য তৈরী করার চেষ্টা করবেন। যদিও ব্যাপারটা হয়ত কিছুদিনের জন্য তবুও কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যেমন দেখা যায় পরিবারের তরকারী রান্নায় হয়ত ঝাল-লঙ্কা-নুন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে কম-কম করতে হয় যদি সেই পরিবারে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে। এসব কম ঝামেলা নয়। দেখ, সেখানে হয়ত ওদের খাতিরে অন্যদের ইচ্ছাকে সমর্থন করতে হয়। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল ব্যাপারটা যার-যার নিজের ইচ্ছানুযায়ী। অর্থাৎ সেই আত্মসমর্পনের ব্যাপারটা এসে যায়।

নারী : এভাবে ভাবলে তো কোনও দিনই কোনও স্ত্রী-পুরুষ কোনও পরিবার গড়ে

তুলতে পারত না। যদিও বা পারত তাহলে তাদের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের কোনও তফাৎ থাকত না। একটা seasonal meet এর পর যার-যার তার-তার হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ, আমাদের মান ও হুঁস দুইই আছে,—যে দুটোকে বাদ দিয়ে মানুষকে কল্পনা করা যায় না,—যদি বা করা যায় তাহলে অন্যান্য জীবেদের সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকে না, সেহেতু আমাদের জীবনযাত্রায় পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, বোঝাপড়া, একাত্মবোধ প্রভৃতির প্রভাব আছে। সবাইকে থাকতে হবে, বাঁচতে হবে, অথচ কেউ কাউকে বিশেষ গুরুতর ভাবে আহত করবে না—তবেই তো মানব-সমাজ গড়ে উঠতে পারে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, পুত্র-কন্যা অতিথি-সমাজ সব কিছুকে বজায় রাখার চেষ্টা দেখা যাবে। সেখানে আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু তাই বলে না খেয়ে থাকারও দরকার নেই,—যদি কেউ মনে করে যে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা বাঁচান দরকার, বলা যায় না কখন দুর্যোগ আসবে। কথায় বলে যেটা রয়ে-সয়ে গেল সেইটাই শেষকালে সয়। সুতরাং তোমার ঐ wild thinking এর কোনও দাম নেই। যারা সংসার করে তারা সবাইই আত্মসমর্পিত অবস্থায় দিনযাপন করে। এ বিষয়ে পূর্বেই আমি বলেছি। তুমি যা বলেছ সেটা আসলে নির্ভর করে কার কি দরকার, কার কি ইচ্ছা, কার মানসিক অবস্থাটা কি ইত্যাদির উপর। শ্রান্ত হয়ে বাড়ী আসলে অবশ্যই দরকার হয় এক কাপ চা বা জল। তাতে একটু চাঙ্গাতো হয়ে ওঠা যায় তাছাড়া নতুন কাজে প্রেরণা আসে। ইংরাজীতে বলে phenomenal factor of perception—the needs, moods, wishes or desires of the individual. কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন, ইচ্ছা প্রভৃতিকে জানতেই পারবে এবং তাকে ঠিক-ঠিক মত ঠিক-ঠিক দিকে চালাতে পারবে তাহলেতো অনেক সমস্যাই মিটে যায়। কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইচ্ছা, প্রয়োজন, উদ্দেশ্যের সংঘাত। এবং এই সংঘাতই সব কিছুকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। একটা মানুষ থেকে এক একটা দল, তাদের ইচ্ছা অন্যদের ক্ষমতার প্রতি সমর্থিত হতে শুরু করে। এই সংঘাতকে এড়ানো দরকার এবং তাহলেই সমাজের মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা দেখা দিতে দেরী হবেনা। এর জন্যই দরকার শিক্ষা এবং প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কে এক সম্যক ধারণার উৎপত্তি করা। এবং তখনই হয়ত একটা আত্মিক মিল ঘটতে পারে। তবে জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই সীমার মধ্যে সব কিছুকেই যেহেতু গড়ে তুলতে হয় সেইজন্যই দরকার হয় পরবর্তীদের—অর্থাৎ the next to follow.

পুরুষ : শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। সেটা হচ্ছে শিক্ষা মানুষকে চতুর করে, জ্ঞানী করেনা। তবে যদি ধরা যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরা চতুর হয় কিন্তু সব চতুর ব্যক্তিরা জ্ঞানী হয়না তাহলে অবশ্যই শিক্ষার দরকার আছে। তবে এইখানে বলে রাখা ভাল যে শিক্ষা বলতে আমি formal বা বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই ধরেছি। এই formal শিক্ষা না পেলেও যে মানুষ শিক্ষিত বা জ্ঞানী বা চতুর হয় সে বিষয়েও দ্বিধা নেই—অর্থাৎ তাদের way of up-bringing বা পরিবেশ তাদেরকে ঐভাবে তৈরী করে দেয়। অবশ্য পূর্বের ক্ষেত্রেও পরিবেশকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে জ্ঞান বা জ্ঞানের সীমানা জাতীয় জিনিষগুলো—যে বিষয়ে তুমি আগেও বলেছ সে বিষয়েও আমার একটা ধারণা আছে—যেটা আমার ধারণানুযায়ী একটা ভয়ঙ্কর ধারণা। জানিনা তুমি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুরূপ একটা প্রবন্ধ পড়েছ কিনা? তাহলে হয়ত বুঝতে পারতে তৎকালীন অবস্থায় কি-কি বিষয়ে কতখানি জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে জ্ঞানই বা কি, আর সীমানা বলতে কি বোঝায় এ বিষয়ে আলোচনা সেখানে ছিলনা। সেইজন্য প্রথমে জানা দরকার জ্ঞান কি? অতীতের বইগুলোতে কি লেখা আছে এ বিষয়ে তার ফিরিস্তি দিতে হলে অনেক জায়গা লেগে যাবে। সেইজন্য আমি আমার নিজস্ব মতামত জানিয়ে রাখছি। যদি কারুর মতামতের সঙ্গে খুবই—বা মোটামুটি মিলও দেখা যায় তাহলে বুঝবে যে সেটা অজান্তেই ঘটে গেছে। যাই হোক আসল কথায় আসা যাক। জ্ঞান বলতে আমি বুঝি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা গণ অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞান বলতে চেয়েছি। আমরা প্রতিদিন নানা জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি অর্থাৎ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। এই সমস্যার সমাধানের স্বরূপ কি সেইটাকেই যখন আলোচনা করা হয় তখনই আমরা জ্ঞানকে নিয়ে আলোচনা করি। জীবনের এবং বেঁচে থাকার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা। এই সমস্যাগুলি বহু প্রকারের হতে পারে। তবে তাদের সমাধানের জন্য যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা দরকার তাদের মধ্যে প্রকার ভেদও হতে পারে স্বভাবতঃই। সমস্যা ও জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। জামা-কাপড় পরতে যে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দরকার হয়, কবিতা বা গল্প পড়তে সেই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দরকার হয় না। সাধারণতঃ যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে বুদ্ধি এবং 'সাধারণ জ্ঞান'। অবশ্য বুদ্ধির প্রকার-ভেদে জ্ঞানের প্রকার-ভেদও দেখা দিতে পারে। ইংরাজীতে যাকে pure knowledge বলা হয় তার স্বরূপ কি বোঝা বড় মুশকিল। তবে নানা রকমের

অভিজ্ঞতা অর্জন করতে-করতে, জ্ঞানের সীমানাও বেড়ে যায়। হয়ত গোড়ার দিকে জ্ঞানের মাপ x, কিন্তু পরে সেটা বাড়তে-বাড়তে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার শেষ কি কেউ বলতে পারে ? কখনও circular-liner বা কখনও horizontal-vertical গতিতে জ্ঞান-জগৎ নড়ে-চড়ে। দশবছর আগে আমি যা জানতাম, তুমি যা জানতে, সমগ্র বিশ্বজগতের লোকজন যা জানতো, আজ তা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কতখানি বৃদ্ধি' হয়েছে যদি বছর বছর বলা যেত তাহলে হয়ত, এটাও বলা যেত যে আগামী ১০০০ বছর পর মানুষের জ্ঞানের সীমানা এতদুর বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে মেপে দেখবার চেষ্টা এখনও কেউ করে নি। একটা চেষ্টা করলে মন্দ হয়না। কিন্তু তাতেও কি জানা যাবে ? হয়ত পরিসংখ্যানের দৌলতে একটা nearly accurate figure এতে পৌঁছনো যেতে পারে তাদের ধারণানুযায়ী, কিন্তু সেও কতখানি তা জানা যায়নি সঠিক ভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞানের বৃদ্ধিটা কালের (time) ওপর এবং মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। এখানে দুটো জিনিষ ধরা যাক : কাল অসীম এবং মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অসীম (অবশ্যই হতে হবে)। তাহলে দুটো সমান্তরাল রেখার মত যদি চিরকাল পাশাপাশি চলে তাহলে কোথাও কি শেষ হবার chance দেখা দেবে ? আমার সামান্য জ্ঞানে মনে হচ্ছে যে এর কোথাও শেষ নেই। মানুষের জ্ঞানেরও সীমানা নেই এবং সীমানা নির্দ্ধারণ আপাততঃ করা যেতে পারে কিন্তু তারপর আবার তাকে বাড়াতে হবে। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অসীম এবং সময়ও অসীম এবং তাই যদি হয় তাহলে জ্ঞানের সীমানাও অসীম। এমন একটা সিদ্ধান্তে এসেছি এখন যেটা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি, জ্ঞানের সীমানা অসীম হয় তাহলে আমরা যে অহরহ জ্ঞান-চর্চ্চা করে চলেছি এরও তো কোনও শেষ নেই। এবং যার শেষ নেই তার কোনও মূল্য থাকে কি ? একের পর এক যোগ করে যাওয়ার শেষ নেই। তাহলে আমাদের জ্ঞান-চর্চ্চা চিরকালই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এবং কোনওদিন যে শেষ করা যাবে তারও সম্ভাবনা নেই। তাহলে মানব-সমাজ একের পর এক এই কাজ চালাবে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য ! জ্ঞানের সত্যই কোনও সীমানা আছে কিনা জানার জন্য ? আচ্ছা ধরা গেল যে, জ্ঞানের সীমানা আছে। তাহলে একদিন না একদিন মানুষ তার অসীম চিন্তা ক্ষমতার দ্বারা অসীম জ্ঞানকে করায়ত্ত করে ফেলবে এবং এর দ্বারা আর একটা খবর জানা যাবে যে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও তাহলে সীমাবদ্ধ। এবং এও জানা যাবে যে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা নির্ভর করে আছে জ্ঞানের

সীমানার মধ্যে। জ্ঞানের সীমানা যদি সসীম হয় তাহলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও সসীম, জ্ঞানের সীমানা যদি অসীম হয় তাহলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অসীম। জ্ঞানের সীমানা অসীম এবং মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা সসীম হলে বা জ্ঞানের সীমানা সসীম মানুষের এবং চিন্তা করার ক্ষমতা অসীম হলে কে কাকে সামলাবে ? প্রথমটা গ্রাহ্য হলেও দ্বিতীয়টা একেবারেই গ্রাহ্য করা যায় না। কেননা মানুষতো চিন্তা করে জ্ঞানকে অর্জন করার জন্যই। সব যদি অর্জন হয়ে যায় তাহলে চিন্তা করার ক্ষমতা তখন কি করবে ? খিদে পেলে কিছু খেতে হয়, তা না হলে ক্ষুধা তার উৎপত্তি-স্থলকেই আক্রমণ করবে এবং কিছু না পেলে তাকেই খেতে শুরু করবে। এবং আমাদের জ্ঞান-চর্চাটাই হচ্ছে ঐ রকম। চিন্তা করার ফলে জ্ঞানের সবই যদি জানা হয়ে যায় তাহলে মানুষের করার কি থাকবে ? যদি উভয়েই অসীম হয় তাহলে এই অসীমের পেছনে ছোটাছুটি করাটা নিতান্তই ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়ায় নাকি ? সুতরাং এই আলোচনার ফলে দুটো জিনিস দাঁড়াচ্ছে : ১) মানুষের চিন্তা করার কি practical value থাকে ? কেননা যে কাজের কোনও শেষ নেই সে কাজ করে কি লাভ বা যতটুকুই করা যাক না কেন সেটা সব সময়েই অসম্পূর্ণ এবং তার ওপরে আর কোনও চিন্তা বা আলোচনা করাটাও অসম্পূর্ণ হয়েই থাকবে। সুতরাং সম্পুর্ণ ব্যাপারটা একটা সময় কাটানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ২) মানুষের চিন্তা ক্ষমতা যদি সসীম এবং জ্ঞানের সীমানাও সসীম হয় তাহলে একদিন না একদিন সেই সীমানায় পৌঁছে যাবে সবাই এবং তখন করার আর কিছু কি থাকবে ? তখন আবার ফিরে আসতে হবে এবং আগে যাওয়া এবং পেছনে আসা ছাড়া আর করার কি থাকবে ? সব কিছু জানা হয়ে যাবে, সব কিছু করা হয়ে যাবে এবং নতুন বলে আর কিছু থাকবে না। এবং এর ফলে সকল গবেষক-চিন্তাবিদ বেকার হয়ে যাবে। সুতরাং এই দুটোকে যদি মনে রাখা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জীবনে একঘেঁয়েমী, নিঃসঙ্গতা, বিরক্তি ; 'ভাল লাগছে না ভাব' প্রভৃতি নেমে আসবে। যার ফলে কলহ, বিবাদ শুরু হতে পারে অথবা সবাই সাধু হয়ে 'কিছুই তো আর করার নেই' এই ভেবে গা এলিয়ে কোথাও পড়ে থাকতে পারে যতদিন না তার দৈহিক বিনাশ হচ্ছে। এরপর ধরা যাক সসীম ও অসীমের কল্পনাকে। সসীম বস্তুকে বোঝা যায় কোনও না কোনও উপায়ে। কিন্তু যা অসীম তাকে কি করে বোঝান সম্ভব ? অসীমকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে এই বলে যে 'যার শেষ নেই, সীমানা নেই, উৎপন্ন হয়েছিল কবে, কখন, জানা যায় না, আজ আছে, ভবিষ্যতে থাকবে'। কিন্তু

ভবিষ্যতে যে সমস্ত মানুষেরা বেঁচে থাকবে তারাই 'ভবিষ্যতে থাকবে' কে verify করতে পারবে। এছাড়া আজ যারা আছে তারা কি করে ভবিষ্যৎকে predict করবে? একমাত্র জ্যোতিষি ছাড়া! আবার বলা যেতে পারে যে অসীমকে কোনপ্রকার definition দিতে গেলেই এবং দিলেই সেটা সসীম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অসীম আর সসীমের মধ্যে তফাৎ থাকে না। কিন্তু অসীমের ও সসীমের মধ্যে যে একটা তফাৎ আছে সেটাও অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য আমার মনে হয় যে সসীমকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ (verbalization) করা যায় কিন্তু অসীমকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অসীমকে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার মধ্যে অর্থাৎ চিন্তা, বাক্য, লেখা ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশ করার চেষ্টা করলেই সেটি সসীম হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে জানা হয়ে গেল এবং কথার বাঁধুনীতে তাকে বেঁধে ফেলা গেল, চিন্তার বেড়াজালে তাকে ঘিরে ফেলা গেল, লেখার মাধ্যমে ধরে রাখা গেল। সুতরাং অসীম কি অসীম থাকল? সেই জন্য অসীম তাকেই বলা যেতে পারে যার সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের বুদ্ধির বাইরে। অন্য কোনও জীব করতে পারে কি না জানি না। কিছু বিজ্ঞানী তর্কবাগীশরা বলে থাকেন যে মানুষের চিন্তা ক্ষমতার বাহিরে কিছুই নেই। আজ অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে না কিন্তু ভবিষ্যতে সব কিছুই বা অনেক কিছুই জানা হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কি সত্যিই সম্ভব হবে? আমার মনে হয় তা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ প্রকৃতির একটা অংশমাত্র। তার মধ্যেকার অন্যান্য আরও অনেকাংশের মত মানুষ একটা অংশ। এই রকম কত অংশ আছে জানা যায়নি, আবার প্রত্যেকের জন্য একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী, নিয়ম, নিয়মের মধ্যে নিয়ম ইত্যাদি আছে। তাদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা, আত্মনির্ভর-শীলতা ইত্যাদি সব সময়েই কাজ করে চলেছে বিরামহীন, অন্তহীন, ক্লান্তিহীন-ভাবে। মানুষের পক্ষে এর সব কিছু কি জানা সম্ভব? ধরা যেতে পারে মানুষের মনের কার্যকলাপ সম্পর্কে মতবিরোধ। কি নিয়মে যে মানুষের মন কাজ করে সে বিষয়ে definite কিছু বলা যায় না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞাসা করে সব কিছু জানা যাচ্ছে। আর জিজ্ঞাসা করেই বা কি লাভ? হয়ত সে সত্যি কথা বলবে, কিন্তু সে যদি মিথ্যা কথা বলে তা হলে তো সমগ্র জ্ঞান-চর্চাটাই মিথ্যার ওপরে গড়ে উঠবে। তাহলে সন্দেহ করতে হয় অথবা বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু তারই বা দরকার কি আছে? এ ঝামেলায় যাওয়ার প্রয়োজন কি?

স্বামী : প্রয়োজন আছে। কেননা মানুষ চায় তার মধ্যেকার সকল অনিশ্চয়তা, নির্ভরশীলতা, ভয়, সংকোচ, দ্বিধা প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পেতে। সেই জন্য ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখেই তাকে কাজ করতে হয়। ভবিষ্যৎ যদি না থাকত তাহলে বর্তমানের উৎপত্তি কোথা থেকে হোত? ভবিষ্যতই বর্তমান ও অতীত হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। সুতরাং ভবিষ্যতই হচ্ছে মানুষের সব কিছু। সেই জন্য জ্ঞানচর্চার, চিন্তা করার দরকার আছে। ভবিষ্যৎও অসীম, মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অসীম। সেইজন্যই ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিষের কথা চিন্তা করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু না থাকত তাহলে জ্ঞানের সীমানা, মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। যেহেতু ভবিষ্যৎ অসীম সেহেতু জ্ঞানের সীমানা ও মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অসীম! এখানে অসীম অর্থ আর কিছুই নয়, যার সীমানা কোথায় তা বলা যায় না, ভাবা যায় না, প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু অতদূর চিন্তা করার দরকারই বা কি আছে এখন? মানুষকে একটু-একটু করে, একটা-একটা করে সমস্যার সমাধান করার কথা বলা হয়েছে। সব কিছু যদি আজই, এই মুহূর্তে করা শেষ হয়ে যাবে তাহলে তো ভালই হোত—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে গল্প করা যেত সব কিছু নিয়ে। দুশ্চিন্তামুক্ত, উদ্বেগবিহীন জীবন পাওয়া সোজা কথা! যে পায় সে কত ভাগ্যবান। পূর্বেই বলেছি জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছান দরকার। এবং তার থেকেই নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে সব কিছুরই শেষ আছে। যেমন শেষ আছে দৈহিক বেঁচে থাকার। অর্থাৎ কাল সবাইকে যেমন অস্তিত্ব দেয় তেমনভাবে তার ধ্বংসেরও কারণ হয়। সুতরাং মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা অথবা জ্ঞানের সীমানা প্রভৃতি সীমাবদ্ধ, কিন্তু কোথায় তার সীমানা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তাই বলে ভবিষ্যতে যে জানা যাবে না তার কোনও ঠিক নেই, হয়ত জানা নাও যেতে পারে আবার জানা যেতেও পারে। অর্থাৎ সব কিছু নির্ভর করে আছে স্থান, কাল ও পাত্রের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর। তার উপর আছে Conventionisms অর্থাৎ প্রচলিত বাদ। মানুষ সামাজিক জীব এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার মাধ্যমেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। অবশ্য মৃত্যু অনেকটা sure ঘটনা যদিও মৃত্যু কিছু পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপরও নির্ভরশীল। তবুও বলা যায় যে এর মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। সেই জন্য বলা যায় যে কোনও ঘটনা বা কোনও উদ্দেশ্য ঘটিবে কি পূর্ণ হবে তা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। অবশ্য এক দল মনে করে থাকে যে কোনও ঘটনা বা কোনও উদ্দেশ্যকে ঘটাবার বা পূর্ণ করার ইচ্ছা

থাকলে বা তাকে সেইমত চালনা করলে সেটা ঘটবে বা পূর্ণ হবে। অনেকটা planning or programming এর মত শোনায় আর কি। কিন্তু এর মধ্যে, হতেও পারে কিম্বা না হতেও পারে এই দুই সম্ভাবনা রয়ে যায়। সেইজন্য অনেক সময় ঘটে, অনেক সময় ঘটেনা। তাই বলে চেষ্টা করবে না তা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু মানুষের চেষ্টার শেষ নেই তার পরিবেশকে, নিজেকে জানার জন্য। দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক ঘটনা কোনও না কোনও সময়ে সব ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা সব ধ্বংস হয়ে গেছে অন্তর্বিরোধের জন্য, যুদ্ধের জন্য ইত্যাদি। এটাকে কি প্রকৃতির প্রতিশোধ বলা যায় না? প্রকৃতি তার নিয়ম-কানুনগুলো এমন ভাবে করে রেখেছে যে, সেখানে আত্মসমর্পন ছাড়া গতি নেই, ভালবাসা ছাড়া উপায় নেই, এর বাইরে যা কিছু আছে তার সমষ্টি উদ্বেগ, আতঙ্ক, হতাশা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং যে সভ্যতা, দর্শন, সৃষ্টি, কলা প্রভৃতি গড়ে উঠেছে এই আতঙ্ক, ভয়, রাগ, বিক্ষোভ, ক্রোধ, হতাশা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তারা কোনও দিনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। সাময়িক একটা তুফান, ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে চমক লাগাতে পারে কিন্তু সেটা যদি চলতে চায় তাহলে তাকে স্থিতিলাভ করতে হবে এবং creative কিছু করতে হলে আত্মসমর্পন ও ভালবাসার পথে চলতে হবে। কিন্তু মানবসভ্যতার দুর্ভাগ্য যে সে পথ কেবলমাত্র কয়েকজনই জানতে পেরেছে এবং তারা সে পথের কথা জানানোর ফলে কিছু লোক তাকে গ্রাহ্য করলেও অন্যান্যরা তাকে অগ্রাহ্যই করেছে। যা কিছু এযাবৎ করা সম্ভব হয়েছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে—মানব সভ্যতার কল্যানের, মঙ্গলের জন্য তার ভিত্তি আত্মসমর্পন ও ভালবাসার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মানুষ সেটাকে ক্রমশঃ formalityর level এতে নামিয়ে এনে তাকে duty, spell or dictates of conscience, moral or ethical obligation প্রভৃতির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। সবাই সবাইয়ের প্রতি কর্তব্য-জ্ঞান, বিবেকের দাসত্ব প্রভৃতি প্রকাশ করছে। ভালবাসা গোড়াতেই ছিল কিন্তু সেটা পরে ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞানে, বিবেকের দাসত্বে নেমে এসেছে। ফলে সবাই সবাইয়ের প্রতি ঐগুলোই মেনে চলে। ভালবাসার অভাববোধ যার মধ্যে নেই, সে ভালবাসা কি বস্তু কিম্বা ভালবাসলে কি হয়, ভালবাসার দরুন কি করার ইচ্ছা হয় সে সব জানবে কি করে? কর্তব্যজ্ঞান, বিবেকের দাসত্ব এই প্রশ্নগুলিকে চাপা দিয়ে সমাজের মানুষের মধ্যে formality বোধ এনেছে। স্বামী-স্ত্রী ভালবাসায় আবদ্ধ নয় তারা আবদ্ধ formality, কর্তব্য, সমাজ বা বিবেকের দাসত্বে

খাতিরে। পুত্র-কন্যার জন্ম ancestor দের খাতিরে, পুত্র-কন্যার জন্য কিছু একটা করা দরকার সেটা কর্তব্য—কেননা কি করে এক জন এই বোধ আনতে পারবে তার মধ্যে যে 'হ্যাৎ তেরী, যে যার কপালে বাঁচবে।' সুতরাং আমরা এক প্রকারের forced বন্ধনেতে পরস্পরের দিকে আকর্ষিত হয়ে আছি, জানিনা কেন। মনে হয় ভালবাসি, কিন্তু এও এক ভ্রান্তি। ভাল যে বাসি তার প্রমান কোথায়? ভালবাসলে তার জন্য একটা কিছু করার ইচ্ছা হয়, তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা হয়, তার সঙ্গে বসে গল্প, তর্ক, কত কি করতে ইচ্ছা হয়। তার ফলে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছে যাওয়া যায়। মনের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়ার ফলে কোনও অভাব বোধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, প্রভৃতি থাকেনা। এক ধরণের feeling থাকে যার ফলে ব্যক্তি, 'sure' হয়ে যায়, সেই জন্য সবাই ভালবাসা কি তা জানতে না পারার জন্য, ভালবাসতে জানেনা বলেই পারে না। যার বদলে একটা আগ্রহ দেখায় মাত্র, এই সামান্য আগ্রহকেই যথেষ্ট মনে করে ফেলে অনেকে, কেননা যেখানে সবাই বেপরোয়া সেখানে আগ্রহই বা কোথায়? সুতরাং যে আগ্রহ দেখায়, ইচ্ছাকে প্রকাশ করে সে অনেকখানি পায়। কি পায় সে কথা আলাদা। তবে এক কথায় বলা যায় যে জীবন সম্পর্কে একটা বোধ, একটা ধারণা, একটা দর্শন এবং সর্ব প্রকারে এক আনন্দ-বোধ, যৌনকে কেন্দ্র করে যে আগ্রহ তা সাময়িক, তাকে সব সময় জাগতিক বস্তু-সামগ্রীর নিয়মিত আগমনের দ্বারা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য ভালবাসার পাত্রকে যদি সাজানো-গোছানোর দরকার হয় তাহলে এসবই দরকার। কিন্তু যেখানে আছে সত্যিকারের ভালবাসা সেখানে এই নিত্যকার বেঁচে থাকার জন্য জাগতিক প্রয়োজন খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। ভালবাসাটাই বাঁধন বলে অনেকে মনে করে এবং সেই জন্য নানা রকমের দর্শন গড়ে উঠেছে যাদের কেন্দ্রে বা বাইরে ভালবাসা নামক এই ছোঁয়াচে ব্যাধি একদম নেই। ওটাকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র আত্মসমর্পণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তার ফলে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়েছে এবং সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে সময়ে-অসময়ে। আবার ভালবাসা যেমন কঠিন, ভালবাসাকে গ্রহণ করাও কঠিন। সবাই ভালবাসাকে গ্রহণ করতে পারে না। কিম্বা গ্রহণ করলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। সাময়িক উত্তেজনায় পড়ে ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেও, অনিচ্ছা গোড়াতে থাকায় তাকে বেশীদূর বহন করতে পারে না। সুতরাং এই দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে সামর্থের প্রশ্ন এসে যায়। সুতরাং ভালবাসার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে মানুষকে choosy হতে হয়।

এ পারবে ও পারবে না এই পথে নামতে হয়। কিন্তু এও ভুল। যে ভালবাসে সে বাছ-বিচার করতে চায় না। কেননা তার কাছে সবাই সমান। সে দিতে রাজী, ভালবাসতে রাজী কিন্তু অপর পক্ষ নিতে রাজী বা সক্ষম কিনা সেটা তার ওপর নির্ভর করবে।

এই সমস্ত জটিলতার জন্য সমাজ convention এর সৃষ্টি করেছে এবং ভালবাসাকেও systematic করে তুলেছে। যখন-তখন, যা-খুশী-তাই করার হাত থেকে সবাইকে রেহাই দিয়েছে। যেহেতু সবাইকে অ-আ-ক-খ এর মত করে ভালবাসা কি বোঝান, পড়ান বা শেখান সম্ভব নয় সেহেতু ওটা convention হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীকে, কবি কবিতাকে, স্রষ্টা সৃষ্টিকে, শিল্পী শিল্পকে, মানুষ মানুষকে, সকল-জীব সকল জীবকে আপন জ্ঞান করবে। কেননা দেখা গেছে যে যেহেতু ভালবাসা মানেই হচ্ছে একে অপরের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠা এবং পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির ফলে একটা creative কিছু করা সেহেতু ওটাকে একটা প্রচলন করে ফেলাই ভাল। যারা এটাকে প্রচলন করেছে তারাও সবাই সবাইকে ভালবাসত; ভবিষ্যৎকে ভালবাসত, অসীম জ্ঞানের সীমানা বা অসীম মানুষের চিন্তা ক্ষমতাকেও ভালবাসত, কিম্বা ভালবাসার মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মকে জয় করার কথাও চিন্তা করেছিল। সেই জন্য ভালবাসাকে কেন্দ্র করেই সব কিছু গড়ে উঠেছে। ভালবাসা যদি না থাকত তাহলে কিছুই থাকত না। বিশ্বাস ভাল-বাসা থেকেই উৎপত্তি লাভ করছে, যদিও আর একটা দিক হচ্ছে সন্দেহ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সন্দেহের উৎপত্তি, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, নিরাশা, হতাশা, ক্রোধ, প্রভৃতি থেকে,—বিশ্বাসের জন্ম স্নেহ, মায়া, মমতা আস্থা প্রভৃতি থেকে। সেইজন্যই বলা হয়েছে যে সন্দেহের দ্বারা কোনও প্রকার সৃষ্টিকেই চিরস্থায়ীত্ব দেওয়া সম্ভব নয়, তার মধ্যে বিশ্বাসকে আনার দরকার আছে যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার দেখা দেয়। অবশ্য কালের স্রোতে যেহেতু সবই ভেসে যায় কোনও দিন না কোনও দিন, সেহেতু সে বেঁচে থাকে কিন্তু তার আসলরূপে হয়ত থাকে না, কিন্তু অন্য কোনও রূপে সে বেঁচে থাকে। আর বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার একটা প্রবল ইচ্ছা। এরই জন্য দরকার হয় ভালবাসার এবং তারই জন্য সব কিছু।

পুরুষ : তুমি সন্দেহ ও বিশ্বাসের কথা বলেছ। যে কোনও বিষয়ে দর্শনই দুভাবে গড়ে ওঠে। স্বভাবতঃ এই দুটি পথই হচ্ছে সন্দেহ ও বিশ্বাসের, যে বিশ্ব-জগৎ চোখের সামনে একটা অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে সে এক্ষুনি নিভে যাবে যদি সন্দেহ তাকে গ্রাস করে, অর্থাৎ দ্রষ্টা যদি সন্দেহ করে তার অস্তিত্বকে তাহলে

তার অস্তিত্ব তখনই এবং সেই মুহূর্তে উঠে যাবে চোখের সামনে থেকে। কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা তাকে আবার ঠিক পূর্বাবস্থাতেই দেখা যেতে পারে। সুতরাং দ্রষ্টা কি ভাবে জগৎকে দেখবে তার ওপরেই নির্ভর করছে জগতের বিভিন্ন প্রকারের অস্তিত্বের। আমি সন্দেহ করি তাই এরা অস্তিত্ববিহীন, তুমি বিশ্বাস কর তাই সবই আছে। অথচ তোমার কথায় বলতে গেলে আমরা দুজনেই কিন্তু এই সব কিছুকে ভালবাসি।

নারী : তাহলে একটা কথায় দুজনে একমত হওয়া গেল যে আমরা দুজনেই একটা জিনিষকে ভালবাসি, কিন্তু তুমি তাকে সন্দেহ কর আমি বিশ্বাস করি। তুমি সন্দেহ কর তার কারণ হচ্ছে তোমার মনে ভয় আছে যে যাকে তুমি ভালবাস সে হয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং তোমার দুর্বলতার আধিক্য তাকে ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করি। অবশ্য তাতেও যে ভয়ের কারণ নেই তা নয়। বিশ্বাসকে ভেঙ্গে-চুরে কোনওদিন আমি যাকে ভালবাসি তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা উভয়েই ঠিক।

পুরুষ : তবুও, কিন্তু............

নারী :
সময়ের সীমানায়
এসে গেছে পুনরায় একজীবন
সর্বশেষ ভালবাসার আহ্বানে
চিন্তা ও জ্ঞানের শেষ সম্বোধনে

মানুষের হৃদয়ের নিকটে
কিম্বা মনের আরও অনেক কাছে
এসে কি চলে যাবে সেই জীবন
নিভৃত, নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ একাকী ?

পুরুষ : জানিনা কি যে জবাব সব কিছুর
তবে জানি—
কালবৈশাখী আসে তার সব পাখা মেলে
উন্মুক্ত বারিধারা ঢেলে
বুঝিবা কণাভ্যাসের পাশে
আবেগের দুরন্ত হাতে পারে অদূর
জানিনা কি-যে জবাব সবকিছুর—

ফ্রয়েড—শিক্ষক ও বন্ধু

হ্যান্‌স্‌ স্তাক্স

ভাবানুবাদ—পুষ্পা মিত্র *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ভিয়েনা"

ফ্রয়েডের কাজ সম্বন্ধে প্রায়ই একথা বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর কাজ প্রায় পুরোপুরি ভাবেই ভিয়েনা ও ভিয়েনার অদ্ভুত নৈতিক পরিবেশের ফলশ্রুতি। ফ্রাঞ্জ শুবার্টের সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়ে থাকে, তবে তাঁর প্রতি করা মন্তব্যটি যেন অনেক বন্ধু-ভাবপূর্ণ। ফ্রয়েড অবশ্য এই শ্লোগানটির অসত্যতা বহু পূর্বেই তাঁর "History of Psychoanalytical Movement" গ্রন্থে প্রমাণিত করেন। ভিয়েনার যৌন-নীতির তথাকথিত শিথিলতা এবং তাঁর থিয়োরীর মধ্যে কার্য-কারণ সূত্র স্থাপনের চেষ্টার অযৌক্তিকতা তিনি স্পষ্ট রূপেই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত করেন। উন্মাদগ্রস্ততার কারন যদি যৌনতার অবদমনের গভীরতার উপর নির্ভর করে, তাহলে যে সমাজে সেরূপ অবদমন কম, সেখানে উন্মাদগ্রস্ততার কারণ খুঁজে বার করার সম্ভাবনাও কম। ফ্রয়েড অবশ্য কতকগুলি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, আক্রমণটির লক্ষ্যস্থল 'ভিয়েনার ফ্রয়েড' নন, বরং 'ইহুদি ফ্রয়েড'। তাঁর থিয়োরীর স্পষ্ট ভুল ব্যাখ্যার পশ্চাতে একটি জাতিকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। আজ যা সকলের সম্মুখে চিৎকার করে বলা হচ্ছে, তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিকরা—সভ্যতা ও মেকি শোভনতার খাতিরে, তা খোলাখুলি ও রূঢ় ভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেছেন। তখনকার দিনে এটি একটি প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে ইহুদিদের (অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে, 'প্রাচ্য' বা 'ভূমধ্যসাগরীয়' অথবা 'ফরাসী') মন যৌনতামূলক ক্রিয়া-কলাপের চিন্তায় অস্বাভাবিক রূপে লিপ্ত থাকে। এই অতি প্রাচীন কুসংস্কার ভ্রাম্যমান ইহুদিদের মতই প্রায় অমরত্ব লাভ করেছে। যখন কোন একটি দল বাহ্যিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য, সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তখন তাদের সম্পর্কে এই ধরনের কুসংস্কার জন্মগ্রহণ করে। প্রথম দিকের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও এইরূপ কুসংস্কার ব্যবহার করা হয়েছিল।

---

* মনঃ সমীক্ষিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের উপাধ্যায়।

ফ্রয়েডের মতবাদের মূল উৎসটি ভিয়েনার ছাপ-মারা—এটি একটি অন্তঃসারশূন্য যুক্তি। ভিয়েনার যৌন-আচরণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ফ্রয়েডের মতবাদের তুলনা করলেই এই যুক্তির অসারত্ব ধরা পড়ে। কোথায় ভিয়েনার যৌন-আচরণের মিষ্টি, বুদ্‌বুদের মত অন্তঃসারশূন্য ছেলে-খেলা—আর কোথায় ফ্রয়েডের লিবিডোর স্বেচ্ছাচারিতার ট্র্যাজিক ও তিক্ত ধারণা। যাই হোক্, যে শহরে তিনি চার বছরের শিশুরূপে প্রথম পদার্পন করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রায় আশী বছর বাস করেছিলেন, যেখানে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সূচনা এবং যেখানে তিনি পরবর্ত্তী জীবনের সেই সব শিক্ষকদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন যাঁরা তাঁর সম্মুখে চিন্তার ও অনুসন্ধিৎসার জগতের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন—সে শহর তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে কিছুটা প্রভাব নিশ্চয় বিস্তার করেছিল। অবশ্য তার এ অর্থ নয় যে তিনি কখনও ভিয়েনার প্রতি খুব অন্তরঙ্গ হয়েছেন, অথবা ভিয়েনা তাঁকে তার নিজের মানুষ বলে মনে করেছে। দুজনের মধ্যে যে মূল বৈসাদৃশ্য শেষ পর্য্যন্ত বজায় ছিল,-তা তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের শুরুতেই অনুভূত হয়েছিল। বহু বছর পর্য্যন্ত, তাঁর সহ নাগরিকরা (fellow-citizens) তাঁর অস্তিত্ব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি। তাঁদের এই ব্যবহারে অবশ্য অস্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না। যাঁরা ফ্রয়েডের বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের 'অথরিটি' বলে মনে করতেন, এই ব্যক্তিরা শুধু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন—এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রায়-দেবতা" দের কথা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কখনও-কখনও ফ্রয়েডকে উপহাস করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মনোভাব ছিল তাঁকে ও তাঁর কাজকে উপেক্ষা প্রদর্শন করা। এক সময় যখন বিশ্বের প্রায় সব স্থান থেকেই ফ্রয়েডের কাছে রোগীরা চিকিৎসার জন্য এসেছেন, তখনও তাঁদের মধ্যে ভিয়েনা-বাসীরা সংখ্যায় অত্যল্পই ছিলেন। কেবলমাত্র যখন বিশ্বজনীন খ্যাতি অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি তখন—বিশ্ববিদ্যালয়ের গোষ্ঠীর বাইরে—ভিয়েনাবাসীরা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু মনোভাবের এই পরিবর্ত্তন এক-তরফাই হয়েছিল। ফ্রয়েড তাঁর উদাসীন মনোভাব বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁর এই বিলম্বে পাওয়া জনপ্রিয়তায় কোন সাড়া দেন নি। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালে, আয়কর বিভাগ থেকে তাঁর আয়ের পরিমান সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত বিবরণে সন্দেহ প্রকাশ করে, তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল যে "এটা সর্বজন বিদিত যে আপনার খ্যাতি দূর-দূরান্ত থেকে রোগীদের টেনে আনে এবং এই সকল রোগীরা অনেক উঁচু ফি দিতে সক্ষম"— যার উত্তরে ফ্রয়েড লিখে পাঠান "অষ্ট্রিয়ায় আমার কাজের এই প্রথম সরকারী স্বীকৃতিতে আমি আনন্দিত।"

ফ্রয়েডের উপর ভিয়েনার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল কিন্তু এই প্রভাব বহুলাংশেই নেতিমূলক ছিল। ভিয়েনার প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পন না করে, ফ্রয়েড তার

বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর নিজের পরিবারের একটি অংশ—তাঁর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় তাঁর সৎ-ভাই—যে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করতেন—এই তথ্যটি তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। এবং সম্ভবতঃ এই বিরোধিতাই তাঁকে তাঁর স্ত্রী-রূপে এমন একজনকে নির্বাচিত করতে বাধ্য করেছিল যিনি কোন অংশেই ভিয়েনাবাসীর মত নন। (হ্যামবুর্গ আর ভিয়েনাকে সামাজিক পরিবেশের দিক দিয়ে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করা হয়ে থাকে।) তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকা—যিনি ফ্রয়েডের পরিবারের একজন সদস্যা ছিলেন—ভিয়েনার জীবনধারা অথবা ধরণের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় প্রদান করেননি। পঞ্চাশ বছর ভিয়েনায় বাস করার পরও দুজনেই বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় কথা বলতেন—যে বিশুদ্ধতার জন্য হ্যামবুর্গ বিখ্যাত। ভিয়েনাবাসী প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে কিছু-কিছু ভিয়েনার স্থানীয় শব্দ অনায়াসে স্থান করে নিত এবং সাধারণ মানুষ এ ধরণের শব্দ ব্যবহারের প্রতি ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করতেন। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প-শিক্ষিতদের নিকটে এই দুই মহিলার বিশুদ্ধ জার্মান প্রায় বিদেশী ভাষার মতই দুর্বোধ্য ঠেকত। এর ফলস্বরূপ মাঝে-মধ্যে বেশ কয়েকটি কৌতুককর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু এই দুই মহিলা নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে অবিচলিত ছিলেন। ভিয়েনার সঙ্গে বিচ্ছেদটি শুধুমাত্র ভাষা-ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছোট-খাট অনেক মুদ্রাদোষ, অভ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমেও অলক্ষ্যে এই পার্থক্য এতটাই প্রকট ছিল যে সমস্ত পরিবারটির মধ্যে এক বিদেশী-বিদেশী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল; যেন পরিবারটি একটি দ্বীপের মত—যে দ্বীপটির সঙ্গে যোগাযোগ সহজ কিন্তু তবু দ্বীপটি দ্বীপই।

কিন্তু ফ্রয়েডের এই বিচ্ছিন্ন একাকীত্ব স্থায়ী হবার পূর্বে নিশ্চয় একটি "গঠনমূলক" (formative) সময় ছিল, যে সময় তিনি তাঁর প্রথম জীবনের ধারণাগুলি তৈরী করেছেন—অর্থাৎ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়কার ভিয়েনা অথবা ফ্রয়েড কারুর সম্বন্ধেই আমার কিছু জানা নেই, কেননা ফ্রয়েড যে বছর তাঁর M.D. ডিগ্রি লাভ করেন, সে বছর আমার জন্ম হয়। কিন্তু আমার শৈশবের ভিয়েনার সঙ্গে ফ্রয়েডের কৈশোর ও যৌবনের ভিয়েনার বহুলাংশেই সাদৃশ্য ছিল। "স্বেচ্ছাচারিতার" (liberal era) যে কালটুকু ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে চরমতা লাভ করেছিল, সে কালটুকু আমার শৈশবে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়নি—যদিও তা তখন দ্রুত অবনতির মুখে ছিল এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, তিনি এবং আমি দুজনেই প্রায় একই ধরণের সামাজিক স্তর থেকে এসেছিলাম, এবং এর ফলে আমাদের প্রতিপালন এবং পৃথিবীর প্রতি প্রাথমিক দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। আমরা দুজনেই

মধ্যবিত্ত ইহুদি সমাজের লোক ছিলাম এবং মাত্র এক বা দু-পুরুষ পূর্বে আমাদের পরিবার স্ব-স্ব প্রদেশ থেকে ভিয়েনায় চলে আসে। তাঁর এবং আমার পিতা অথবা পিতামহরা বোহেমিয়া বা মোরাভিয়া থেকে এসেছিলেন এবং এর ফলে যে সমস্ত ইহুদিরা 'পূর্ব' থেকে এসেছিলেন এবং গ্যালিসিয়া ও পোল্যাণ্ডের ghetto গুলিতে অনেক বেশী বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য বেশ বড় রকমেরই ছিল। আমরা যে সমস্ত "পাশ্চাত্যদের" সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিলাম, তাঁরা তাঁদের ধার্মিক ঐতিহ্য ও রুচিবাদী বিশ্বাসের অনেকটাই আধুনিক চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় জীবনধারার পরিবর্তে ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন। ধামিক মতবাদ বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মিশে যাওয়াই ছিল তাঁদের আদর্শ।

অবশ্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এসব সত্ত্বেও আমি এই সুযোগে প্রাক্-যুদ্ধ ভিয়েনা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ভিয়েনা সম্বন্ধে আমি অনেকগুলি ভ্রান্ত ও ভাসা-ভাসা নিন্দা-প্রশংসা পূর্ণ মতবাদ পড়েছি এবং এখন চিরকালের মত ভিয়েনা ত্যাগ করার প্রায় পঁচিশ বছর পরে আমি সম্ভবতঃ সেই নিরাপদ দূরত্বে উপনীত হয়েছি যেখান থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমার জ্ঞাত-তথ্যগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারব। যেহেতু আমি যুদ্ধ পরবর্তী ভিয়েনাতে ছোট-খাট ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছাড়া, বসবাসের জন্য কখনও যাইনি, আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলি আমার পূর্ববর্তী স্মৃতিকে কোনরূপে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। আমার পূর্বেকার স্মৃতি তদানীন্তন সময়ের ছবিকে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টরূপে ধরে রেখেছে, এমনকি বর্তমানের সঙ্গে কোনরূপ ভাবগত বা ক্রোধমূলক তুলনাও করেনি। তাছাড়া, এই পূর্বেকার ভিয়েনা তার দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রবল সাংস্কৃতিক প্রভাব বিকিরণ করত। উদাহরণ স্বরূপ, ভিয়েনার চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিকে আমেরিকায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের ভিয়েনার জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার বিশিষ্টরূপে সাধারণভাবে sincerity-র অভাব ফুটে ওঠে কিন্তু তা নিয়ে মিথ্যাচার তুলনামূলক ভাবে অনেকটা কম ছিল। পরবর্তী ভিক্টোরিয়ান যুগে পরবর্তী কালের প্রবল অনমনীয় পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব অনেকটা কমে এসেছিল পৃথিবী সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শ ও সরলীকৃত ধারণার বিরোধী যে সকল তথ্য আমাদের জীবন ও পৃথিবীতে দেখা দেয়, সেগুলিকে সরিয়ে রাখা বা সম্পূর্ণ ভুলে থাকা, আর সম্ভব হচ্ছিল না। "জীবনের তথ্যগুলি" (facts of life) সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে তোলার সর্বাপেক্ষা কঠিন ও

অসুবিধাজনক বাধা রূপে দেখা দিয়েছিল, "সুতরাং এই মধ্যযুগীয় ভিক্টোরিয়ান যুগে যৌনতা সম্বন্ধে কোন খোলাখুলি আলোচনা তা সে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল অথবা বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী ছিল। ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রথম স্তরে এই নিষিদ্ধতা কতটা কার্যকরী হতে পেরেছিল তা অবশ্য প্রশ্নের বিষয়, কিন্তু যুগের শেষ দিকে যে এটা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যদিও সামাজিক ভাবে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি তখনও তুলে ধরার চেষ্টা করা হত। "সমকামিতা" অথবা "সিফিলিস"—সংবাদপত্রে এই ধরণের শব্দ ব্যবহার তখনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং অনেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ ধরণের কথার অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া হত; যেমন, বেশ্যাবৃত্তি বোঝাবার জন্য লেখা হত—"যে স্ত্রীটি তার হাত দিয়ে কাজ করে।" "শিশুর জন্ম কোথা থেকে হয়" ইত্যাদি প্রশ্নগুলি এমন নিষিদ্ধ ছিল সেগুলি কিশোররা অন্ধকার গৃহকোণে লাজুকভাবে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করত। কিন্তু এই ধরণের তথাকথিত শালীনতা উপেক্ষা করেছে এমন পুস্তকাদি সর্বত্রই পাওয়া যেত এবং এগুলি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে অনেক ছোট বয়সেই আমি তাদের নাম জানতে পেরেছিলাম এবং আমার মনের উপর সেগুলি গভীর রেখাপাত করেছিল। যখনই আমি এ ধরণের বই পেতাম তখনই পড়তাম। এই যুগের কেন্দ্র-চরিত্র ছিলেন এমিল জোলা। সে যুগে তাঁর প্রভাব, বর্তমান যুগের পক্ষে যা তাঁকে শুধু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার মানদণ্ডে বিচার করে, কল্পনা করা কঠিন। একটি "ভদ্রগৃহে" "নানা" কিংবা "La Fautede L'Ablue Mouret" সর্বসমক্ষে রাখা বা আলোচনা করা হত না। এই ধরণের বই বিষবৎ দূরে রাখা হত—বিশেষ করে তরুণীদের দৃষ্টিপথ হতে। বলাই বাহুল্য এই নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রন্থগুলির আকর্ষণ ও বিরাট জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্যই করেছিল। ইবসেনের নাটকগুলি অবশ্য ততটা গোপনীয়তার আবরণে আবরিত ছিল না এবং কয়েকটি নাটক ষ্টেজে অভিনীতও হয়েছিল। রক্ষণশীলতা ও সামাজিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ অনেকটাই তত্ত্বগত ছিল; অপেক্ষাকৃত কম স্থূল ও প্রত্যক্ষ ছিল। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষা ও সংবাদ এক নতুন নাট্য-আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁকে নীতিশাস্ত্রের এক বিপ্লবের জননায়ক করে তুলেছিল। ভিয়েনার অধ্যাপক ক্র্যাফ্‌ট এবিং (Krafft Ebing) তাঁর "Psychopathia Sexualis" গ্রন্থের মাধ্যমে যৌনবিকৃতি ও এই ধরণের বিষয়গুলির উপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা ভঙ্গ করেন এবং গোপনীয়তার ফলে যে সকল তথ্যগুলির অস্তিত্ব অপ্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছিল তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

অন্যদিক থেকে, চরমপন্থীদের কিছু বিশেষ অর্থবহ শব্দ, বিশেষ করে সমাজবাদী আন্দোলন ও সাহিত্য, মধ্যবিত্ত মনে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করছিল। বেবেলের লিখিত

একটি গ্রন্থ আধুনিক সমাজে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখাল, বেশ্যাবৃত্তিকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যারূপে তুলে ধরল যার আশু সমাধান বিলম্বের অপেক্ষা রাখে না এবং এই গ্রন্থটি বহু আগ্রহী পাঠকের মনের খোরাক জুগিয়েছিল।

* * * * *

যে সমস্ত ধারণাগুলি নিষিদ্ধ তাদের নিয়ে গোপনে খেলা-করা, মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে চরমপন্থা, এইগুলি যুগসন্ধির কালে ভিয়েনাবাসীর মনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাও তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। যখনই কঠিন রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হত তখনই অন্য দিকে তাকাবার পন্থা অবলম্বন করত। অষ্ট্রিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র তার সমস্ত সাধারণ সাজ-সজ্জা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চার্টার অফ লিবার্টি ছিল, পার্লামেন্টের দুই সভা ছিল, দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা ছিলেন, স্বাধীন আদালত এবং সাধারণ ভাবে সরকার পরিচালনার যাবতীয় কল-কব্জা যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ এটাও সর্বজনবিদিত ছিল যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটির হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল অষ্ট্রিয়ার "আশীটি পরিবারে'র, হাতে এবং এই পরিবারগুলি এক অত্যন্ত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ উপরের স্তর তৈরী করেছিল এবং যে তাদের বিরোধিতার চেষ্টা করত তাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমতাচ্যুত করা হত। দীর্ঘদিন ধরে অন্তর্বিবাহের ফলে তারা প্রায় এক বৃহৎ পরিবারে পর্যবসিত হয়েছিল এবং তারা নিজেদের এক পরিবারভুক্ত বলেই মনে করত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং—তিনি ছিলেন বৃদ্ধ একগুঁয়ে এবং দরবারী আদব-কায়দার কঠিন নিয়মের দ্বারা তাঁর রাজ্যের প্রকৃত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। বিচারালয়ের যে সকল কর্ম-কর্তারা তাঁকে ঘিরে থাকতেন, তাঁরা এই উপরোক্ত "আশীটি পরিবারের" সদস্য ছিলেন। এই প্রভাব এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করারও অবকাশ ছিল না। শতাব্দীর ঐতিহ্য ও মর্য্যাদা তাঁদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রচুর ঐশ্বর্যের (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমি) শক্তি। জমি ও বনাঞ্চলের সর্বোত্তম অংশগুলি; শস্যক্ষেত্র ও গবাদি পশুর সর্বোন্নত অংশ, এমন কি কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত কৃষকরাও তাঁদের অধীন ছিল। কর্তৃত্ব ও শাসন করার মনোভাব তাঁদের মনে এমন গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে এর জন্য যে তাঁদের কখনও দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে, হতে পারে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। এই অবস্থাটিকে তাঁরা এক অবশ্যকরণীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত, জন্মগত কর্তব্যরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট রাজকীয় মর্য্যাদার সঙ্গেই তাঁরা সে কর্তব্যপালনে সচেষ্ট ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ব্যক্তিরূপে তাঁরা অমায়িক ও নম্র ছিলেন। বহু যুগ ধরে জীবনের সর্বোত্তম জিনিসগুলি ভোগ করতে পারার ফলে অভিজাতবংশীয়রা যে ব্যবহারিক

শোভনতায় (refined manners) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এঁরাও তদ্রূপই ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে যোদ্ধসুলভ নির্দয়তার চিহ্নমাত্র ছিল না; বরং এক লাবণ্যপূর্ণ, আত্মসুখী অলসতার মনোভাব অধিকমাত্রায় ছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও পরোপকারীও ছিলেন কিন্তু সমগ্র গোষ্ঠির প্রভাব এমন প্রবল ছিল যে জনজীবনে কিছু করার প্রচেষ্টা কখনও কার্যকরী হয়ে উঠত না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও সম্ভব ছিল না। গঠনহীন ও নেতৃত্বহীন এই ঘনিষ্ঠ সংঘবদ্ধতা, তাদের আকারবিহীন অজ্ঞাত দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে একটিমাত্র দিকে প্রবাহিত করতে পেরেছিল:—যা কিছু নতুন তাকে বাধাদান এবং তার সঙ্গে অসহযোগিতা। রক্ষণশীল হবার ইচ্ছায় তাঁরা অপরিহার্যরূপে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই অভিজাতবংশীয়দের এক তরুণ সদস্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিদ্যালয়ের এক অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা অধ্যাপক তাঁর অজ্ঞানতার জন্য তিরস্কার করে বলেছিলেন, "কাউন্ট, আমি আপনার Lower Austria র গভর্ণর হওয়া আটকাতে পারি না কিন্তু অন্ততঃ এক বছর পিছিয়ে নিশ্চয় দিতে পারি।

দেশের সর্বত্র এই অস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিকদল, নির্বাচন, পার্লামেন্টে গরম-গরম বক্তৃতা, ভোটের মাধ্যমে আইন-প্রণয়ন ও সেগুলি কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন পদের সৃষ্টি সবই যেন সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক রীতিতে হত। কিন্তু এ সবই লোক দেখানো ব্যাপার ছিল। সত্যি-সত্যি কিছু করার জন্য "উপরওয়ালাদের" সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ, পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সাহায্য ছাড়া কোন কাজ তা সে যতই আইনানুগ বা দেশের সংবিধানানুগ হোক না কেন করা সম্ভব ছিল না এবং এর সাহায্যে যে কোন আইন অমান্য করা বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। জনগণের সমক্ষে অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতরূপে বন্ধুত্বপূর্ণ-ভাবে যাই বলা হোক্ না কেন প্রকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না।

উপরতলার এই জীবনযাত্রার অনুরূপ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের জীবনযাত্রার ধরণ নির্দ্ধারিত করেছিল—তারা এই জীবনযাত্রা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও অনুকরণ করত। যে সমস্ত ধনী ইহুদিরা ধর্মের বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তাঁরা সহজেই এই শ্রেণীর অগ্রগণ্য হয়ে পড়লেন। ফলস্বরূপ তাঁদের মধ্যে দু' ধরণের মনোভাবের বিকাশ হয়েছিল; একদিকে ছিল অত্যন্ত snobbish মনোভাব আর একদিকে উচ্চ সৌন্দর্যবোধ। এমন কি তাঁদের মধ্যে একদল গর্বভরে বলতেন যে তাঁরা নীতি অপেক্ষা "সৌন্দর্য" কে বেশী মূল্য দেন।

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি তুচ্ছ। শাসকদলের চোখ-ধাঁধানো জীবনযাত্রার প্রভাব আরও অনেক গভীরতর ছিল। মর্য্যাদাপূর্ণ, আকর্ষক, কাম্য ও সুষ্ঠু সমস্ত কিছুর উচ্চতম

প্রশংসার শব্দটি ছিল "সম্ভ্রান্ত"। অর্থাৎ পোষাক-আশাক বা ব্যবহারে এমন হতে হবে যাতে লোকে তোমাকে অভিজাতবংশীয় মনে করে অথবা অভিজাতবংশীয় বলে ভুল করে। এই মধুর ভ্রান্ত-বিশ্বাস উৎপাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল বড়-বড় বক্‌শিস্ দেওয়া, অথবা সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মত টাকা ওড়ানো। বাড়ীর জীবনযাত্রার মান হয়ত নিম্ন মধ্যবিত্তের পর্যায়েই পড়ে, অথচ সমস্ত ভিয়েনা যেন সর্ব্বক্ষণ বক্‌শিস দিচ্ছে। কারুর বাড়ী গেলে যে দরজা খুলবে তাকে "টিপ" দিতে হবে; নিজের বাড়ীতে রাত দশটার পরে পৌঁছলে দরজা খোলার জন্য ' টিপ" দিতে হবে; যদি গাড়ীতে চড়ে যেতে চান "টিপ" না দিয়ে উঠতে পারবেন না। কার্ল ক্রাউজ, ভিয়েনার ব্যঙ্গ লেখক, বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে পুনরুত্থানের (Resurrection) দিনে ভিয়েনাবাসী প্রথম যা দেখবে তা হচ্ছে কফিনের দ্বার উন্মোচনকারীর প্রসারিত হস্ত।

"টিপ" দেওয়ার এই নেশা ফিউডাল দৃষ্টিভঙ্গির এক সত্যিকার বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। একজন সাধারণ স্তরের মানুষ, ব্যবসায়ী বা কারিগর তার অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকের কাছ থেকে কোন সেবা গ্রহণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে এটা অত্যন্ত অবমাননাকর বলে গণ্য করা হত। টিপ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি যেন এক ঋণ শোধ করলেন এবং নিজের মর্য্যাদা ও সম্মান ছাড়া তিনি আর কারুর নিকটে কোন বন্ধন রাখলেন না। এই বিরোধমূলক, কাল্পনিক, তথাকথিত "রাজোচিত" মনোভাব ভিয়েনার সমস্ত জীবনে ওতঃপ্রোত হয়েছিল, যার ফলে সহজ-সহজ কাজগুলি অস্বাভাবিক ব্যয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়াত।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি কোন ভাল রেঁস্তরায় আহার করেন তাহলে আপনাকে চারটি বিভিন্ন স্থানে "টিপ" দিতে হবে। প্রথমটি হেড ওয়েটারের জন্য যে আপনার অর্ডারটি নিয়েছে কিন্তু তার পরে আর নিজের চেহারা দেখায় নি, একেবারে বিল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটির তদারকির দায়িত্ব তার উপরেই ছিল। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে ওয়েটার আপনার খাবার এনে দিয়েছে তার জন্য। তৃতীয়টি যে ওয়েটার "ড্রিঙ্কস্" সরবরাহ করেছে এবং চতুর্থটি সবচেয়ে বাচ্চা ওয়েটারের জন্য যে আপনাকে কোট পরতে সাহায্য করেছে বা কাঁধ সমান উঁচু না হতে পারলে অন্ততঃ পরাবার আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। "টিপে"র অনুপাত দেখে বা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তারা আপনাকে "হের ডক্টর" (সম্মানের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন) অথবা "হের ফন" (ফরাসী ভাষার মঁসিয়ে)" ...এর অনুরূপ) অথবা "হের ব্যারন"—সর্বোচ্চ সম্মানসূচক সম্বোধনে সম্বোধিত করবে।

(ক্রমশঃ)

ধৈষণা

তরুণচন্দ্র সিংহ *

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। ভারতে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর যে হারে বাড়িতেছে, তাহার ফলে দেশের যে নানা রকমের জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্ম যে আরও বহু সমস্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, সে সব বিষয় চিন্তা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রনায়কগণ বিশেষ চিন্তিত এমনকি উদ্বিগ্নও হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল আয়ের পথ বাড়াইতে থাকিলে যে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না একথা বর্তমানে প্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং আয় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও কমানো দরকার এবং সেইজন্যই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন এই মত বহু উপায়ে প্রচারিত হইতেছে। ইহার কোনও সুফল ফলিতেছে না এমন কথা আমরা মনে করিনা। কিন্তু এই প্রচারের সুফল কতখানি পাওয়া যাইতেছে তাহাও বাস্তব সূত্রে হিসাব করিয়া দেখা খুবই দরকার। প্রচারের ব্যয় কম হইতেছে না। সেই ব্যয়ের যোগ্য ফল লাভ হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চয়ই দেখা দরকার। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে প্রচারের কোথায় কি দোষ-ত্রুটি হইতেছে বা কি রকম প্রচার কোথায় করিলে অধিকতর ফল লাভ হইতে পারে তাহা অবশ্যই নিয়মিত দেখা দরকার। বহু যুগের বিশ্বাস, সংস্কার ও জীবন-যাপনের ধারায় পরিবর্তন ঘটানো খুব সহজসাধ্য নহে। শিক্ষা, বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন আছে। শহরে যে সব জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয় প্রচার চলিতেছে দূর গ্রামবাসীদের তাহা উপকারে আসে না। রেডিওর মাধ্যমে যে প্রচার কার্য চলিতেছে তাহা আজকাল কিছু-কিছু গ্রামে শোনা যাইতেছে সত্য কিন্তু তাহাও সকল স্তরের গ্রামবাসীদের নিকট পৌঁছিতে পারিতেছে না। যে ভাষায় প্রচারিত হয় তাহাও সকলের পক্ষে বুঝিবার যোগ্য নয়। জনসাধারণের মনে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আগ্রহ না জাগাইতে পারিলে এই সকল প্রচার কেবল কথার ঘেনঘেনানি মাত্র হইয়া বিরক্তি উদ্রেক করে অথবা এই বিষয়ে মনে এক রকমের উদাসীনতার সৃষ্টি করে। ফলে যাহা বলা হইতেছে তাহা কেবল কানে শোনাতেই থাকিয়া যায়; প্রাত্যহিক জীবনে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি এই সকল প্রচারে কোনোই সুফল হইতেছে না এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না।

* মনঃসমীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

আমাদের বক্তব্য সহজ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, এই জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটা যত বড় জটিল ও জরুরী, আমাদের প্রচার কার্য ঠিক সেই পরিমাণে ফলপ্রসূ হইতেছে কিনা দেখা খুবই জরুরী প্রচেষ্টা বলিয়া আমরা মনে করি। বিষয়টি এক হইলেও আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্ম প্রচারের (শিক্ষার) রকম ও ভাষার রকম-ফের হওয়ার দরকার আছে। তাহা না হইলে কেবল কথায় লোকের আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া সভা করিয়া, বাড়ী-বাড়ি ঘুরিয়া প্রত্যেকের সমস্যাটা বাস্তবভিত্তিক ভাবে বুঝাইয়া তাহার প্রতিকারের উপায় বলিয়া-বলিয়া যদি শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে প্রকৃত শিক্ষার উপকার পাইতে বহু সময় লাগবে। ততদিনে আমাদের সমস্যা আরও বহু পরিমাণে ঘনীভূত হইয়া সমাধানের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। প্রত্যেক পল্লীর এক একটা বিশেষ রূপ আছে। একটা বিশেষ ধারা বহু যুগ হইতে চলিয়া আসিতে আসিতে একটা দৃঢ় কাঠামো গড়িয়া উঠে। এই কাঠামোর ভঙ্গীতে রদ-বদল করিতে হইলে কোথায় যে ঘুণ ধরিয়াছে তাহা বারে-বারে প্রত্যেক পরিবারকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হইবে না। আমাদের দেশে অনেক সমাজ সেবার দল আছে, বহু রাজনৈতিক দল আছে তাহাদের কর্মীর সংখ্যা কম নহে। সেই সব কর্মীদের কিছু সংখ্যক গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া ও কারখানার কর্মীদের মধ্যে নিজ-নিজ দলীয় প্রচার করিয়া থাকে। ভারতের এই নানা দলের, নানা মতের কর্মীরা রাজনীতির নিজ নিজ দলীয় মত প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের এই জনস্ফীতির সমস্যাটার সমাধানের জন্য যদি জনগণের মধ্যে সংযুক্ত হইয়া উপযুক্ত প্রচার করিতে পারে তবে এই সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হইতে পারে। দেশের এই সমস্যাটা কোনও বিশেষ রাজনীতিক দলের সমস্যা নহে। ইহা সব-দেশীয় সকলের সমস্যা। এই বুঝিয়া সত্যকারের দেশহৈতেষী দলগুলি এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় যুগ্মভাবে সচেষ্ট হইতে পারে না কি? নিজ-নিজ দলের প্রাধান্য রক্ষা করিতে যাইয়া যদি জনসাধারণের মধ্যে এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও মত-বিরোধের, মতান্তরের সৃষ্টি করেন তবে সমস্যাটি সমাধানের দিকে না যাইয়া আরও জটিলতার দিকেই যাইবে। এই বিষয়েও আমরা একমত হইতে পারিব না। দলীয় স্বার্থ ও অহংকার এখানেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে মনে হয়। যে ভাঙনের স্রোত এখনও আমাদের সমাজ-জীবনে চলিতেছে তাহা দেখিয়াও দৃঢ়ভাবে কিছু বলা সহজ নহে। সৃজনী মনোভাব আমাদের মধ্যে সামান্য যতটুকু দেখা যায় আজও তাহার খুব দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না তবে সেই দিকেই নজর রাখিয়া আমাদের চলিতে

হইবে। বাধা যতই আসুক তাহা অতিক্রম করিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের থাকিতে হইবে। ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন।

যৌন-সুখ আমাদের জীবনে একটি প্রধান আকর্ষণীয় কাম্য বিষয়। এই সুখ ভোগ করিবার পথে যত বাধা-নিষেধ সমাজ ও ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মূলতঃ স্বীকার করিয়া চলার ফলেই সমাজ গঠন সম্ভব হইয়াছে। এই যৌন বিষয়েও বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠির মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম অনুসারে চলিয়া আসিতেছে। কালের গতিতে এই সকল অনুশাসনের রদ-বদল অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন-বোধে আরও হইবে। এবং কিছু নিয়ম সর্ব্বকালেই থাকিবে। এই সব বহু বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও আমাদের কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিধি-বিধানেরও প্রত্যেক সমাজেই ব্যবস্থা করা আছে। কামবৃত্তিকে দমন করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিলে নানা মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। সেই সকল মানসিক রোগও সমাজের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে। ক্ষতির পরিমাণ ইহাতে বেশী ভিন্ন কম হইবে না। সে কথা এখন থাকুক। আমাদের আসল কথায় ফিরিয়া আসি। কামসুখ বাদ দিতে বলিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহাকে বাদ দিয়া চলিবার কথা কেহ বলে না। ইহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিবার কথাই বলা হয়। মানসিক রোগগ্রস্তদের বাদ দিলেও সাধারণের মধ্যে এই কামসুখের প্রতি একটা স্বাভাবিক তাগিদ থাকে। যাহাদের জীবনে আর দশ রকমের সুখের ক্ষেত্র সীমিত তাহাদের পক্ষে সারা দিনের নানা সমস্যা-জর্জরিত দিন-যাপনের পরে দিনান্তে এই কাম-সুখভোগের লালসাই প্রবল হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পন্থা অবলম্বন না করায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সন্তান-জন্মের হার এইজন্যই বেশী দেখা যায়। অন্য আরও অনেক কারণও আছে। বিত্তবানদের মধ্যে কেবল অন্য বহু সুখভোগের পথ খোলা থাকার জন্যই যে তাহাদের মধ্যে সন্তান জন্মের হার কম দেখা যায় তাহা নহে। ইহার আরও অনেক শারীরিক ও মানসিক কারণও আছে। সে সব বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাদের স্বাভাবিক প্রবল কামবৃত্তির জন্যেই আমরা কামক্রিয়ায় রত হই এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আশ্রয় না লওয়ায় ফলে সন্তান সংখ্যা বাড়িয়াই চলে। চিকিৎসার উন্নতি হওয়ায় শিশু-মৃত্যুর হারও আগের তুলনায় কমিয়াছে। ফলে আমাদের দেশে জনস্ফীতির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক হইয়াছে ভারত-বাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই।

এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথে আরও কিছু-কিছু কথা বুঝিবার আছে। বিশেষ করিয়া গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বেশী সন্তান পাওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়।

সন্তান বেশী হইলে বড় হইয়া তাহারা অনেকে মিলিয়া থাকিয়া রোজগার করিতে পারি এইরূপ আশাও মনে কাজ করে। তাছাড়া সন্তান ভগবানের দান, সে পথে বাধা দিলে পাপ করা হইবে এইরূপ বিশ্বাসও আছে। তাহাদের অন্নসংস্থানের প্রশ্ন? "জীবন দেন যিনি আহার জোটান তিনি"। এই সহজ বিশ্বাস মনে বেশ গূঢ়ভাবে কাজ করে। জন্ম-মৃত্যু আমাদের নাগালের অতীত ইত্যাদি কথাও আছে। কথাগুলি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে, একেবারে হয়ত সকল প্রশ্ন অর্থহীন নয়। আমরা ইচ্ছা করিলে যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি ও কিছু পরিমাণে মৃত্যুও সাময়িকভাবে রোধ করিতে পারি একথা আজকাল আর শিক্ষিত মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অশিক্ষিত দূর পল্লীবাসীদের মনের কথা আজও আমাদের সহরে শিক্ষিত মানুষের মানসিকতা হইতে কিছু পৃথক। সেই জন্যই পূর্ব্বে পল্লীভিত্তিক-গ্রামভিত্তিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা প্রচারের কথা বলা হইয়াছে। দীর্ঘকালের বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঘাত পড়িলে মানুষের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং সেই দিকে কর্মীদের নজর রাখিয়া কাজে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। আর্থিক দুরবস্থা, দৈহিক ক্লান্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন আছে। সুতরাং সকল গ্রামেই একইভাবে প্রচার করিতে থাকিলে তাহা সমান কার্যকরী হইবে না। শিক্ষার বিষয় মূলতঃ এক রাখিয়া পল্লীর বিশেষ অবস্থা জানিয়া উপযুক্ত সূত্র ধরিয়া যোগ্য ভাষায় সেই শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে। কতকগুলি মূল সূত্র সহজে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে কিন্তু কতকগুলিতে এক-এক ক্ষেত্রে বাধা দেখা দিতে পারে। কি ভাবে, কোন ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কর্মীদের পূর্ব হইতে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এলোপাথারীভাবে কাজে লাগিলে কুফল দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। গ্রামবাসীদের সহিত একাত্ম হইয়া মিলিতে হইবে। উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ইত্যাদি আহংকারীক ব্যবধান রাখিয়া কাজে নামিলে উপযুক্ত ফল লাভ হইবে না।

এই বিষয়ে আরও কতকগুলি বাধা দেখা দিতে পারে। ঔষধ খাইয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সকলে সমান বিশ্বাসী নহে। আবার অস্ত্রোপচারের দ্বারা জন্ম-নিষেধের ব্যবস্থা করিলে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহার একটি হইল অবিশ্বাসের সৃষ্টি। স্বামী বা স্ত্রীর অস্ত্রপ্রয়োগে সন্তান জন্ম বন্ধ করিলে ব্যভিচারের সুযোগ বাড়িয়া যাইবে এমন বিশ্বাসও কিছু লোকের আছে। এইজন্য স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করিতে থাকে। ফলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয় এমন কি পরিবারের ভিত্তিই নষ্ট হইয়া যায় দেখা গিয়াছে। সকলেরই এই রকম অবিশ্বাসের মনোভাব দেখা দেয় তাহা নহে। ইহাই আশার কথা। তবুও অস্ত্রোপচারের আগে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া

বিশেষ দরকার। তাহা না হইলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিষ্ট হইতে পারে। ব্যাভিচার কিছু-কিছু নাই এমন সমাজ কোথাও নাই। মানুষের মন এক দিকে যেমন নিয়ম গড়িয়া নিজের বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে, অন্য দিকে সেই মনই নিয়মের নিগড় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টাও করে। ফলে সুযোগ-সুবিধা পাইলে বা ব্যক্তি-বিশেষ সুযোগ খুঁজিয়া লইয়া নিজ-নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যভিচারী হইতে পারে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার আমাদের উন্মুক্ত ব্যাভিচারী হইবার পথে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু সর্বাবস্থায় সকলের ক্ষেত্রে সেই সব বাধা সময়ে কার্যকরী হয় না। শিক্ষা ঠিক মত হইলে এই ধরণের ব্যাভিচারের সংখ্যা কম হইবে। মানুষ কেবল ভোগই চায় না সেই ভোগকে বিশেষ-বিশেষ আদর্শানুগ করিতেও চায়। এই আদর্শ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বদল হয়। এইসব মানিয়া লইয়াই আমাদের সমাজ-কল্যাণের পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকলের পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ সকল অবস্থায় একই পন্থায় করিতে যাওয়ার বিপদ আছে। মানসিক অশান্তির এক দিকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আরেক দিকের কথা একটু বলিয়া এবারে কথা শেষ করিব। ব্যক্তির আত্ম-মূল্য-বোধের কথা উল্লেখ করিতে হয়। যৌন-ক্ষমতা পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই আত্ম-মূল্যবোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পুরুষের যৌন-ক্ষমতা না থাকিলে তাহার পুরুষত্ববোধের মানসিকতায় নানা সমস্যা যেমন দেখা দেয়, নারীর সন্তান-ধারণের ক্ষমতার অভাব-বোধ দেখা দিলেও তেমনই আত্ম-মূল্যহীনতায় নানা জটিল মানসিকতার রোগ-লক্ষণ দেখা দেয়। কে কিভাবে এই নিরোধ-ব্যবস্থাকে মনের গভীরে গ্রহণ করে তাহার উপরই এই বিষয়ে ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। বয়ঃধর্মে নারীর জীবনে সন্তান-ধারণের ক্ষমতা লোপ পাইলে তাহার মানসিক অবস্থার বহুল পরিবর্তন এমন কি অনেক সময় বিশেষ রকমের মানসিক রোগ-লক্ষণও দেখা দেয়, এমনও দেখা যায়। অস্ত্রোপচারের ফলেও একই রকমের মূল্যহীনতা বোধ হইতে মানসিক রোগ লক্ষণ দেখা দিয়াছে এমন নজিরের অভাব নাই। পুরুষের এ অস্ত্রোপচারের ফলে কিছু-কিছু মানসিক রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা না হয়, সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। অস্ত্রোপচার করিলেই সকলেরই যে মানসিক রোগ-লক্ষণ দেখা দিবে একথা বলা যায় না। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যে এই পরিণামের সম্ভাবনা আছে এই কথাটিই জানা দরকার। এইজন্যই অস্ত্রোপচার করিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক অবস্থার বিষয়ে জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হাতে ছুরি

লইয়া, যে আসিবে তাহাকেই জন্ম-নিরোধ করিবার জন্য ছুরি চালাইব, এই মনোবৃত্তি আদৌ গ্রাহ্য নহে। চিকিৎসক রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া যেমন অস্ত্র-প্রয়োগ করেন তেমনই রোগীর মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করাও বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না হইলে সমাজে এক সমস্যা দূর করিতে যাইয়া অন্য গুরুতর সমস্যা ডাকিয়া আনা হইবে।

এই সম্বন্ধে আরেকটি বিষয় বুঝিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে। কোনও-কোনও সমাজে বিশেষ ধর্মীয় মতাবলম্বীদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণের মধ্যে গ্রাহ্য নহে। এমনকি ইহা অশাস্ত্রীয় ও ধর্মহানিকর বলিয়া মত প্রকাশ করাও শুনিয়াছি। বাহিরে রাজনৈতিক কারণে বা চাপে পড়িয়া হালকাভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রথা মানিয়া লইয়াও ভিতরে-ভিতরে নিজেদের মধ্যে এই প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতার সংকল্প লইয়া চলিবার কথাও শুনিয়াছি। যদি ইহা সত্য হয় তবে বেশ কিছু বৎসর পরে ঐ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং অপর সম্প্রদায়ের যাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিবে তাহাদের সংখ্যা বহু কমিয়া যাইবে। এই ভাবে চলিলে দেশের জনভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘাটতি থাকিবে। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও সমাজনীতিবিদ্গণ এই বিষয়ে সময় থাকিতে প্রথম হইতেই আবশ্যক সতর্কতা লইয়া চলিবেন ইহাই আমরা আশা করিব। অন্য দিকে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহাদের সংখ্যা কমিবে কিন্তু অপর দিকে স্বল্পশিক্ষিতদের মধ্যে যদি আশানুরূপ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সার্থক না হয় তবে দেশের শিক্ষার উচ্চমানের ক্ষেত্রে আমাদের অবনতি দেখা দিবে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে ইহা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন অবশ্য আছে এই কথা আমরা আবারও বলিতেছি। কিন্তু সেই নিমিত্ত ইহার জন্য কোনও ঢালাও ব্যবস্থা করিয়া বসিলে যে অনেক জটিলতা দেখা দিবে এই সম্বন্ধেও আমাদের প্রথম হইতে অবহিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া চলিতে হইবে। যত বড় প্রয়োজনই হউক ইহাকে খেয়াল-খুশী মত চলিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না।

আরেকটা কথা বলা দরকার। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা দিবার যে বিশেষ দরকার আছে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষার প্রচার-প্রসার ইত্যাদিতে ফল পাইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে। শিক্ষা চলিবার

পথে বাধা সৃষ্টি না করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত আইন প্রয়োগের দ্বারাও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করা দরকার। শাসন-অনুশাসন না থাকিলে এই প্রাথমিক অবস্থায় কেবল শিক্ষার ফলে প্রবৃত্তির নিরোধ, সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে সফল হইবার সম্ভাবনার আশা পোষণ করা যে সঙ্গত হইবে না, এরূপ মত প্রকাশ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে আমাদের আদি বৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত খুশী অনুযায়ী হত্যা করা বা নিষেধ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যোগাভ্যাসের দ্বারা যে বৃত্তি-নিরোধ করিবার কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে কত দুর সম্ভব তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সকলের পক্ষে যে সেই স্তরের যোগী হওয়া অসম্ভব তাহা যুক্তি বা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজেদের দিকে এবং পারিপার্শ্বিক সকলের দিকে চাহিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা অনস্বীকার্য হইবে। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের ক্ষমতাও সীমিত। এই কথা শরীর ও মন এই উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। শরীরের কথা বাদ দিয়া এখানে কেবল মনের কথাই একটু বলিব। আমরা যেমন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা, যাহা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তখনই তাহা মনে-মনেও পাইতে পারি না। আমাদের মনের কল্পনারও ব্যক্তিগত সীমা আছে। রকমফের তো আছেই। তদুপরি নিজের মনের মধ্যেই বহু দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্যের অবধি নাই। কোন একটা ইচ্ছার মানসিক পুরণের পথেও সুষ্ঠুভাবে মনের মত করিয়া পুরণ করিয়া লইবার জন্য মানসিক ক্ষমতাও আমাদের অনেক সময় থাকে না। এই জন্যই শত চেষ্টাতেও ইচ্ছার কাল্পনিক পরিপুর্ত্তিও সকল সময় সম্ভব হয় না। ইহার পরিণামে অনেক সময়ই মনে অস্পষ্ট অতৃপ্তির অসন্তোষ জমা হইয়া উঠিয়া এক-এক সময় আমাদের বিব্রত করিতে থাকে। আমাদের নানা রকমের বৃত্তিগুলি জীবনের সূচনা হইতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে যে রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে বাস্তব জীবনে পরস্পরের তাহাদের মধ্যেও বিরোধ ঘটিতে থাকে। এইজন্যই এক-এক সময় নিজের মনই যেন নিজের ইচ্ছা পুরণে বাধা দিতে থাকে, এইরকম বোধ হয়। আমি যদি নিজেই আমার কোন ইচ্ছা পুরণের পথে বাধা হই তবে! তেমন অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত মনোগতি ও মানসিক গঠনের দিকে সমীক্ষণী দৃষ্টি দিয়া নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি দুর করা ভিন্ন আর পথ নাই। অবশ্য এই চেষ্টায় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইলে আমাদের চেষ্টা অধিকতর সফলবতী হইবে আশা করা যায়। এখানেও মনে রাখা দরকার যে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এইসব সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া অতি কঠিন, এমন কি অসাধ্যও হইতে পারে। এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে প্রথমেই

বেশ কিছু সংখ্যক, এমন কি, অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই যে সব শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, মানিয়া চলা সম্ভব হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এই কথা উত্থাপন করিবার কারণ আছে। আমাদের অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে কাম একটি প্রবল বৃত্তি। বিস্তারিত অর্থে ইহার দাবী বহু পরিমাণে না মিটাইয়া চলা অসম্ভব। যৌন-কামের সহিত যুক্ত আমাদের বহু রকমের ধারণা ছোট হইতেই গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন সমাজে এমনকি ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই সকল ধারণা ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়। যৌন-ক্ষমতার উপর যে পৌরুষ ও নারীত্বের মুল্যবোধ জড়িত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ বয়স হইতে স্বাভাবিক নিয়মেই যখন এই যৌন-ক্ষমতা যত দুর্বল হইতে থাকে, ব্যক্তির চরিত্রে সাধারণতঃ ততই বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিতে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে ঐ সময় মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়। এই অবস্থায় সক্ষম ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে যদি স্বাভাবিক যৌনতা লোপ করিয়া দিয়া অফলপ্রসূ করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ফল সকলের পক্ষে ভাল হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে তাহা প্রবন্ধাকারে আলোচিত হইতে পারিবে। এই আলোচনায় আমরা সেই বিস্তারের দিকে যাইব না। যাহা সামান্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে শৈশব হইতে আমাদের বিভিন্ন ধারণাগুলি যদি শিক্ষার মাধ্যমে সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা না হয়, তাহা হইলে হঠাৎ করিয়া নূতন কোন মতবাদের ধাক্কা লাগিলে মনের ভিতে আঘাত লাগিতে পারে। এই জন্যই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও আমাদের শৈশব হইতে যৌনতার সম্বন্ধে নব মুল্যায়ণ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন নানা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া সমাজকে বিব্রত বা ক্লিষ্ট করিতে পারে। শৈশব হইতে শিক্ষা হইলেই তাহার বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। তাই বলিয়া কৈশোর, যৌবন এমনকি প্রৌঢ় বয়সেও যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা কার্যকরী হইবে না তাহা নহে। আমাদের মন যেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, তেমনই পরিবর্ত্তনও চায়। সেই জন্যই শিক্ষার কোনও বয়সের সীমা নাই। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে সময়ের প্রয়োজন হয়। তড়ি-ঘড়ি কোন শিক্ষা বাহির হইতে ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে তাহার ফল অনেক সময়ই ভাল হয় না। শিক্ষা মন গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহা বাধ্য-বাধকতা মাত্র হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই সেই শিক্ষা ঝাড়িয়া ফেলিতে সময় লাগে না। তবু সাবধান হইয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া আইনের সাহায্য লওয়া, দেশের বিশেষ অবস্থা বিচারে দরকার হইতে পারে। তাহা না হইলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করিয়া ফল পাইতে যে সময় লাগিবে ততদিনে দেশের সমস্যা যে বহুগুণ বাড়িয়া যাইয়া ক্রমে দেশ ও সমাজকে জর্জরিত করিবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে

সকলেই বুঝিতে পারিবেন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দ্রুত ফল লাভের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উপযুক্ত আইনের সাহায্য লওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু ব্যক্তি-নির্বিচারে এই বিষয়ে কোনও আইনের প্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নহি। মানুষের জীবন লইয়া খামখেয়ালীভাবে চলা যাইতে পারে না। মতবাদ হইতে জীবন বড়। যে-কোন মতবাদ, শিক্ষা ইত্যাদি সামগ্রিক জীবনকে সম্মুখে রাখিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাবিয়া, বুঝিয়া, বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। একদিক মাত্র দেখিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া বালসুলভ চরিত্রের লক্ষণ। কিন্তু তাই বলিয়া বসিয়া-বসিয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, বিচার করিতে-করিতে জীবন কাটাইয়া দেওয়া চলিতে পারে না। বস্তুতঃ এই অবস্থাটা বিচারের পরিচায়ক নহে। ইহা বিহ্বলতার প্রকাশক। ইহা শক্তিমানের স্বভাব নহে। আমরা দুর্বল কি শক্তিমান, এখনও শৈশবাবস্থায় বাস করিতেছি কি পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার বিচারপুষ্ট জীবনলাভ করিয়াছি, আমাদের কর্ম ও জীবন-চিন্তাই তাহা প্রমাণিত করিবে। মহাকালের পটভূমিকাই হইবে তাহার সাক্ষী।

নিয়মাবলী

- 'চিত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।
- সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন।
- সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা অংশবিশেষ বাদ দিতে পারেন।
- 'চিত্তে' প্রকাশিত রচনা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্বাহ্নে সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন।
- লেখককে দুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়; লেখকের অনুরোধ-সাপেক্ষে তাঁহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ্-প্রিণ্টও দেওয়া হয়।
- বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা। গ্রাহকদের স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

—:)*(:—

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১৪, পার্সিবাগান লেন

কলিকাতা-৯

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

অষ্টাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন * ১৩৮৩

সূচীপত্র

Published by Sri Saradindu Banerjee, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9, and Printed by him from Maharaja Printing Works, 6/1, Cornfield Road, Calcutta-19.